রাম ঠাকুরের কথা

প্রথম খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব আশুতোষ অধ্যাপক

শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ.,

পি. আর্. এস্., পি. এইচ্. ডি.

প্রণীত

প্রচেতা

১২, দেশপ্রিয় পার্ক রোড,

কলিকাতা-২৬

প্রথম প্রকাশ—২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৩

প্রকাশক—শ্রীঅজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রচেতা,
১২, দেশপ্রিয় পার্ক রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ পান,
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস,
২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী—শ্রীআদিনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঁধাই—সেঞ্চুরি বাইণ্ডিং,
৪৫, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

এই পুস্তকের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে যে দু'তিন জন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি এবং যাহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় কোন কোন বিষয়ে আমার নিজের ধারণাগুলি মার্জ্জিত ও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, তাহাদের নামোল্লেখ করিলে হয়তো বা একটা হাতাহাতিই হইয়া যাইবে, সুতরাং সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিলাম না। প্রুফ-সংশোধনের ব্যাপারে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের অধ্যাপক স্নেহভাজন শ্রীমান তড়িৎ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং আমার তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মৈত্রেয়ী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এঁই কার্য্যে আমি নিজে অত্যন্ত অপটু, সুতরাং ইহাদের সাহায্য না পাইলে আমাকে অথান্তরে পড়িতে হইত। লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষরা এই পুস্তক অত্যন্ত তৎপরতার সহিত মুদ্রিত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক স্নেহভাজন শ্রীমান লোকেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীও এই ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

আরও একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে হইতেছে। চন্দ্রবিন্দুর (ँ) ব্যবহারে আমি প্রচলিত নিয়মের কতকটা ব্যতিক্রম করিয়াছি। শ্রদ্ধাসূচক চন্দ্রবিন্দু আমি শুধু মহাজনদিগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সর্ব্বনামগুলিতেই ব্যবহার করিয়াছি, অন্যত্র করি নাই। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেই যেই স্থলে "ইহারা, তাহারা" প্রভৃতি সর্ব্বনাম কোন ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, শুধু সেই সেই স্থলে ক্রিয়াপদের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনানুসারে চন্দ্রবিন্দু জুড়িয়া দিয়াছি। ইতি,

২৪শে ভাদ্র,
১৩৬৩

গ্রন্থকার

কৈফিয়ৎ

স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই যে একদিন ঠাকুরের কথা লিখিতে বসিব। অনুরোধ উপরোধ অনেক আসিয়াছে কিন্তু আমি অটলই রহিয়াছি। সকলকেই সরলভাবে বলিয়াছি যে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আমার সাহস হয় না। ঠাকুরের যাহা স্বরূপ তাহা আমি বুঝি নাই, বুঝিবার অধিকারও নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই তাঁহাকে আমার স্তরে নামাইয়া আনা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অসম্পূর্ণ এবং কিয়দংশে বিকৃত একটা চিত্র আকিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা কিছু না করাই ভাল, এই ধারণাই আমি বরাবর পোষণ করিয়া আসিয়াছি। তথাপি যে আজ ঠাকুরের কথা বলিতে বসিয়াছি, গোড়াতেই তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে হইতেছে।

এক কথায় বলিতে গেলে ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই আমার মত পরিবর্ত্তনের কারণ। দেখিলাম যে ঠাকুরের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নানা জনে নানা কথা বলিতে সুরু করিয়াছে এবং সত্যে মিথ্যায় জোট বাঁধিয়া ঠাকুরকে লইয়া একটা জগাখিচুড়ী পাকাইয়া উঠিতেছে। দীর্ঘকাল নানাভাবে ঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছি এবং বরাবরই তাঁহার কথা বলার ভঙ্গী, তাঁহার চাল-চলন প্রভৃতি বিশেষ অনুধাবনের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে সুরসাধক যেমন কোন তার বেসুরা হইলে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া

ফেলিতে পারে, সেইরূপ ঠাকুরের সম্বন্ধে কোন বিসদৃশ কথা হইলেই খট্ করিয়া আমার কানে লাগে, সহজে প্রতারিত হই না। একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া কথাটা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি ঢাকাতে ছিলাম, সেই সময়ে এক ভদ্রলোক সেখানে সস্ত্রীক তাহার শ্বশুরবাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই ইহার সহিত আমার পরিচয় ছিল, আমি ঢাকায় আছি শুনিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাহার সঙ্গে ঠাকুরের আশ্রিত আরও দুইজন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন স্মরণ আছে। সেই নবাগত ভদ্রলোক আমাকে প্রণাম করিয়া সস্মিতমুখে বলিলেন : "দাদা, এতদিনে আমিও আপনাদের একজন হইয়াছি।" কোথায়, কি ভাবে তিনি আশ্রয় পাইলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন যে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে তিনি এখন আসামের কোনও এক স্থানে বসবাস করেন। একদিন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঠাকুরকে লইয়া তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার দাদা তাহাকে নিভৃতে বলিলেন যে মহাসুযোগ উপস্থিত, ইহা যেন কোন মতেই নষ্ট না হয়, ঠাকুরকে ধরিয়া একটা গতি করিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, 'গুরুর প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা না বুঝিলে "নাম" লইতে তিনি অস্বীকার করিলেন। দাদা তাহাকে ঠাকুরের নিকট লইয়া গেলেন এবং প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া বাদানুবাদ চলিবার পর ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "এইবার বুঝলি গুরুর প্রয়োজনীয়তা কি?" তিনি বলিলেন : "বুঝিয়াছি।" ঠাকুর আবার বলিলেন : "সত্য?", তিনি

বলিলেন "সত্য", এইভাবে "তিন সত্য" করাইয়া লইয়া ঠাকুর তাঁহাকে "নাম" দিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। কথাগুলি যে আগাগোড়া মিথ্যা ইহা বুঝিতে আমার বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইল না এবং তৎক্ষণাৎ ঐ ভদ্রলোককে চাপিয়া ধরিলাম। কিছুক্ষণ পানাই পানাই করিয়া তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে আসর জমাইবার মতলবে ঘটনাটার উপর অনেকটা রঙ্ ফলাইয়াছেন। এইরূপ ঘটনা আমার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে এবং কত লোককে যে মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিয়াছি, তাহা ভাবিলেও এখন দুঃখ হয়। ইদানীং আর কাহাকেও কিছু বলি না, শুধু শুনিয়াই যাই।

তাই বলিতেছিলাম যে ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার সম্বন্ধে যে অনেক মিথ্যা ও অর্দ্ধসত্য প্রচারিত হইতেছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম এবং ইহাও বুঝিলাম যে এ বিষয়ে একটা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিতান্তই প্রয়োজন। হঠাৎ মনে হইল যে একটা অমোঘ ব্যবস্থা তো আমার হাতেই রহিয়াছে। সাধারণতঃ, আমরা মহাজনদের বক্তব্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাই না, যাহা পাই তাহা শিষ্যবর্গের বরাবরেই পাই, কিন্তু ঠাকুর তো তাঁহার কথা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট লিখিত অসংখ্য পত্রের মধ্য দিয়া নিজ হস্তেই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাহার কিছুটা তো সংগৃহীত হইয়াই আছে। বহু বৎসর যাবৎ আমি ঠাকুরের আশ্রিতবর্গের নিকট হইতে তাঁহার চিঠিগুলি চাহিয়া লইয়া সারাংশ একখানা খাতাতে টুকিয়া রাখিতেছিলাম এবং এই সংগ্রহ অনেকটা অগ্রসর

হইয়াছিল। মনে হইল যে এই চিঠিগুলির প্রামাণ্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না এবং যে যাহাই বলুক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই একটা অব্যর্থ কষ্টিপাথরের কাজ করিবে। চিঠিগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম এবং ঐকান্তিক উদ্যমে কাজে লাগিয়া গেলাম। ঠাকুরের চিঠিগুলির সারাংশ "বেদবাণী" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া গেল এবং আমি ভরসা করি যে তৃতীয় খণ্ডও শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে। ইহাতে কিছুটা কাজ যে না হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপর এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ঠাকুরের সম্বন্ধে একখানা পুস্তক বাহির হইয়াছে এবং শুনিতেছি যে শীঘ্রই আরও দুই তিন খানা বাহির হইবে। এখানে সেখানে নানারকমের প্রবন্ধাদিও ছাপা হইতেছে। ইহাতে আমার বলিবার কিছুই নাই। পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিবার ও তাহা ছাপাইবার অধিকার সকলেরই আছে। এই সকল লেখার কোনটার মধ্যেই যে চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই, এমন কথাও বলিতে পারি না। বিশেষতঃ, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় "হিমাদ্রী" নামক সাপ্তাহিকে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপাইয়া আমাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার এই প্রবন্ধে ঠাকুরের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে যে আভাসটুকু পাওয়া গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের কথাগুলি নোট করিয়া না রাখিলে এবং প্রবন্ধাকারে তাহা রূপান্তরিত না করিলে ঠাকুরের এই দিকটা হয়তো চিরতরেই লুপ্ত হইয়া যাইত। ঠাকুরের চরণাশ্রিত আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীবামাচরণ দে

(ইনি কটকে কন্ট্রাকটারী করিতেন, বর্ত্তমানে অবসর-জীবন যাপন করিতেছেন) এই প্রবন্ধটি পড়িয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ঠাকুরের যে কথাগুলি শুনিলে সকলের ঘুম পাইত, সেইগুলি লইয়াই গোপীবাবু ইহা রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, আমরা অনেকেই এই কথাগুলি বহুবার শুনিয়াছি কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলিয়া গিয়াছি, ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা বড় একটা করি নাই। সেইজন্যই আমার মনে হয় যে গোপীবাবুর মত একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও শ্রদ্ধাবান ভক্তকে দিয়া ঠাকুরই এই কাজটি সম্পন্ন করাইয়া লইয়াছেন। সে যাহাই হউক, আমার কথা হইল এই যে এই নূতন পরিস্থিতিতে আর নীরবে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার সংস্কার-মলিন চিত্ত-মুকুরে ঠাকুর যতটুকু প্রতিভাত হইয়াছেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহার সাহচর্য্য করিয়া আমি যাহা শুনিয়াছি, দেখিয়াছি ও পাইয়াছি, তাহার একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাই সমীচীন মনে হইতেছে। কষ্টিপাথর তো রহিলই, ইহার সাহায্যে বর্ত্তমান পাঠক-পাঠিকারা ও পরবর্ত্তীরা আলেখ্যগুলির ভালমন্দ একটু চেষ্টা করিলেই যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় কথা হইল এই গ্রন্থের উপকরণ লইয়া। আমি নিজে যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি এবং ঠাকুরের মুখে যাহা শুনিয়াছি, মূলতঃ তাহাই এই গ্রন্থে উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কখন কখন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে জানা কোন কোন ঘটনা আমার কথার পরিপোষক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এগুলিকে ছাঁটিয়া দিলেও আমার মূল

বক্তব্যের বিশেষ কোন অঙ্গহানী হইবে না। কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছিলেন যে ঠাকুরের আশ্রিতবর্গের নিকট হইতে আরও কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইলে হয়তো ঠাকুরের ছবিটি আরও পূর্ণতর হইত, কিন্তু প্রধানতঃ দুইটি কারণে আমি সে রাস্তায় যাইতে সম্মত হই নাই। আমি আজীবন ইতিহাসের ছাত্র এবং এই উপকরণ সম্বন্ধে আমাদের একটা শুচিবাই আছে। নিশ্চিত হইতে না পারিলে আমরা কোন উপকরণ সাধারণতঃ ব্যবহার করিতে চাহি না। আমার এই কথা হইতে কেহ যেন সিদ্ধান্ত করিয়া না বসেন যে ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার আশ্রিতেরা যাহা কিছু জানেন বা বলেন, তাহার কিছুই আমি বিশ্বাস করি না। কথাটা কিন্তু মোটেই তাহা নহে। আমি বলিতে চাহিতেছি এই যে প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে এবং কোন ঘটনা বিবৃত করিবার সময় এই দৃষ্টিভঙ্গী অগোচরে তাহার কাজ করিয়া যায়। ফল দাঁড়ায় এই যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণেও নানা প্রকারের গরমিল আসিয়া পড়ে, একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে অনেক সময়েই কিছুটা বেগ পাইতে হয়। অন্যের মুখে শোনা ঠাকুরের কথার উপরেও নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করা যায় না। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। পোষ্টমাষ্টার শ্রীমাধবচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সেবক বৈদ্য লেনের বাসায় একবার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, সঙ্গে বরদাবাবু ছিলেন। সেখানে যাইয়া এক ভদ্রলোকের মুখে শুনিলাম যে তাহাদের ওখানেও ঠাকুর নাকি এক উৎসব অনুষ্ঠানের আদেশ করিয়াছেন। তিনি ষ্টীমারে ঠাকুরের সঙ্গে

আসিতেছিলেন, সেই সময়েই ঠাকুর তাহাকে এই আদেশ করেন এবং সকলকে জানাইয়া দিতে বলেন। বরদাবাবু ভদ্রলোককে জনান্তিকে বলিলেন : "আচ্ছা বলুন তো কথাটা ঠিক কি ভাবে উঠিয়াছিল ? আপনিই বোধ হয় ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন যে নানা জায়গায় উৎসব হইতেছে, এমতাবস্থায় আপনাদের ওখানেও একটা উৎসব না হইলে ভাল দেখাইতেছে না।" ভদ্রলোক বলিলেন যে ঠিক তাই, তিনিই কথাটা তুলিয়াছিলেন এবং সামনেই একটি পরব আসিতেছে স্মরণ হওয়ায় সেই তিথিটির কথাও ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন : "বেশ, ঐ তিথিতেই আপনারা উৎসব করিবেন।" অমনি চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল যে ঠাকুরের আদেশে অমুক তিথিতে অমুক স্থানে উৎসব হইবে। একটু বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ঠাকুরের আদেশ নহে, ইহা ঐ ভদ্রলোকেরই আদেশ। আরও একটা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পরে একটা গুজব রটিয়া গেল যে ঠাকুর নাকি বলিয়াছেন যে পাকিস্তান টিকিবে না। কথাটা অনেকের মুখেই শুনিলাম কিন্তু ঠাকুরের সঠিক বাক্যটি জানিতে না পারায় কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে এক ভদ্রলোক আমাকে জানাইয়াছিলেন যে ঠাকুর যখন ঐ কথাটি বলেন তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন : "আপনারা দেখেন দুইটা, আমি তো একটাই দেখি।" কথাটার অর্থ এইভাবে করা হইল যে দুই বাঙ্গলা আর থাকিবে না, পুনরায় এক হইয়া যাইবে। কিন্তু কথাটার তাৎপর্য্য

এরূপ না-ও হইতে পারে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি একটাই দেখেন, দুইটা দেখেন না, এই অর্থেই যে ঠাকুর কথাটা বলেন নাই, তাহাই বা কি করিয়া বুঝিব? সকল কথা যাচাই করিবার সময়ও নাই, সুযোগও হয় না। সুতরাং আমি সোজা রাস্তাই অবলম্বন করিয়াছি, আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই মূলতঃ আমার বক্তব্যকে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, আমার নিজের অভিজ্ঞতার সহিত অপরের অভিজ্ঞতা মিশাইলে সকল সময়ে হয়তো সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হইত না এবং ফলে আমার বক্তব্যটাও একটু ঘোলাটে আকার ধারণ করিত। সুতরাং নিজে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি শুধু তাহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, দোষত্রুটি সমস্তই আমার; আর কাহারও কোন দায়িত্ব ইহাতে নাই।

এইবার আমার বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। আমি সাধারণতঃ শুধু "ঠাকুর" বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করি, পূর্ব্বে "শ্রীশ্রী" বা শ্রদ্ধাসূচক আর কিছু জুড়িয়া দেই না, এজন্য অনেকে আমাকে অনুযোগ দিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে কিনা, তাহা বড় একটা কেহই শুনিতে চাহেন নাই, শুধু বলিয়াছেন যে এই ত্রুটির দরুণ আমি ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং আমার যাহা বক্তব্য, এই স্থানেই তাহা স্পষ্টভাবে লিখিয়া রাখা প্রয়োজন মনে হইতেছে। যাহারা এই পুস্তক পড়িবেন তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে ঠাকুরের সহিত আমার কোন দিনই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে নাই। তিনি বরাবরই আমার সঙ্গে নিতান্ত আপনার জনের

মতই ব্যবহার করিয়াছেন এবং ঠাকুরকেও আমার সর্ব্বদাই ঠিক তাহাই মনে হইয়াছে। সম্বন্ধটা মুখ্যতঃ প্রীতির, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সমস্তই গৌণ। সুতরাং ঠাকুরের নামের পূর্ব্বে "শ্রীশ্রী" বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু জুড়িয়া দিলেই আমার মনে হয় যে তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিলাম, একটা আবরণ যেন তাঁহার ও আমার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহা আমার অত্যন্ত ব্যক্তিগত কথা, অপরকে সহজে বুঝান যাইবে না। জনসমাজে তিনি "রাম ঠাকুর" নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন, পুস্তকের নামকরণেও আমি তাহাই রাখিয়াছি, "শ্রীশ্রী" জুড়িয়া দেই নাই। ইহাতে যদি কেহ অসন্তুষ্ট হন, আমি শুধু তাহার মার্জ্জনা ভিক্ষাই করিতে পারি, আর কিছু করিবার উপায় আমার নাই। নিজের বাবাকে 'শ্রীশ্রীবাবা" বলিয়া ডাকা নিতান্তই অশোভন এবং হাস্যকর।

পরিশেষে এই পুস্তক প্রণয়নে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, সে সম্বন্ধেও কিছু বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই জাতীয় একখানা পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা আমার কোন কালেই ছিল না, সুতরাং আমি কিছুই লিখিয়া রাখি নাই। কাজেই আমাকে আমার স্মৃতিশক্তির উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে। যাহাদের সঙ্গে অধিকাংশ সময় ঠাকুর-সঙ্গ করিয়াছি তাহাদের অনেকেই আর ইহজগতে নাই এবং যাহারা আছেন তাহাদের মধ্যেও সকলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাইয়া উঠিতে পারি নাই। এদিক হইতে সামান্য কিছু সাহায্য যে না পাইয়াছি, তাহা নয়, কিন্তু প্রধানতঃ আমাকে আমার স্মৃতিশক্তি অবলম্বন করিয়াই

অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার সময় হইতে পর পর যে সকল স্থানে বাস করিয়াছি, সেই বাসস্থান গুলিকে কেন্দ্র করিয়া আমি ঘটনাগুলি সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সকল ক্ষেত্রেই যে সময়ক্রম রক্ষা করিতে পারিয়াছি এমন কথা হলফ করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে যে-সকল ঘটনা সম্যকরূপে মনে আসে নাই, সেগুলি বর্জ্জনই করিয়াছি, এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করি নাই। যথাসাধ্য সত্যতা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর সফলকাম হইয়াছি তাহা ঠাকুরই বলিতে পারেন। ঠাকুরের ছোট ছোট যে সকল কথা আমার হৃদয়ে দাগ কাটিয়া রহিয়াছে, সেগুলি হুবহু ঠাকুরের নিজ ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি কিন্তু অন্যত্র তাহা সম্ভব হয় নাই। ঠাকুরের কথার তাৎপর্য্য আমার নিজ ভাষাতেই বিবৃত করিয়াছি।

ভবিষ্যতে অন্য একটা কৈফিয়তের দায়ে পড়িতে পারি, এই আশঙ্কায় উপসংহারে আরও কিছু বলিয়া রাখিতে হইতেছে। এই পুস্তক হয়তো এমন লোকের হাতে পড়িতে পারে যাহারা ঠাকুর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, কেহ বা তাঁহার নামটাও শোনেন নাই। সুতরাং স্বভাবতঃই একটা নালিশ উঠিতে পারে যে আমি মাঝখান হইতে ঠাকুরের কথা সুরু করিয়া বিষয়টাকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছি। সুতরাং ঠাকুরেব একটু পরিচয় সংক্ষেপে লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে হইতেছে। পূর্ব্বে এ বিষয়ে সামান্য যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাই জোড়াতাড়া দিয়া ছোট একটি নিবন্ধ এইস্থানে জুড়িয়া দিলাম।

বাঃ ১২৬৬ সনে মাঘী শুক্লা দশমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামানিক নামক গ্রামে রামঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৫৬ সনের ১৮ই বৈশাখ পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে চৌমুহনিতে (নোয়াখালী) তাহার প্রকটলীলার অবসান হয়। এই সুদীর্ঘ ৯০ বৎসর তিনি একপ্রকার আত্ম-গোপন করিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া এবং হিমালয়ের অনেক দুর্গম স্থানে বিচরণ করিয়া কাটাইয়াছেন। কখন বা আসনস্থ হইয়াও কোন কোন স্থানে কিছুকাল যাপন করিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে খণ্ড খণ্ড ভাবে এই সময়ের নানা ঘটনা তিনি তাঁহার আশ্রিতবর্গের কাহারও কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার কথায় তাঁহার গুরুগোষ্ঠি ও নানা প্রকার অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও বিস্তর আভাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সময়ের ধারাবাহিক বিবরণ কাহারও জানা নাই।

১০।১২ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া যান, এবং আনুমানিক ৪৬।৪৭ বৎসর বয়সে স্থায়ীভাবে লোকালয়ে ফিরিয়া আসেন। মধ্যে একবার ৩।৪ বৎসরের জন্য তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং এই সময়েই তিনি নোয়াখালী ও ফেণীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। নোয়াখালীতে তাঁহার নানা প্রকার বিভূতি প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং ফেণীতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কবিবর তখন ফেণীতে মহকুমা হাকিমের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঠাকুরও সেই সময়ে

এক ওভারসিয়ারের সরকাররূপে সেখানে আগমন করেন। "আমার জীবন" চতুর্থ খণ্ডে নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন: "ফেণীতে যে কারখানা প্রস্তুত হইতেছিল, রামঠাকুর তাহার সরকার হইয়া আসিল। লোকে বলিতে লাগিল যে, কখনও তাহাকে গৃহে আহ্নিকে দেখিয়াছে এবং পরের মুহূর্ত্তে রামঠাকুর অদৃশ্য হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে রাত্রিশেষে রক্তচন্দন চর্চ্চিত অবস্থায় কোনও বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে। সর্প দংশন করিতে, গরু মহিষ মারিতে আসিতেছে, আর রামঠাকুর বারণ করা মাত্র চলিয়া গিয়াছে। নিজে কিছুই আহার করে না, কদাচিৎ দুগ্ধ বা ফল আহার করে, অথচ তাহার সবল সুস্থ শরীর। পরসেবায় তাঁহার পরমানন্দ। জেলখানার ইটখোলার গৃহে পাবলিক ওয়ার্কস প্রভুদের বারাঙ্গনাগণ কখন পালে পালে উপস্থিত হয়। কিন্তু রামঠাকুর তাহাদের ঘৃণা করা দূরে থাকুক, বরং সন্তোষের সহিত নিজে রাঁধিয়া তাহাদের অতি যত্নে আহার করায় এবং মাতাল হইয়া পড়িলে তাহাদের আপন মাতা বা ভগিনীর মত শুশ্রূষা করে।" কবিবর আরও বলিয়াছেন: "রামঠাকুর দেখিতে ক্ষীণাঙ্গ, সুন্দর, শান্তমূর্ত্তি। নিতান্ত পীড়াপীড়ি না করিলে কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না, কোনও কথা কহে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার ৮ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষামাত্র হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, এমন কি প্রণবের অর্থ পর্য্যন্ত সে জলের মত বুঝাইয়া দিত। আমি তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মধ্যে মধ্যে আমি তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া আমার গৃহে আনাইতাম এবং পতি পত্নী মুগ্ধচিত্তে তাঁহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা

সকল শুনিতাম। বলাবাহুল্য, সে পেশাদার হিন্দু প্রচারকের ব্যাখ্যা নহে।" একটু প্রনিধান করিয়া পড়িলে এই দুইটি উদ্ধৃতি হইতেই ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায়।

এই সময়েই ঠাকুর দ্বিতীয়বার নিরুদ্দেশ হইয়া যান এবং প্রায় ১৭।১৮ বৎসর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আনুমানিক ১৯০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা অঞ্চলে ফিরিয়া আসেন। এই দ্বিতীয়বার লোকালয়ে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বের দুইটি ঘটনা ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরে ঠাকুরের দেহের এমন একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল যে সেই চেহারায় গুরু তাঁহাকে পাঠাইতে ভরসা পাইলেন না। একটা অলৌকিক উপায়ে প্রভূত রক্তক্ষরণ করাইয়া এবং পরিমাপ কমাইয়া দেহটিকে লোকালয়ে বিচরণের উপযোগী করিয়া গুরু তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। আমার মনে হয় যে ঠাকুরের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির একটা ক্ষীণ আভাস একদিন আমি পাইয়াছিলাম, যথাস্থানে তাহা বিবৃত করিব। দ্বিতীয়তঃ ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে গুরুর নির্দ্দেশে বৃন্দাবনে ৺যদু ভট্টাচার্য্য নামক কোনও এক ভক্তের গৃহে তিনি কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কয়েকটি বিগ্রহ ছিল এবং ইহাদের সেবা লইয়াই তিনি কাটাইতেন। এই বিগ্রহ-সেবা সম্বন্ধে ঠাকুর আমাকে অনেক কিছুই বলিয়াছিলেন কিন্তু "অসম্ভবম্ ন বক্তব্যম্" এই নিষেধবাণী আমাকে নিরস্ত করিতেছে। আমি বিশেষ কিছুই বলিব না, শুধু এইটুকুই বলিব যে বিগ্রহ-সেবা যে

পুতুল-সেবা নয়, ঠাকুরের কথায় আমি তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আনুমানিক ১৯০২—০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা অঞ্চলে ফিরিয়া আসেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, সেই সময়ে তিনি কালীঘাটে ছিলেন, দেশে যান নাই। ইহার পর তিনি উত্তরপাড়া ও নিকটবর্ত্তী আরও ২।১টি স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। হঠাৎ একদিন একবস্ত্রে বাহির হইয়া যান এবং বৎসরাধিক কাল দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে, অথবা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময় হইতে তাঁহার তিরোভাব পর্য্যন্ত তিনি লোকালয়েই কাটাইয়া গিয়াছেন এবং অযাচিত ভাবে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। "অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু" কথাটির তাৎপর্য্য তাঁহাকে দেখিয়াই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। কত লোক যে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাহার সঠিক সংখ্যা কাহারও জানা নাই; কিন্তু এই সংখ্যা যে অন্ততঃ লক্ষাধিক হইবেই এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি সর্ব্বজনবিদিত ছিলেন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে তিনি সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জীবনের শেষের কয়েক বৎসর তিনি চৌমুহনীতেই কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর সেখানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। বর্ত্তমানে সেখানে একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত

হইয়াছে এবং ঐ মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া একটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে, তাঁহার পূত জন্মস্থান ডিঙ্গামানিকে এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে আরও তিনটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার দূরের কথা, নিজের সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোন প্রচারও তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন যে আচরণই প্রকৃষ্ট প্রচার, এতদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে প্রচারের চেষ্টা করিলেই, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, সত্যের সঙ্গে কিছু কিছু মিথ্যা আসিয়া জোটে এবং প্রচারের নামে অপপ্রচারই হইয়া থাকে। আমার বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় একদিন রাত্রিতে ঠাকুরের নিকট আমি ও প্রভাতবাবু (ঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক; ইনি আমার আবাল্য সুহৃদ্, সহাধ্যায়ী ও সহকর্ম্মী ছিলেন; অকাল-মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের আশুতোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন) বসিয়াছিলাম, আর কেহই ছিল না। প্রভাতবাবু একখানা খাতা ও একটি পেনসিল হাতে লইয়া ঠাকুরকে বলিলেন: "আপনি আপনার জীবনের ঘটনাগুলি পর পর বলিয়া যান আমি লিখিয়া লই। পরে লেখাগুলির ভিত্তিতে আপনার একখানা পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা আর কষ্টসাধ্য হইবে না।" কিন্তু ঠাকুর সম্মত হইলেন না, ঐ এক কথাই বলিলেন, লিখিতে গেলেই সত্যে মিথ্যায় জোট বাঁধিয়া যাইবে। তথাপি কেন যে আজ তাঁহার কথা লিখিতে যাইতেছি, তাহার একটা কৈফিয়ৎ পূর্ব্বেই দিয়াছি, কিন্তু ঠাকুরের কাছে কি জবাব দিব জানি না।

রাম ঠাকুরের কথা

প্রথম অধ্যায়

আমি তখন ঢাকা কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কলেজের ছাত্র-সভার সাহিত্য-শাখার এক অধিবেশনে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের একজন ছাত্র "দায়ী কে ?" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ-পাঠক লক্ষ্মী নারায়ণ মজুমদার মহাশয়ের প্রশ্ন ছিল এই যে সংসারে যে এত দুঃখ, এত কলহ, এত বৈষম্য, এত নির্য্যাতন, ইহার জন্য দায়ী কে ? তিনি নানা দিক হইতে কথাটার বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে এজন্য ভগবানই দায়ী। প্রবন্ধ-পাঠ সমাপ্ত হইতেই এক তুমুল বিতর্ক আরম্ভ হইল। কয়েকজন অধ্যাপক এবং এম্, এ, ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র এই বিতর্কে যোগদান করিলেন এবং সকলেই অত্যন্ত তীব্রভাবে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিলেন। তখনও মানুষ আজিকার মত এতটা বুদ্ধিমান হইয়া উঠে নাই, সুতরাং ভগবানের উপর এই আক্রমণ কেহই সহ্য করিতে চাহিলেন না। পরিশেষে কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় সভাপতির ভাষণে বুঝাইয়া বলিলেন যে প্রকৃত পক্ষে প্রবন্ধকার একটা জটিল সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন মাত্র, সমালোচকেরা অযথা তাহাকে আক্রমণ না করিয়া যদি এই সমস্যার সমাধানে

কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলেই বিতর্কটি অধিকতর ফলপ্রসূ হইত।

অধিবেশন ভাঙ্গিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু এই প্রশ্নটার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম না। তখন আমি নিতান্ত অল্পবয়স্ক তরলমতি যুবক, একপ্রকার বালক বলিলেও চলে, অথচ এতবড় একটা গুরুতর সমস্যা আমার মনে দানা বাঁধিয়া রহিল, কিছুতেই ইহাকে এড়াইতে পারিলাম না। আমি অত্যন্ত মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। ঠাট্টার ভয়ে সমবয়সী বন্ধুদের নিকট কথাটা উত্থাপন করিতে পারিতাম না, আবার এদিকে বয়োজ্যেষ্ঠদের কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসে কুলাইত না। কিন্তু কেন জানি না, আপনা হইতেই আমার মনে একটা বিশ্বাস গড়িয়া উঠিল যে এই সমস্যার সমাধান কোনও প্রকৃত সাধু ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারাই সম্ভব হইবে না। কলেজে কৃতবিদ্য অধ্যাপকের অভাব ছিল না, বিশেষতঃ একজনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তিনিও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাহার কাছেও এই প্রশ্ন লইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। নিতান্ত অস্বস্তিতেই দিন কাটিতে লাগিল।

এইভাবে কয়েক মাস অতীত হইবার পর কি একটা উৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের তিন চার জন নামজাদা স্বামীজী ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধান লইয়া জানিলাম যে বাঙ্গলা-বাজার অঞ্চলে কোনও একটা বাড়ীতে তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন। কালবিলম্ব না করিয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত

হইলাম কিন্তু কোন লাভ হইল না। স্বামীজীরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন, এই আদর্শের বহুল প্রচারই যে গণকল্যাণের একমাত্র পন্থা, ইত্যাদি অনেক কিছুই বলিলেন কিন্তু কোন তাত্ত্বিক আলোচনার ধার দিয়াও গেলেন না। আমি কোন কথা বলিবার অবসরই পাইলাম না, পাইলেও বোধ হয় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইত না। যদি অপর কেহ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেন এবং তদুত্তরে আমার সমস্যার সমাধান হইয়া যায় এই ভরসায় আরও তিন চার দিন সেখানে যাতায়াত করিলাম কিন্তু কিছুই হইল না।

ইহার কিছুদিন পরে, তৃতীয় বার্ষিকের শেষের দিকে, অন্য একটা কারণে আমার মনের অস্থিরতা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। এই সময়ে Ball প্রণীত "Story of the Heavens" নামক পুস্তকখানা পড়িবার আমার সুযোগ হয়। এই পুস্তকখানা আমার মনে এক বিপর্য্যয় আনিয়া দিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম যে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-জগৎ, যাহার বিরাটত্বের কথা ভাবিতেও মাথা ঘুরিয়া যায়, যাহার তুলনায় আমাদের এই সসাগরা পৃথিবীর সামান্য একটা বালুকণার গুরুত্বও নাই, সেই পৃথিবীতে আমি একটি সাড়ে তিন হাত মনুষ্য! আমার নিজের অতি-ক্ষুদ্রত্ব এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের অতি-বিশালত্ব আমার মনে এক বিষম বিপ্লব বাধাইয়া দিল। সময় সময় নিজেকে নিতান্ত অসহায় এবং একাকী মনে হইত এবং কোন কাজেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। সতীর্থদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া যে মনের ভার খানিকটা লঘু করিয়া লইব, সে

উপায়ও ছিল না। দু'এক জনের কাছে কথাটা তুলিয়া এমন মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিলাম যে সে পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। গভীর রাত্রে একাকী বসিয়া নীরবে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। মনটা উদাস হইয়া যাইত, কখন বা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিতাম, তখন "গীতা" কিছু কিছু পড়িতাম, ভয় হইত বুঝিবা সেই ভয়াবহ "বিশ্বরূপ" হঠাৎ আমার চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। আমার মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে আমার একটা স্থির অবলম্বনের প্রয়োজন এবং ইহারই সন্ধানে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের পিছনে ঘোরাঘুরি সুরু করিয়া দিলাম। এই সময়ে আমার হরেক রকমের সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে কিন্তু এখানে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। বিশেষতঃ বেশী কিছু বলিতে গেলেই দু'চারটা অপ্রীতিকর কথা উঠিয়া পড়িতে বাধ্য। ঠাকুরের কথা বলিতে বসিয়া গোড়াতেই একটা তিক্ততার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। শুধু এইটুকুই বলিব যে যাহা খুঁজিতেছিলাম তাহা পাইলাম না।

কিন্তু ক্রমে আমার এই উৎকট অস্থিরতা কমিয়া গেল, কতকটা পড়াশুনার চাপে এবং কতকটা অন্যান্য কারণে মন স্বাভাবিক ও সুস্থ হইয়া আসিল। ফুটবল, ক্রিকেট, সখের থিয়েটার ইত্যাদি নানা ব্যাপারে আমার উৎসাহের অন্ত ছিল না, দাবা খেলা একটা নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল। বি, এ, পরীক্ষার পর রীতিমত ওস্তাদ রাখিয়া প্রায় এক বৎসর কাল তবলা শিখিয়াছিলাম,

সর্ব্বোপরি বয়সেরও একটা ধর্ম্ম আছে, সুতরাং প্রশ্নটা সহজেই চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু কখন কখন টের পাইতাম যে ইহা একেবারে যায় নাই, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ভিতরে সর্ব্বদাই রহিয়াছে। কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় অস্থিরতা বোধ করিতাম না। এই সময়ে অন্য একটা ঘটনা আবার কয়েক দিনের জন্য আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি তখন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, আমাদের টিকাটুলির বাড়ী হইতে কলেজে যাতায়াত করি। একদিন সকাল বেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন লোক জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল : "Your stars at present are very inauspicious, a great danger is impending," অর্থাৎ "বর্ত্তমানে তোমার গ্রহগুলি অত্যন্ত অশুভ, শীঘ্রই একটা বড় রকমের বিপদ আসিতেছে।" সচরাচর যে সকল পাঞ্জাবী সামুদ্রিকেরা ঘুরিয়া বেড়ায় লোকটাকে দেখিয়া তাহাদেরই একজন বলিয়া মনে হইল কিন্তু উহার বেশভূষায় একটু যেন রকমফের ছিল। এই লোকগুলিকে আমি একেবারেই বরদাস্ত করিতে পারিতাম না, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভাগাইয়া দিতে চাহিলাম কিন্তু অত সহজে সে হটিল না, দৃঢ়তার সহিত বলিল যে যাহা বলিয়াছে তাহার অব্যর্থ প্রমাণ সে দিতে পারে। ইহার আবার প্রমাণ কি করিয়া হইতে পারে আমার মাথায় আসিল না, কিন্তু একটু কৌতূহল হওয়ায় লোকটাকে ভিতরে আসিতে বলিলাম। ভিতরে আসিয়া তাহার পুটুলি হইতে একখানা আসন বাহির করিয়া মেজেতে পাতিয়া লোকটা তাহার উপর বসিল। কনুই

অবধি দুই হাত এবং হাঁটু অবধি দুই পা বেশ পরিষ্কাররূপে ধুইয়া বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা আসন আনিয়া সে যেখানে বসিয়াছিল তাহার ৩৷৪ হাত দূরে আমাকে বসিতে বলিল। আমি তাহার নির্দ্দেশ মত হাত পা ধুইয়া আসিয়া আসন পাতিয়া বসিলাম। সে তাহার পুটলি হইতে একটুক্‌রা ভাঙ্গা শ্লেট বাহির করিয়া তাহাতে দুইটি চিহ্ন আঁকিয়া আমাকে দেখাইল, একটি গুণন চিহ্ন (×), অপরটি অনেকটা ইংরাজী বড় হরফের প্রথম অক্ষরের মত, শুধু পেটকাটা দাগটি নাই (Λ)। পরে বুঝাইয়া বলিল যে আমাকে জোড়াসনে হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিতে হইবে এবং সে একটি প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবে। তাহার কাজ শেষ হইয়া গেলে দক্ষিণ মুষ্টিটি খুলিয়া যদি আমি দেখি যে আমার হাতে প্রথম চিহ্নটি অঙ্কিত হইয়া আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সমূহ আমার কোনও বিপদ নাই। কিন্তু যদি দেখি যে বাম হস্তে দ্বিতীয় চিহ্নটি উঠিয়াছে তবে বুঝিতে হইবে যে বিপদ আসন্ন। আমি তাহার নির্দ্দেশ মত স্থির হইয়া বসিলাম এবং সে তাহার পুটুলি হইতে কয়েকটি জিনিষ বাহির করিল। কালীঘাটের কালীর একখানা পট নিজের সম্মুখে বসাইল, দুইটি রুদ্রাক্ষ পটের দুইদিকে রাখিল এবং একটি পুঁতির মালা পরাইয়া দিল। তাহার পর স্থির হইয়া বসিয়া করজোড়ে একটি স্তব পাঠ আরম্ভ করিল। স্তবটি শেষ হইয়া গেলে কিছুক্ষণ একটি মন্ত্র আওড়াইল, এই কার্য্য দুইটি সমাধা হইয়া যাইতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগিল। এইবার লোকটা আমাকে হাত দুটি একে একে খুলিয়া দেখিতে বলিল। ডান

হাত খুলিয়া দেখিলাম যে সেখানে কিছুই নাই, পরিষ্কার যেরূপ ছিল সেইরূপই রহিয়াছে। কিন্তু বাঁ হাত খুলিয়াই দেখি যে দ্বিতীয় চিহ্নটি স্পষ্ট সেখানে উঠিয়াছে, আমার মনে হইল কেহ যেন একখণ্ড অঙ্গার দিয়া চিহ্নটি পরিপাটিরূপে আঁকিয়া রাখিয়াছে। লোকটার নির্দ্দেশে বাঁ পা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে সেখানেও হাঁটুর ঠিক নীচে, পিছনের দিকে, অবিকল ঐ চিহ্নটি রহিয়াছে। আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলাম কিন্তু তথাপি লোকটাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল যে এই ব্যাপারে, কোথাও না কোথাও, একটা ফাঁকি নিশ্চয়ই আছে। প্রথমে ভাবিলাম যে, লোকটা বোধ হয় আমাকে হিপ্‌নটাইজ্‌ করিয়াছে। কথাটা মনে হইতেই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলাম, আমার বড় বৌদি এবং আরও কয়েকজনকে আমার হাত ও পা দেখাইলাম, সকলেই বলিল যে চিহ্ন দুইটি বাস্তবিকই আছে। কিন্তু ইহাতেও আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। "Mass hypnotism" (একসঙ্গে অনেককে হিপ্‌নটাইজ্‌ করা) বলিয়াও একটা কথা আছে, ইহারাও তো নিকটেই ছিলেন, কেহ কেহ বারান্দা ও ভিতরের দরজা হইতে লোকটার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন, সুতরাং ইহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস-যোগ্য না-ও হইতে পারে। পাচক রান্নাঘরে তাহার নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল, সে এই ব্যাপারের কিছুই জানে না, সুতরাং তাহার সাক্ষ্য হয়তো অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইতে পারে, এই ভরসায় তাহার নিকট গেলাম কিন্তু সে-ও বলিল যে চিহ্ন দুইটি ঠিকই আছে। আমি ইহাতেও নিবৃত্ত হইলাম না, পাড়ায় বাহির হইয়া

দুই তিন বাড়ী ঘুরিয়া আরও ৭।৮ জনকে ধরিলাম কিন্তু যখন সকলেই একবাক্যে বলিল যে চিহ্ন দুটি পরিষ্কারই আছে, তখন অগত্যা "mass hypnotism"এর অনুমানটা ত্যাগই করিতে হইল। লোকটার নিকট ফিরিয়া আসিতেই সে বলিল : "আমার কথার প্রমাণ তো পাইয়াছেন কিন্তু ভয়ের কিছুই নাই। এই বিপদের কাটানও আমার জানা আছে। বেশী কিছু লাগিবে না, একখানা পুরান কাপড়, একটি সূচ, কিছু সূতা ও তিনটি টাকা হইলেই চলিয়া যাইবে।" আমি হাঁ না কিছুই বলিলাম না, ইচ্ছা হইতেছিল যে উহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেই। কিন্তু কিছুই হইল না, বাড়ীর ভিতর হইতে আমার ডাক পড়িল এবং বৌদির নির্ব্বন্ধাতিশয্যে লোকটাকে তাহার প্রার্থিত জিনিষগুলি ও তিনটি টাকা দিয়াই বিদায় করিতে হইল। স্পষ্টই বুঝিলাম যে সে আমাকে ঠকাইয়া গেল। এই ঘটনায় আমি এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে ইহার ৩।৪ দিন পরে আমার এক প্রতিবেশী যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে লোকটা বাছিয়া বাছিয়া ওই সামান্য জিনিষ ক'টি চাহিয়া লইল কেন, উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে ওই পুরাতন কাপড়খানা সেলাই করিয়া সে আমার ভাগ্য মেরামত করিবে, আর ওই টাকা তিনটি পারিশ্রমিক। (অমৃতবাজার পত্রিকায় উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল কে, এম, মুন্সী মহাশয়ের যে চিঠিগুলি বাহির হইতেছে, তাহার একটিতে দেখিলাম যে মুন্সীজীর জীবনেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল।)

নিতান্ত অশ্রদ্ধার সহিত সেই সামুদ্রিকের কথাটা এখানে

বিবৃত করিলাম কিন্তু মনে হইতেছে যে এতটা না করিলেই বোধ হয় সঙ্গত হইত, কারণ একটি বিষয়ে আমি এই সামুদ্রিকের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। আমি তখন পুরাদস্তুর যুক্তিবাদী, সহজে কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহিতাম না। এই ঘটনাকেও যাদুকরের কারসাজি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু কেন জানিনা, তাহা পারিলাম না। আমার যুক্তিবাদই প্রবল একটা ধাক্কা খাইল এবং যেন খানিকটা শিথিল হইয়া গেল। যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে যেন সব কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না, তাহাদের অধিকারেরও যেন একটা সীমা আছে, এরূপ একটা ধারণা নিজের অজ্ঞাতসারেই মনে দানা বাঁধিয়া উঠিল। ইহাও মনে হইল যে যুক্তি ও বুদ্ধির যে পর্য্যন্ত অবিসংবাদিত অধিকার, তাহার মধ্যে অকারণে রহস্য টানিয়া আনিলে কুসংস্কারের আবর্ত্তে পড়িতেই হইবে ; আবার তাহাদের একাধিপত্য স্বীকার করিলে ঠকিতেই হইবে। পরবর্ত্তী জীবনে যে ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের উপর কতকটা নির্ভর করিতে পারিয়াছি আমার বিশ্বাস যে এই ধারণাটা তাহাতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু তাহাই বা বলি কেন? নিজেই তো দেখিয়াছি যে ঠাকুরের দুর্নিবার আকর্ষণে কত তর্ক, কত যুক্তি স্রোতমুখে তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছে, কত অনমনীয় যুক্তিবাদী নির্ব্বিচারে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

আর একটা কথা বলিলেই আমার এই ভণিতা শেষ হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের পিছনে ঘোরা আমার বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কখন প্রবল হইয়া উঠিত,

কখন বা আস্তে আস্তে মন্দা হইয়া যাইত, কিন্তু একেবারে ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। এম্. এ., পরীক্ষা দিয়া ঢাকায় ফিরিবার কিছুদিন পরে আমার এক আত্মীয় আমাকে জানাইলেন যে সূত্রাপুর লোহার পুলের ঠিক পূর্ব্ব গায়ে একজন মুসলমান ফকীর আসিয়া আসন করিয়াছেন। তিনি সেখানে গিয়াছিলেন এবং তাহার বিশ্বাস হইয়াছে যে ফকীর সাহেব একজন প্রকৃত মহাপুরুষ। সেইদিনই বৈকালে ফকীর সাহেবের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম বহু লোক আসিয়া সেখানে জড় হইয়াছে, কেহ রাস্তার ধারে বসিয়া পড়িয়াছে, কেহ বা দাঁড়াইয়া আছে, প্রায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ফকীর সাহেবের দিকে তাকাইয়া আছে, কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার, আপন মনেই নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল সেখানে অপেক্ষা করিলাম কিন্তু ফকীর সাহেবের কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম না। তিনি আপন মনেই রহিলেন, কাহারও দিকে একবার দৃক্‌পাতও করিলেন না। আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি এমন সময়ে আমার পরিচিত এক কনেষ্টবলের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। সে আমাকে জানাইল যে গভীর রাত্রে যখন লোকজন নিতান্তই অল্প থাকে, তখন ফকীর সাহেব দু'টা একটা কথা বলেন, অন্য সময় নির্ব্বাকই থাকেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইলে একটু বেশী রাত্রে আসা প্রয়োজন। আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, তাড়াতাড়িতে ফকীর সাহেবের জন্য যে ফল কয়টি আনিয়াছিলাম তাহাও রাখিয়া আসিতে ভুল হইয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়াই পাড়ার এক

গাড়োয়ানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলাম যে সে আমাকে রাত্রি ১ টার পর ফকীর সাহেবের নিকট লইয়া যাইবে। রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় সেই ফল কয়টি লইয়া ফকীর সাহেবের আস্তানায় আসিয়া পৌঁছিলাম। গাড়ীটা পশ্চিম পারে রাখিয়া পুলটা হাটিয়াই পার হইলাম এবং অতি সন্তর্পণে ফল কয়টি ফকীর সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া রাস্তার উপরেই বসিয়া পড়িলাম। প্রায় ২০ মিনিট নীরবেই কাটিয়া গেল, আমিও কিছু বলিলাম না, ফকীর সাহেবও কিছু বলিলেন না। হঠাৎ এক সময় ফকীর সাহেব অত্যন্ত তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন: "ইধার উধার কাঁহে ঢুরতা? আরামসে ঘর্‌মে বৈঠ্‌ রহো, যব বক্‌ত্‌ হোগা, মিল্‌ যায়েগা।" এই কথার পর আমি আর সেখানে অপেক্ষা করিলাম না, ফকীর সাহেবকে সেলাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। আমার সাধু-খোঁজা বাতিক একেবারেই মিটিয়া গেল।

ঠাকুরের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নিতান্ত প্রয়োজন বোধেই নিজের সম্বন্ধে এই কথা কয়টি বলিয়া লইতে হইল। আমি কি উদ্দেশ্যে এবং কি প্রকার মনোভাব লইয়া ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম তাহা জানা না থাকিলে আমার ঠাকুরের সহিত প্রথম দিকের পরিচয় ও আনুষঙ্গিক কয়েকটি ব্যাপার পাঠক-পাঠিকাদের সহজবোধ্য হইবে না। হরেক রকম সাধুর পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে সাধু যাচাই করিবার একটা মাপকাঠি গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমি স্থির বুঝিয়াছিলাম যে আসক্তিমুক্ত না হইলে কেহই মতলবমুক্ত

হইতে পারে না এবং যিনি যত চতুরই হউন না কেন, সতর্কদৃষ্টির সম্মুখে, দুদিন আগে বা দুদিন পরে, তাহার মতলব-বাজী ধরা পড়িতে বাধ্য। হঠাৎ কিছু করিয়া বসিলে যে পরে পস্তাইতে হইতে পারে, এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। আমার এই বিচার-বুদ্ধি ঠাকুরের সম্বন্ধে কতটা কার্য্যকরী হইয়াছিল যথাস্থানে পাঠক-পাঠিকারা তাহা জানিতে পারিবেন।

২

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীতে প্রবেশ করিবার পর প্রায় আড়াই বৎসর আমি পুরাতন বৈঠক-খানায় একটি মেসে কাটাইয়াছিলাম। এইখানেই আমার বরদাবাবুর সহিত পরিচয় হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষের দিকে গ্রীষ্মাবকাশের পর মেসে ফিরিয়া দেখিলাম যে একটি নূতন প্রাণীর আমদানি হইয়াছে। একতলার একটি ঘরে একজন নবাগত ভদ্রলোক আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঐ ঘরে একটা তাসের আড্ডা ছিল, রবিবার প্রায় সমস্ত দিন এবং অন্যান্য দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এই আড্ডা নিয়মিত ভাবে চলিত এবং একটু লক্ষ্য করিতেই বুঝিলাম যে এই নবাগত ভদ্রলোকটিও দু'চার দিনের মধ্যেই এই আড্ডার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছেন। অনুমানে বুঝিয়াছিলাম যে ইনি আমাদের প্রায় সমবয়সী কিন্তু মাথায় একটি চক্‌চকে সুপরিসর টাক থাকায় ইহার চেহারাটা একটু ভারিক্কী মনে

হইত। যাহাই হউক, ঐ ঘরে পূর্ব্ব হইতেই দুই সহোদর দুইখানা সিট্ অধিকার করিয়া ছিলেন, কৌতূহলবশতঃ তাহাদের একজনের নিকটে সন্ধান লইয়া জানিলাম যে এই আগন্তুকটি উঁহাদেরই আত্মীয়, নাম বরদাচরণ রায়, বাড়ী বিক্রমপুর, এখানে কোন এক স্কুলে মাষ্টারী করেন এবং ল' পড়েন। কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় করিতে গোড়ার দিকে আমার অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলাই অভ্যাস সুতরাং এক মেসে থাকিলেও প্রায় দুই সপ্তাহ কাল ভদ্রলোকের সহিত আমার কোন বাক্যালাপই হইল না, হঠাৎ একদিন একটা অপ্রত্যাশিত রকমে বরদাবাবুর সহিত আমার আলাপ হইয়া গেল।

সেদিন ছিল রবিবার। উঁহাদের প্রাতঃকালীন তাসের আড্ডা বসি বসি করিতেছে এমন সময়ে মনে হইল যে দুই সহোদরে একটা তর্ক বাধিয়া গিয়াছে। আমার দোতলার ঘর হইতে বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, শুধু drop এবং letter, এই দুইটা কথা কয়েকবার কানে আসিল। ৫।৭ মিনিট পরেই তর্ক থামিয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম যে তাস খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে। এই সময় কি একটা কাজে বারান্দায় যাইয়া দেখিলাম যে বরদাবাবু নিজে খেলিতে বসেন নাই, দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। চোখাচোখি হইতেই আমি বরদা-বাবুকে হাতছানির সাহায্যে উপরে আসিতে আহ্বান করিলাম, তিনিও তৎক্ষণাৎ আমার ঘরে উঠিয়া আসিলেন। তর্কের ব্যাপারটা জানিবার জন্য আমার এমন কৌতূহল হইয়াছিল যে বরদাবাবুর সঙ্গে যে আমার এ পর্য্যন্ত বাক্যালাপও হয় নাই

এবং তাহাকে এভাবে ডাকিয়া আনা যে অসঙ্গত এরূপ কোন কথাই আমার মনে হইল না। ভাইয়ে ভাইয়ে এরূপ কথা কাটাকাটি প্রায়ই হইত এবং ইহা লইয়া আমরা মেসের অন্যান্য সকলেই বেশ আমোদ উপভোগ করিতাম। বরদাবাবু বলিলেন যে ছোট ভাই তাহার মামার নিকট একখানা পত্র লিখিয়া দাদাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পত্রের গোড়াতেই তিনি লিখিয়াছিলেন : "Very anxious, not a drop of letter for the last two months", ইহা লইয়াই তর্ক। দাদা বলিলেন যে 'drop of letter' কথাটা ভুল হইয়াছে কিন্তু ছোট ভাই তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিলেন না। আমি হাসিয়া উঠিলাম, বরদাবাবুও হাসিলেন, এবং এই হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়াই তাহার সহিত আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হইল।

দু'চার দিনের মধ্যেই বরদাবাবু তাসের আড্ডা ছাড়িয়া দিলেন এবং অবসর সময়ে নিয়মিত আমার ঘরে আসিয়া বসিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে কখনও তামাক খাইতেন না কিন্তু আমার সংস্পর্শে আসিয়া হপ্তাখানেকের মধ্যেই তামাক টানিতে শিখিলেন ও তামাক সাজার কাজটাও সাগ্রহে নিজের হাতেই তুলিয়া লইলেন। রবিবার ভিন্ন অন্য দিন কাজকর্ম্মের তাগিদে সকালবেলা বসিবার বিশেষ সুবিধা হইত না কিন্তু আমাদের সান্ধ্য আড্ডাটি বেশ জমিয়া উঠিল। অধিকাংশ সময় আমরা দুই-জনেই কথাবার্ত্তা বলিতাম, মাঝে মাঝে প্রভাতবাবুও আসিয়া জুটিতেন। তাসের আড্ডা হইতে অভিযোগ উঠিল যে আমি

বরদাবাবুকে যাহু করিয়া তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াছি এবং মেসের অন্যান্য মেম্বাররাও আমাদের এই নিয়মিত বিশ্রম্ভালাপ লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু এ সকল কিছুই আমরা গায়ে মাখিলাম না। কিছুদিন আমার মতিগতি লক্ষ্য করিয়া বরদাবাবু আমাদের আলোচনার মধ্যে ধীরে ধীরে দু' একটা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে লাগিলেন এবং এই বিষয়ে আমার ভিতরেও যে একটা আন্তরিক আকর্ষণ আছে, আমিও তাহা গোপন রাখিতে পারিলাম না। সুতরাং অতি শীঘ্রই ধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা প্রকারের প্রশ্নই আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। স্পষ্ট মনে আছে যে সংসারত্যাগী সাধুদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি সস্তা, মামুলী বকুনি ঝাড়িয়া আমি প্রথম প্রথম বরদাবাবুকে নাজেহাল করিতে চেষ্টা করিতাম। সাধুরা কাপুরুষ, জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হইবার সাহস নাই বলিয়াই সংসার ছাড়িয়া সরিয়া পড়ে, তাহারা escapist, সমাজের কোন কাজেই লাগে না, অথচ সমাজের ঘাড়ে বসিয়া আরামে কালাতিপাত করে! যে সকল সাধু কোন না কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে বা কতকটা বরদাস্ত করা যাইতে পারে কিন্তু যাহারা সামাজিক দায়িত্ব এড়াইয়া চলে তাহাদের প্রয়োজনীয়তাই বা কি, উপকারিতাই বা কি? কিন্তু বাহ্যিক সমাজ সেবার পরিমাপে সাধুত্বের বিচার করিতে বরদাবাবু কিছুতেই স্বীকৃত হইতেন না, সুতরাং তর্ক লাগিয়াই থাকিত। বরদাবাবু একদিন আমাকে বলিলেন: "আপনি খাঁটি সাধু দেখেন নাই, সেইজন্যই এই সব বাজে তর্ক তোলেন।" আমি তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি নিজে কোন প্রকৃত সাধু দেখিয়াছেন কিনা এবং আমাকে দেখাইতে পারেন কিনা। উত্তরে বরদাবাবু বলিলেন যে তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু দেখাইতে পারিবেন কিনা তাহা বলিতে পারেন না।

ইহার পর বরদাবাবু ক্রমে একটু একটু করিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে লাগিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই আমার মনে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক হইল। কিন্তু বরদাবাবুকে বিশেষ কিছুই জানিতে দিলাম না। তর্ক আগের মতই চালাইয়া গেলাম এবং বরদাবাবুর ঠাকুরকেও মোটেই আমল দিতে চাহিলাম না। বরদাবাবু কিন্তু মোটেই দমিলেন না, প্রায় প্রত্যহই ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিতেন এবং একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানাইলেন যে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাহার "আমার জীবন" গ্রন্থে ঠাকুরের সম্বন্ধে ছোট একটি নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। পরের দিনই কলেজ লাইব্রেরীতে যাইয়া নিবন্ধটি পড়িলাম, ইহাতে ঠাকুরকে একবার দেখিবার আগ্রহ অদম্য হইয়া উঠিল। ইহার কয়েক দিন পরে বরদাবাবু ঠাকুরের একখানা ফটো আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। উপর উপর দেখিয়া বেশী কিছু নজরে পড়িল না, সামান্য একখানা ধুতি পরিধান করিয়া নগ্নগাত্রে, মুক্তাসনে, যজ্ঞোপবীতধারী একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া রহিয়াছেন, বিশেষের মধ্যে শুধু গলায় একছড়া তুলসীর মালা। কিন্তু আমার দুটা একটা লক্ষণ জানা ছিল, সেগুলি মিলাইয়া পাইতেই মনটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মুখে কিছুই বলিলাম না কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের প্রতি একটা

ঐকান্তিক আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। ইহার পর হইতে আমাদের তর্কের তীব্রতা অনেকটা কমিয়া গেল, বরদাবাবুও সাগ্রহে ঠাকুরের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ও তদীয় গুরু সম্বন্ধে কয়েকটা অলৌকিক কাহিনী বরদাবাবু আমাকে জানাইয়াছিলেন স্মরণ আছে, কিন্তু এগুলি যে তখন নির্বিবচারে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

অবশেষে সেই অতি শুভ দিনটি আসিল, ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন পাইলাম। যতদূর স্মরণ হয়, সময়টা বোধ হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ, তারিখটা কিছুতেই মনে পড়িতেছে না। বন্ধুবর পরলোকগত খ্যাতনামা অধ্যাপক ৺বেণীমাধব বড়ুয়া তখন শিয়ালদহ ষ্টেশনের উল্টা দিকে একটা বাড়ীতে থাকিতেন। আমি সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়াছিলাম, ডক্টর বড়ুয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অশোকের কোনও এক শিলালিপি সম্বন্ধে তাহার এক নূতন আবিষ্কারের কথা আমাকে বুঝাইতেছিলেন। এমন সময় দেখি যে বরদাবাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি জনান্তিকে আমাকে জানাইলেন যে ঠাকুর কলিকাতা আসিয়াছেন এবং শীঘ্র চলিয়া গেলে তখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। কিন্তু ডক্টর বড়ুয়া আমাকে সহজে ছাড়িলেন না এবং আমার যে বিশেষ কোনও গরজ নাই, শুধু তাহার খাতিরেই যাইতেছি, বরদাবাবুকে ইহা বুঝাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই একটু বিলম্ব করিলাম। রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম যে ৯'টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম : "আজ রাত্রি হইয়া

গিয়াছে, ঠাকুরকে বিরক্ত না করাই ভাল, কাল প্রাতেই না হয় যাইব।" কিন্তু বরদাবাবু আমার কথা আমলেই আনিলেন না এবং তাহার আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইল। ঠাকুর আসিয়া উঠিয়াছিলেন ১৮৬নং বৌবাজারে তেতলার একটি মেসে। এখানে প্রধানতঃ নিকটবর্ত্তী কাপড় ও কাটা কাপড়ের দোকানের কর্ম্মচারীরা থাকিতেন। আমরা তেতলায় যাইয়া পৌঁছিতেই এক ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তিনি জানাইলেন যে ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন, রাত্রিও হইয়াছে, এ সময়ে তাঁহাকে বিরক্ত না করিয়া আমাদের ফিরিয়া যাওয়াই সঙ্গত। আমি তৎক্ষণাৎ ফিরিতে উদ্যত হইলাম কিন্তু বরদাবাবু এক রকম জোর করিয়াই আমাকে ঠাকুরের ঘরে লইয়া গেলেন, ভদ্রলোকের আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। নাতিবৃহৎ একখানি ঘর, তিনখানা তক্তাপোশ পাতা রহিয়াছে। তাহারই একখানিতে চাদর মুড়ি দিয়া ঠাকুর শুইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমি পুনরায় বরদাবাবুকে বলিলাম যে আমাদের চলিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত কিন্তু বরদাবাবু নাছোড়বান্দা, সুতরাং একখানা তক্তাপোশের উপর নীরবে বসিয়া রহিলাম। এইভাবে প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন এবং বরদাবাবুকে কুশল প্রশ্নাদি করিলেন। আমি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্ববৎ নীরবেই বসিয়া রহিলাম।

একটু পরে ঠাকুর নিজ হইতেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কি বলিয়াছিলেন কিছুই স্মরণ নাই, শুধু এলোমেলো ভাবে দু'একটা কথা মনে পড়িতেছে। একবার যেন বলিয়াছিলেন

যে গাঢ় ঘুমের সময় কিছুই থাকে না, মন বুদ্ধির ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায় এবং সত্যের এরূপ একটা লক্ষণ যেন দিয়াছিলেন যে যাহা কিছুতেই বর্জ্জন করা যায় না, তাহাই সত্য। অন্ধকার ও আলো একত্রে থাকিতে পারে না, এই কথাটার সূত্র ধরিয়াও খানিকটা কি বলিয়াছিলেন, মনে পড়ে। পরে ঠাকুরের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহার সাহায্যে এই কথা কয়টি মিলাইয়া একটা কিছু দাঁড় করাইয়া দিতে অনায়াসেই পারি। কিন্তু সে আমার কথা হইবে, ঠাকুরের কথা হইবে না। এই প্রথম সাক্ষাতের দিনে ঠাকুরের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিটিও যে আমার মনে কোন আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। সেখানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ছিল না, ঘরের এক কোণায় টিম্‌টিম্ করিয়া একটা হারিকেন জ্বলিতেছিল, সেই অস্পষ্ট আলোকে তাঁহাকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার সুযোগই হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সেই অপরূপ কথা বলার ভঙ্গীটি প্রথম হইতেই আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রায় ২০ মিনিট একটানা কথা বলিয়া গেলেন, তাঁহার সেই শান্ত, মধুর স্বরপ্রবাহ এক ভাবেই চলিল। কোন উত্থান-পতন নাই, সহজ, স্বাভাবিক ভাবে যেন আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যে ইহা নিজে কখন শুনে নাই, তাহাকে সহজে এই ব্যাপারটা বুঝান যাইবে না।

আরও একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখা সমীচীন মনে হইতেছে। ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন, ফটোতে যাহা দেখিয়াছিলাম প্রায় সেইরূপই দেখিলাম, পরিধানে অতি সাধারণ একখানা থান ধুতি, গাত্র সম্পূর্ণ নগ্ন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত এবং গলায় এক ছড়া

তুলসীর মালা। সাধূচিত বেশভূষার কিছুই তাঁহার নাই, সুতরাং আচমকা অভিভূত হইবার মত কিছুই সেখানে ছিল না। কিন্তু সেখানে যাহা দেখিলাম, অন্য কোথাও তাহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দীর্ঘ ৪।৫ বৎসর ব্যাপিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী ঘাঁটিয়া আসিয়াছি, যেখানে গিয়াছি সেখানেই মনে হইয়াছে যে সাধুজী যেন অনেক উচ্চে বসিয়া রহিয়াছেন এবং সেখান হইতে নেহাৎ কৃপা করিয়া আমাদের উপর উপদেশবাণী বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার এবং অন্যান্য সকলের মধ্যে একটা পার্থক্য যেন স্বতঃই সেখানে বিরাজমান এবং সাধুজীও এ সম্বন্ধে যেন বিশেষভাবেই সজাগ। কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্কোচে এবং একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করিয়াছি। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের দিনেই ঠাকুরের নিকট বসিয়া এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল যেন তিনি আমাদেরই একজন, নিতান্ত অন্তরঙ্গের মতই আলাপ আলোচনা করিতেছেন। আমার বক্তব্যটা বুঝাইতে পারিলাম কিনা জানি না, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে কথাটা আরও একাধিকবার আসিবে এবং ভরসা করি যে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

রাত্রি হইয়াছিল, সুতরাং ঠাকুরের কথা শেষ হওয়ার দু'চার মিনিট পরেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমরা মেসের দিকে রওয়ানা হইলাম। পথে বরদাবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "ঠাকুরকে কেমন দেখ্‌লেন?" উত্তরে আমি কি বলিয়াছিলাম স্মরণ করিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক, পরের দিন প্রাতঃকালে প্রভাতবাবুকে সংবাদ দিয়া আসিলাম, স্থির হইল যে

কলেজের পর ৪'টা নাগাদ একত্রে ঠাকুরের নিকট যাইব। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বরদা বাবু ও প্রভাতবাবুকে সঙ্গে লইয়া আবার ঠাকুর দর্শনে আসিলাম। সেই ১৮৬নং বৌবাজার তেতলার একটি বড় ঘরে একখানা সতরঞ্চি বিছান রহিয়াছে, একদিকে ঠাকুর বসিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কতিপয় ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে তাঁহার কথা শুনিতেছেন। আমরা যাইয়া প্রণাম করিতেই ঠাকুর অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের বসাইলেন, একটু যেন বিশেষ আদর আপ্যায়ন করিলেন। ইহার কারণ তখন কিছু বুঝি নাই কিন্তু কিছুকাল ঠাকুরের সঙ্গ করিবার পর কতকটা যেন বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং যথাস্থানে কথাটার আলোচনা করিব। আমরা আসিতেই ঠাকুর নীরব হইয়া রহিলেন এবং অন্যান্য সকলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। প্রভাতবাবু ধীরে ধীরে তাহার প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। প্রশ্নটি উত্থাপন করিতে বন্ধুবরের প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। অনেক কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সামান্য দু'চারটি এখনও আমার স্মরণে আছে। প্রভাতবাবু বলিয়াছিলেন যে কেহ ভীমনাগের সন্দেশ খায়, কেহ চানাচুরও পায় না, এই বৈষম্যের কি প্রয়োজন ছিল? তিনি এক ছিলেন, এক থাকিলেই তো পারিতেন, বহু হইয়া প্রকাশ হইতে তাঁহাকে কে বলিয়াছিল? আর একটা কথাও বেশ স্পষ্ট মনে আছে। প্রভাতবাবু কি একটা শব্দের প্রসঙ্গে বতুপ্ প্রত্যয় কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন : "বতুপ্ কি?" তৎক্ষণাৎ প্রভাতবাবু ব্যাকরণের একটি

সূত্র ঝাড়িয়া দিলেন। বরদাবাবুই না কে যেন বলিলেন: "উনি ত আর গ্রামার পড়েন নাই।" বিশেষ করিয়া কথাটা মনে আছে এই জন্য যে পরে প্রভাতবাবু অনেক সময়ে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে তিনি এমন একটা হস্তিমূর্খ যে ঠাকুরকে গিয়াছিলেন বতুপ্-প্রত্যয় বুঝাইতে।

প্রভাতবাবু যে প্রশ্নটা করিলেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঠিক এই প্রশ্নটাই আমার মনে দানা বাঁধিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত, সুতরাং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ঠাকুরের উত্তর শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠাকুর কি বলিয়াছিলেন তাহার প্রায় কিছুই স্মরণে আসিতেছে না। শুধু এইটুকুই মনে আছে যে "সবই ভ্রান্তি" এই কথাটা বলিয়াই ঠাকুর তাঁহার উত্তর আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর একটানা অনেকক্ষণ বলিয়াছিলেন, স্পষ্ট মনে আছে যে আমরা যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসি তখন রাস্তায় আলো জ্বলিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কথা মোটেই বুঝিলাম না, আমাদের সমস্যার কোন মীমাংসা হইল না। কিন্তু সেদিন যে ঠাকুরের কাছে কিছুই পাই নাই, এমন কথাও বলিতে পারি না। কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে, ঠাকুর এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাইতেছিলেন। যাহারা ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন এবং একটু নিবিষ্ট মনে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা অনেকেই অল্প বিস্তর এই স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টির সহিত পরিচিত। কিন্তু শুধু স্নেহ-স্নিগ্ধ বলিলে কিছুই বলা হইল না। এই দৃষ্টিকে বিশদ করিয়া বুঝাইবার

ভাষা আমার জানা নাই, শুধু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে ইহাতে পাইয়াছিলাম প্রাণস্পর্শী আশ্বাস ও এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ। কিন্তু সেই দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিনেই যে এতটা ভাবিয়াছিলাম বা বুঝিয়াছিলাম, তাহাও বলিতে পারি না। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিয়া সিগারেট সহযোগে আমাদের মতামত জাহির করিয়াছিলাম, বেশ মনে আছে। প্রভাতবাবু বলিয়াছিলেন যে ইনি একজন যোগী, সন্দেহ নাই, কিন্তু মনে হইল যেন কখন যুক্ত থাকেন, কখন যুক্ত থাকেন না; স্থৈর্য্যও অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছেন কিন্তু কথাবার্ত্তা যাহা বলিলেন তাহার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝা গেল না। আমি কিছু বলিয়াছিলাম কিনা স্মরণ করিতে পারিতেছি না কিন্তু এইটুকু স্পষ্ট মনে আছে যে আমাদের কথাবার্ত্তায় বিরক্ত হইয়া বরদাবাবু মুখ ভার করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে এই ব্যাপারটা লইয়া নিজেদের মধ্যে কত রহস্যালাপ ও কত আনন্দই না করিয়াছি!

পরের দিন প্রাতঃকালে বরদাবাবুর ঐকান্তিক আগ্রহে আবার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। আমরা উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুর বুদ্ধ সম্বন্ধে কি যেন বলিতেছেন। দু'চার মিনিট ঠাকুরের কথা শুনিয়াই আমার মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। আমার মনে হইল যে ঠাকুর বুদ্ধদেবের বাস্তবিকতা উড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে একটি রূপক কল্পনা করিয়া আলোচনা করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ আমার ঐতিহাসিক বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিল, আর সেখানে

বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। বরদাবাবুও বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন না, সুতরাং অল্প কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। রাস্তায় বরদাবাবুকে বলিলাম যে আমার এখানে পোষাইবে না, অযথা ঘোরাঘুরি করিয়া কোন লাভ হইবে না, বরদাবাবু বিশেষ কিছু বলিলেন না, নীরবেই মেসে ফিরিয়া আসিলাম।

৩

সে যাত্রায় আর ঠাকুরের দর্শন পাইলাম না, শুনিলাম তিনি বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছেন, এখন কিছুকাল সেখানেই অবস্থান করিবেন। যদিও সেদিন হঠকারিতা করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম, তথাপি খবরটা শুনিয়া মনটা যেন খারাপ হইয়া গেল, ভাবিলাম যে আরও এক আধবার দেখা হইলে বোধ হয় মন্দ হইত না। দু'এক দিন পরে বরদাবাবু বলিলেন যে আমি ও প্রভাতবাবু যে দিন একত্রে ঠাকুর দর্শনে গিয়াছিলাম সেদিন এক ভদ্রলোক পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুরের নিকটে বসিয়াছিলেন এবং আমরা চলিয়া আসার পরেও কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে আমরা ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন: "দুইটা জাহাজ আস্‌তে আছে"। আমরা ফিরিয়া আসিবার পর আবার নাকি বলিয়াছিলেন: "জাহাজ দুইটা আইসা একটা ফ্ল্যাট-নৌকার সঙ্গে ধাক্কা খাইল, ফ্ল্যাট-নৌকার কিছুই হইল না, জাহাজ দুইটাই ঝাঁকানি

খাইয়া গেল।” কথাটা শুনামাত্রই আমার মনের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইল কিন্তু মুখে কিছুই বলিলাম না। “জাহাজ” কথাটা এরূপ স্থলে সাধারণতঃ ব্যাঙ্গার্থেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু সেজন্য ঠাকুরের প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব মনের কোণেও স্থান পাইল না, ভাবিলাম যে আমি গিয়াছিলাম আমার বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান, আমার বিচার-কুশলতার অভিমান ও আমার অভিজ্ঞতার অভিমান লইয়া ঠাকুরকে যাচাই করিতে এবং ভিতরে ভিতরে যে একটু ঔদ্ধত্যও ছিল না, তাহাও হলফ করিয়া বলিতে পারি না। সুতরাং ঠাকুর যদি আমাকে একটা অভিমানের “জাহাজ” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কিছুই থাকিতে পারে না। আর, ঝাঁকানি যে একটা খাইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতেও বিলম্ব হইল না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম যে ঠাকুরকে যেন ঠিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি নাই, নিজে কোন কথা বলিও নাই, সবই যেন কেমন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। আর একবার দেখা হইলে খোলাখুলি কথাবার্ত্তা বলিয়া একবার দেখিতাম যে বাস্তবিকই তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি কিনা। আর মাঝে মাঝে তাঁহার সেই মনোলোভা চাহনি আমার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়া আমাকে প্রবল ভাবে ঠাকুরের দিকে আকর্ষণ করিত, আমি ভিতরে ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিতাম।

কিন্তু আমার এই অবস্থাটা গোপনেই রাখিলাম, বরদাবাবুকে ইহার কিছুই জানিতে দিলাম না। মাঝে মাঝে ঠাকুর প্রসঙ্গ উঠিত কিন্তু পূর্ব্বের মত আর জমিতে চাহিত না। যতদূর স্মরণ হয়

ঠাকুরের বৃন্দাবন চলিয়া যাওয়ার কয়েকদিন পরে প্রভাতবাবু একদিন একখানা চিঠি আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার শিষ্য, "ধর্ম্মসার সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা ৺যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক ভদ্র-লোকের মারফৎ চিঠিখানা ঠাকুরকে লিখিয়াছিলেন। চিঠিখানার বয়ান এখনও আমার মনে আছে। ইহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন: "রাম, তুমি নাকি বলিয়াছ যে আমার গুরুদেব আবার দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন। তোমাকে আমি মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। আমার বিনীত অনুরোধ যে গুরুদেব কোথায় কি ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাকে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবা।" প্রভাতবাবু বলিলেন যে যামিনীবাবুর মত একজন কৃতবিদ্য ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি যাঁহাকে মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন তিনি কখনই একজন সাধারণ লোক হইতে পারেন না, সুতরাং ঠাকুরকে আর একবার বেশ ভাল করিয়া বাজাইয়া দেখিতে হইবে। আমার তৎকালীন মানসিক অবস্থায় ঠাকুরের সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাইবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না, তথাপি এই চিঠিখানা যে আমার মনের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করে নাই, একথা বলাও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল এবং আমি ঢাকা চলিয়া গেলাম। কিন্তু ঠাকুর আমাকে পাইয়া বসিয়াছিলেন, বরদাবাবুর ইন্ধনের আর কোন প্রয়োজন ছিল না। ঢাকায় নূতন পরিবেশের মধ্যে আসিয়াও আমার ভিতরের অবস্থার

বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। বেশ বুঝিতে পারিতাম যে ঠাকুর আমাকে তাঁহার নিকটে টানিতেছেন কিন্তু মনে প্রাণে সাড়া দিতে পারিতাম না। ঢাকায় গেলে আমি সাধারণতঃ প্রফুল্লবাবু (৺প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, স্কুলে ও কিছুদিন কলেজে ইনি আমার সহপাঠী ছিলেন, পরে বিবাহ সূত্রে ইহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল) ও হরিদাসবাবুর (শ্রীহরিদাস আচার্য্য, আমার শ্বশুরবাড়ীর নিকটে ইহার বাড়ী ছিল, প্রফুল্ল-বাবুর মাধ্যমে ইহার সহিত আমার পরিচয় হয় এবং ক্রমে সেই পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়) সঙ্গেই অধিকাংশ সময় কাটাইতাম, নানাপ্রকার গল্পগুজব, তাস, দাবা, মাঝে মাঝে নৌকাভ্রমণ এবং কখনো বা একটু বিশেষ খানাপিনায় সময়টা আনন্দেই কাটিয়া যাইত, ছুটি যে কোন্ দিক দিয়া কি করিয়া শেষ হইয়া যাইত, টেরও পাইতাম না। এবার কিন্তু জমিতে চাহিল না। অনেকবার বলি বলি করিয়া অবশেষে একদিন প্রফুল্লবাবু ও হরিদাসবাবুকে ঠাকুরের কথাটা বলিয়াই ফেলিলাম, হরিদাসবাবু নীরবেই রহিলেন কিন্তু প্রফুল্লবাবু মন্তব্য করিলেন : "বুঝেছি, তোমার মত একটা পাষণ্ডকেও যখন টলাইয়াছে, তখন লোকটা নিশ্চয়ই একটু বেশী পাকা।" ইহার পর আর অগ্রসর হওয়া চলে না সুতরাং প্রসঙ্গটা ঐখানেই চাপা পড়িয়া গেল।

ছুটির শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম, আবার সেই আমি ও বরদাবাবু। ঠাকুর কোথায় আছেন এবং কবে পর্য্যন্ত কলিকাতায় আসিবেন, বরদাবাবুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা হইত, কিন্তু আমার সেই হঠকারিতার

কথা মনে করিয়া কিছুতেই পারিতাম না। কি প্রসঙ্গে কথাটা উঠিয়াছিল ঠিক মনে নাই, বরদাবাবু একদিন বলিলেন যে ঠাকুর বৃন্দাবনে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, শীঘ্রই কলিকাতা আসিবেন। আমি বাহ্যিক বিশেষ কোনও আগ্রহ দেখাইলাম না কিন্তু মনে মনে দিন গুণিতে লাগিলাম। কয়েক দিন পরে বরদাবাবু বলিলেন যে ঠাকুর আসিয়াছেন এবং পটুয়াটোলায় ৺সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের (সুপরিচিত কংগ্রেসকর্ম্মী, পুরাতন সংবিধানে ইনি ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন; শুনিয়াছি যে জাজিরা চরে অন্তরীণ থাকার সময় ঠাকুরের সহিত ইহার প্রথম পরিচয় হয়) বাসায় উঠিয়াছেন। আমি কি বলিয়াছিলাম স্মরণ নাই কিন্তু বরদাবাবু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব কিনা, তখন এমন ভাব দেখাইলাম যে আমার যাওয়া না-যাওয়াতে বিশেষ কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, শুধু বরদাবাবুর খাতিরেই যেন যাইতে সম্মত হইতেছি।

পরের দিন সকাল বেলা বরদাবাবুর সহিত ঠাকুর দর্শনে আসিলাম। এইটি আমার জীবনের একটি অতি শুভ দিন কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে তারিখটা কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। শুধু এইটুকুই মনে পড়ে যে সময়টা ছিল শীতকাল, সম্ভবতঃ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাস। আমরা ঘরে ঢুকিতেই বরদাবাবু "ইন্দুবাবু" বলিয়া আমাকে ঠাকুরের নিকট পরিচিত করিলেন। আমি প্রণাম করিয়া উঠিতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন: "ভাল আছেন?"

দুইটি মাত্র কথা কিন্তু ইহাতে যে কি ছিল, তাহা আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। কত স্নেহ, কত আশ্বাস, কত সান্ত্বনা, যে এই কথা দুইটির মধ্যে ছিল, তাহা অপরকে বুঝান যাইবে না। শুধু ইহাই বলিতে পারি যে আমি নিঃসন্দেহে বুঝিলাম যে তিনি আমাকে আপন করিয়া লইলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন প্রথম ঠাকুরকে দেখিলাম, তখনই তাঁহার রোগ-কাতর মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বহুদিন ক্ষৌরকার্য্য বন্ধ থাকায় মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রোগ-শীর্ণ দেহ, ধীরে ধীরে যেন অতি কষ্টে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এই দৃশ্য দেখিয়া আমার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। তিনি যে আমার অত্যন্ত আপনার জন ইহা যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। একটা বিপর্য্যয় হইয়া গেল। আমার বিদ্যাভিমান, আমার সমস্যা, আমার বিচার-বিতর্ক, সবই যেন স্রোতমুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল, আমি অজানিতে ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিলাম। প্রীতির বাঁধনে তিনি আমাকে আটকাইয়া ফেলিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। বরদাবাবুকে বিশেষ কিছুই বলিলাম না, তিনিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, অন্য একটা মুখরোচক ব্যাপার হাতের কাছেই ছিল এবং সেই বিষয়েই আমাদের কথাবার্ত্তা হইল। বৃন্দাবন থাকাকালীন ঠাকুরের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ভদ্রলোকটি তিলক-মালা-ভূষিত, দীর্ঘশিখ, একজন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব। আমরা আসিয়া দেখি যে তিনি দুইজন শিষ্য

কথা মনে করিয়া কিছুতেই পারিতাম না। কি প্রসঙ্গে কথাটা উঠিয়াছিল ঠিক মনে নাই, বরদাবাবু একদিন বলিলেন যে ঠাকুর বৃন্দাবনে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, শীঘ্রই কলিকাতা আসিবেন। আমি বাহ্যিক বিশেষ কোনও আগ্রহ দেখাইলাম না কিন্তু মনে মনে দিন গুণিতে লাগিলাম। কয়েক দিন পরে বরদাবাবু বলিলেন যে ঠাকুর আসিয়াছেন এবং পটুয়াটোলায় ৺সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের (সুপরিচিত কংগ্রেসকর্ম্মী, পুরাতন সংবিধানে ইনি ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন; শুনিয়াছি যে জাজিরা চরে অন্তরীণ থাকার সময় ঠাকুরের সহিত ইহার প্রথম পরিচয় হয়) বাসায় উঠিয়াছেন। আমি কি বলিয়াছিলাম স্মরণ নাই কিন্তু বরদাবাবু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব কিনা, তখন এমন ভাব দেখাইলাম যে আমার যাওয়া না-যাওয়াতে বিশেষ কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, শুধু বরদাবাবুর খাতিরেই যেন যাইতে সম্মত হইতেছি।

পরের দিন সকাল বেলা বরদাবাবুর সহিত ঠাকুর দর্শনে আসিলাম। এইটি আমার জীবনের একটি অতি শুভ দিন কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে তারিখটা কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। শুধু এইটুকুই মনে পড়ে যে সময়টা ছিল শীতকাল, সম্ভবতঃ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাস। আমরা ঘরে ঢুকিতেই বরদাবাবু "ইন্দুবাবু" বলিয়া আমাকে ঠাকুরের নিকট পরিচিত করিলেন। আমি প্রণাম করিয়া উঠিতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন: "ভাল আছেন?"

দুইটি মাত্র কথা কিন্তু ইহাতে যে কি ছিল, তাহা আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। কত স্নেহ, কত আশ্বাস, কত সান্ত্বনা, যে এই কথা দুইটির মধ্যে ছিল, তাহা অপরকে বুঝান যাইবে না। শুধু ইহাই বলিতে পারি যে আমি নিঃসন্দেহে বুঝিলাম যে তিনি আমাকে আপন করিয়া লইলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন প্রথম ঠাকুরকে দেখিলাম, তখনই তাঁহার রোগ-কাতর মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বহুদিন ক্ষৌরকার্য্য বন্ধ থাকায় মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রোগ-শীর্ণ দেহ, ধীরে ধীরে যেন অতি কষ্টে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এই দৃশ্য দেখিয়া আমার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। তিনি যে আমার অত্যন্ত আপনার জন ইহা যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। একটা বিপর্য্যয় হইয়া গেল। আমার বিদ্যাভিমান, আমার সমস্যা, আমার বিচার-বিতর্ক, সবই যেন স্রোতমুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল, আমি অজানিতে ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিলাম। প্রীতির বাঁধনে তিনি আমাকে আটকাইয়া ফেলিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। বরদাবাবুকে বিশেষ কিছুই বলিলাম না, তিনিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, অন্য একটা মুখরোচক ব্যাপার হাতের কাছেই ছিল এবং সেই বিষয়েই আমাদের কথাবার্ত্তা হইল। বৃন্দাবন থাকাকালীন ঠাকুরের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ভদ্রলোকটি তিলক-মালা-ভূষিত, দীর্ঘশিখ, একজন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব। আমরা আসিয়া দেখি যে তিনি দুইজন শিষ্য

সমভিব্যাহারে ঠাকুরের নিকট বসিয়া রহিয়াছেন। হয়তো অনেকক্ষণ আসিয়াছিলেন, কারণ আমরা আসিবার মিনিট দশেক পরেই তিনি চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উঠি উঠি করিয়াও প্রায় আধঘণ্টা নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি বাস্তবিকই উঠিলেন, কিন্তু উঠিলে হইবে কি, ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে তাহার প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগিয়া গেল। তাহার ও তাহার শিষ্যদ্বয়ের প্রণাম এবং নমস্কার আর যেন ফুরাইতে চাহে না। প্রথমে তিনি ঠাকুরের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন, শিষ্যদ্বয়ও তাহাই করিল। পরে একটু পিছাইয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে মেঝের উপর প্রায় ৩ মিনিট কাল পড়িয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, এবং হাতজোড় করিয়া কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তা'র পর আরম্ভ হইল উপস্থিত ভদ্র-লোকদিগের সহিত নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পালা। তিনি একবার নমস্কার করেন, স্বভাবতঃই প্রতিনমস্কার হয়, কিন্তু তিনি আবার নমস্কার করেন, আবার প্রতিনমস্কার হয়, নমস্কারের পালা শেষ হয় না। শিষ্যদ্বয়ও হুবহু গুরুদেবকে অনুকরণ করিয়া চলিলেন। আমার মনে হইল যে ভদ্রলোকটির যেন ইচ্ছা যে শেষ নমস্কারটি তিনিই করেন। যাহাই হউক, ভদ্রলোক শিষ্য-দ্বয়কে লইয়া কোনও প্রকারে দরজার নিকটে পৌঁছিলেন, আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং জোড়হস্তে নিমিলীত নেত্রে খানিকক্ষণ কাটাইয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। ব্যাপারটা আমাদের চক্ষে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিল এবং এই বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে আমরা মেসে ফিরিয়া গেলাম।

এ যাত্রায় আর ঠাকুরের দর্শনলাভের সুযোগ হইল না, তিনি কাশী হইয়া আবার বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমাদের ঠাকুর প্রসঙ্গ আবার জমিয়া উঠিল। ঠাকুর ও তদীয় গুরু সম্বন্ধে বরদাবাবু অনেক কিছুই বলিতেন স্মরণ আছে, কিন্তু গুরুর প্রসঙ্গ আমার তেমন মনঃপূত হইত না, আমি ঠাকুরের কথাই বেশী শুনিতে চাহিতাম। "গুরুদেব" না বলিয়া শুধু "গুরু" বলাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে শ্রদ্ধার অভাব সূচিত হইতেছে, কিন্তু "গুরুদেব" কথাটা ঠাকুরের মুখে কোন দিনই শুনি নাই, তিনি শুধু "গুরু"ই বলিতেন। ইহার তাৎপর্য্য আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিব। সে যাহাই হউক, এই ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমি বৈঠকখানার মেস ছাড়িয়া দিলাম। গ্রীষ্মাবকাশের পর দর্জ্জিপাড়া অঞ্চলে একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে তাহাতে আসিয়া উঠিলাম। এইখানেই আমার ঠাকুরের সহিত পরিচয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় সূচিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

যতদূর স্মরণ হয়, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষের দিকে বরদাবাবু একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ঠাকুরের একখানি চিঠি আমাকে দেখাইলেন। ঠাকুর লিখিয়াছিলেন যে তিনি বৃন্দাবন হইতে শীঘ্রই কলিকাতা আসিবেন, নিরিবিলি থাকিতে পারেন এমন একটি স্থান যেন বরদাবাবু তাঁহার জন্য স্থির করিয়া রাখেন। প্রভাতবাবুকেও চিঠিখানা দেখান হইল। তাহার বাড়ীতে তখন নিতান্তই স্থানাভাব, আর এদিকে আমার বাড়ীতে তেতলায় নির্জ্জন একখানা ঘর ছিল, আমার লেখাপড়ার কাজে ব্যবহৃত হইত। কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হইল যে ঠাকুর আসিয়া আমার বাড়ীতেই উঠিবেন। বরদাবাবু চিঠিতে ঠাকুরকে এই বন্দোবস্তের কথা জানাইয়া দিলেন।

ইহার প্রায় ১০।১২ দিন পরে বরদাবাবু আমাকে জানাইলেন যে ঠাকুরের উত্তর আসিয়াছে, তিনি অমুক তারিখে (সঠিক তারিখটি কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না) কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং আমার বাড়ীতেই থাকিবেন। আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু আতঙ্কও যে না হইল, তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমি ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে গেলে কিছুই জানি না, তিনি আমার এখানে আসিলে যথারীতি

তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যা করিয়া উঠিতে পারিব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, সুতরাং কি করিতে হইবে, না হইবে, ইত্যাদি খুঁটিনাটি বরদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলাম কিন্তু বরদাবাবু দু'একটা কথাতেই আমার সকল প্রশ্নের অবসান করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন : "আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, শুধু একখান বিছানা পাতিয়া দিলেই চলিবে। ঠাকুর স্নান করেন না, আহারও একপ্রকার নাই বলিলেই চলে, কোন ঝঞ্ঝাটই নাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর আমি যখন অনেক সময়েই এখানে থাকিব, কোন অসুবিধাই হইবে না।" বরদাবাবুর কথাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম বটে কিন্তু তবুও একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না।

কিন্তু ঠাকুর আসিবেন, এই আনন্দে আনুষঙ্গিক দুশ্চিন্তাগুলি শীঘ্রই চাপা পড়িয়া গেল, আমি সাগ্রহে সেই অতি শুভ দিনটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বরদাবাবু বলিয়াছিলেন যে ঠাকুর সকাল বেলা ৯টা নাগাদ পৌছিবেন, আমি পূর্ব্বের দিনই ঘরদোর পরিষ্কার করাইয়া এবং ঠাকুরের বিছানাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না, ভোর হইতেই অনর্থক উপর নীচ করিয়া, ৫।১০ মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখিয়া রাস্তার দিকে তাকাইতে লাগিলাম। ক্রমে ৮টা, ৯টা, ১০টা বাজিয়া গেল কিন্তু ঠাকুর আসিলেন না। যখন ১১টা বাজিয়া গেল, তখন আমি সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল।

তখন বুঝি নাই কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারি, এই যে

না-আসা ইহাও তাঁহার একটি পরম আশীর্ব্বাদ। ইহার পর আনুমানিক দুই সপ্তাহ কাল যেরূপ উৎকণ্ঠা, যেরূপ আবেগ ও যেরূপ আকুতি লইয়া কাটাইয়াছিলাম ও যেরূপ অনন্যভাবে তাঁহার চিন্তা করিয়াছিলাম, তেমন বোধ হয় জীবনে আর কখনও হয় নাই। আমি তখন ২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক তরলমতি যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও কিছু কিছু ঐতিহাসিক গবেষণার প্রাথমিক চেষ্টা, গান্ধীবাদ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ক্রিকেট, ফুটবল, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদিতে বেশ মশগুল হইয়া আছি, দাবা খেলিয়া ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রহস্যালাপেও অনেক সময় কাটাইয়া দেই; এহেন যে নিতান্ত বহির্মুখ আমি, সেই আমাকেও সব ভুলাইয়া একটা প্রবল আকর্ষণে টানিতে লাগিল। এ যে কি আকর্ষণ এবং ইহার যে কি শক্তি, তাহা বলিয়া বুঝান যাইবে না। যিনি কখনও ইহা অনুভব করিয়াছেন শুধু তিনিই বুঝিতে পারিবেন। বৈষ্ণব কবিদিগের পূর্ব্বরাগের পদগুলির তাৎপর্য্য যেন নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম।

এইভাবে প্রায় ১০।১২ দিন কাটিয়া গেল। মাঝে বরদাবাবু একদিন জানাইয়া গিয়াছিলেন যে ঠাকুরের আর কোনও সংবাদ তিনি পান নাই, ঠাকুর কি করিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আরও কয়েকদিন পরে বেলা প্রায় ১১টার সময় আমি কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, এমন সময় সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি তখন বিলাতী পোষাক পরিতাম, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টাই বাঁধিতেছিলাম, সুতরাং বিশেষ মনোযোগ করিলাম না, ভাবিলাম আর কেহ

দরজা খুলিয়া দিবে। আবার ডাক শুনিলাম "ইন্দুবাবু, ইন্দুবাবু," মনে হইল যেন বরদাবাবুর গলা। আমি তাড়াতাড়ি দোতলার জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম যে একটি থলিয়া হস্তে বরদাবাবু দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাহার পাশেই ঠাকুর। আমি তৎক্ষণাৎ টাইটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলাম এবং দরজা খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। পরে তাঁহাকে তেতলার সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরে লইয়া আসিলাম, বরদাবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঘরটি পরিষ্কার করিয়া ঠাকুরের জন্য যথাযথ ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং সেই ব্যবস্থাই অক্ষুণ্ণ ছিল। বরদাবাবু ও আমি ঠাকুরের বিছানাটা পাতিয়া ফেলিলাম, বরদাবাবু ঠাকুরের পা ধোয়াইয়া দিলেন; তিনি আসিয়া বিছানার উপরে বসিলেন। কোন কথাই বলিতে পারিলাম না, শুধু অপলক দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনিও আমার দিকেই তাকাইয়া-ছিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। কি দেখিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু সেই দেখাটা আজও আমার মনে অক্ষয় হইয়া আছে।

প্রথমে তিনিই কথা বলিলেন। আমার কলেজের দেরী হইয়া যাইতেছে বলিয়া আমাকে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম: "আজ আপনি আসিয়াছেন, কলেজে আর যাইব না, একদিন অনায়াসেই ছুটি লইতে পারিব।" কিন্তু ঠাকুর বলিলেন যে আমি চলিয়া গেলে তাঁহার কোন অসুবিধাই হইবে না, সুতরাং যাইতে হইল। বরদাবাবু ঠাকুরের নিকটেই রহিলেন, আমার স্ত্রীকে যথা কর্ত্তব্য উপদেশ

দিয়া কলেজে চলিয়া গেলাম। ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য সামান্য নয়। গোড়াতেই ঠাকুর আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার সহিত চলিতে হইলে কোন প্রকার ফাঁকি চলিবে না, কোন অজুহাতেই কর্ত্তব্যকর্ম্মের অবহেলা তিনি অনুমোদন করিবেন না। কথাটা অত্যন্ত গুরুতর এবং ঠাকুরের মূল শিক্ষার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু এখানে এই বিষয়ের কোন বিস্তৃত আলোচনা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস আছে যে প্রসঙ্গক্রমে কথাটা আপনিই পরিস্ফুট হইবে। যাহাই হউক, সেদিনকার আর বিশেষ কোনও ঘটনা মনে পড়ে না। পরের দিন কলেজ ছিল না, আমি সকালবেলা নিশ্চিন্ত মনে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছি, হঠাৎ ঠাকুর একখানা কাগজ ও কালী-কলম চাহিলেন। জিনিষগুলি নিকটেই ছিল, ঠাকুরকে দিতেই তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্ট মনে কাগজখানার উপর একটি মনুষ্য দেহ আঁকিলেন, এবং পরে ঐ অঙ্কনটির সাহায্যে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া নানা কথা বলিলেন। ইহার পর তিনি আমাকে একটি "নাম" দিলেন এবং এই নাম-সাধনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যত্ন সহকারে বুঝাইয়া বলিলেন। লৌকিক অর্থে আমি ঠাকুরের আশ্রিত পর্য্যায়ভুক্ত হইলাম।

কিন্তু এই "নাম" পাওয়ায় আমি বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম না। চিরাচরিত সংস্কার বশে এই "নামের" জন্য একটা আগ্রহ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের পর হইতে ধীরে ধীরে ঠাকুরের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া

উঠায় এই আগ্রহ অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে অনেক সময়ে মনে হইয়াছে যে এই "নাম" না পাইলেও বোধ হয় বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না, ঠাকুরের স্নেহানুগ্রহ সমানভাবেই পাইতাম। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমার বক্তব্যটা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমে প্রতি বৎসর ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে একাধিকার যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেখানে এক ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হয় এবং তাহার অবিচলিত ইষ্ট-নিষ্ঠা দেখিয়া তাহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হই। একদিন কথা প্রসঙ্গে ভদ্রলোকের বয়সের কথা উঠিয়া পড়িল এবং মনে মনে একটা হিসাব করিয়া দেখিলাম যে ব্রহ্মচারী বাবার দেহত্যাগের সময় ইহার বয়স ৬।৭ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। এত অল্প বয়সে ইহার দীক্ষা না হওয়াই সম্ভব, তাহা হইলে ভদ্রলোকের এই ইষ্ট-নিষ্ঠা ও ইষ্ট-প্রীতি কোথা হইতে আসিল? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না এবং উত্তরে তিনি বলিলেন: "আমার যখন ৬।৭ বৎসর বয়স তখন প্রায়ই পিসিমার সঙ্গে বাবার আশ্রমে আসিতাম। একদিন দেখি যে এক ভদ্রলোক কতকগুলি আম আনিয়া বাবাকে উপঢৌকন দিলেন। আমগুলি বেশ বড় বড়, দেখিয়া মনে হইল যে খাইতেও বেশ সরসই হইবে। লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না, ব্রহ্মচারী বাবার কাছে একটা আম চাহিয়া বসিলাম। তিনি সবচেয়ে বড় আমটি হাতে লইয়া

আমাকে বলিলেন : 'বাবা বলিয়া ডাক, তবে দিব।' সেখানে তখন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সম্মুখে ব্রহ্মচারী বাবাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিল, বাবাও আমটি এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া দিলেন। আমটির দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া খানিকক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করিলাম, হঠাৎ চাহিয়া দেখি যে লোকজন অনেক কমিয়া গিয়াছে, ব্রহ্মচারী বাবা প্রায় একাই বসিয়া আছেন। তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে যাইয়া আস্তে আস্তে বলিলাম ঃ 'বাবা, আম্‌গা না দিবেন কইছিলেন ?" বাবাও একটু মৃদু হাসিয়া আমটি তৎক্ষণাৎ আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। এই যে বাপ-ব্যাটা সম্বন্ধ তিনি সেদিন পাতাইয়া লইলেন, তাহা লইয়াই আছি, দীক্ষা-টিক্ষার কথা কোন দিন মনেও হয় নাই।" এই ভদ্রলোকের যে অব্যভিচারী ইষ্ট-নিষ্ঠা দেখিয়াছি তথাকথিত দীক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকেরই তাহা দেখি নাই। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে ঠাকুরের নিকট "নাম" না পাইলেও আমার বোধহয় বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত কথা, অন্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

২

সেই যাত্রায় আমার দর্জ্জিপাড়ার বাসায় ঠাকুর প্রায় তিন সপ্তাহ কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মতে বরদাবাবু ঠাকুরের কলিকাতা আসার সংবাদ কাহাকেও না বলার ফলে অত্যন্ত একান্তেই তাঁহাকে পাইলাম। প্রায় সকল সময়েই ঠাকুরের

নিকট বসিয়া থাকিতাম। যেদিন কলেজ থাকিত, কোনও প্রকারে সেখানকার কাজ সারিয়া, এক মিনিটও অযথা বিলম্ব না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম। আর যেদিন কলেজ থাকিত না, সেদিন তো কথাই নাই, শুধু খাওয়ার সময় এবং রাত্রিতে ৩।৪ ঘণ্টা ছাড়া বাকী সময় ঠাকুরের সঙ্গেই কাটাইতাম। কি আনন্দে যে দিনগুলি কাটাইয়াছিলাম, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।

যেদিন আমি "নাম" পাইলাম মনে হয় যে তাহার পরের দিন বৈকালে পর পর তিনজন ভদ্রলোক ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। প্রথমে আসিলেন কবিরাজ ৺জানকী নাথ দাশগুপ্ত। ইনি প্রায় আধঘণ্টা কাল ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন, ফিরিয়া যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন যে কথাবার্ত্তায় মনে হইল যে ইনি বৈষ্ণব, আবার কখন মনে হইল যে ইনি শাক্ত, তবে গলায় যখন তুলসীর মালা রহিয়াছে তখন খুব সম্ভব ইনি বৈষ্ণবই হইবেন। কিছুক্ষণ পরেই আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি তখন বোস ইনষ্টিটিউটে রিসার্চ্চ স্কলার হিসাবে কাজ করিতেন এবং নিয়মিত বেলুড়মঠে যাতায়াত করিতেন। সত্যেন্দ্রবাবু সেদিন কেন আমার বাসাতে আসিয়াছিলেন ঠিক স্মরণ নাই, যতদূর মনে পড়ে ঠাকুর যে আমার এখানে রহিয়াছেন তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার নামও বোধ হয় পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই। যাহাই হউক, আমি তাহাকে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গেলাম। তিনি প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন এবং ঠাকুরকে

নানাপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। এই সময়টা আমাকে কার্য্যান্তরে অন্যত্র থাকিতে হইয়াছিল, সুতরাং কি আলোচনা হইয়াছিল তাহা আমার জানা নাই, তবে এই কথাটা আমার বেশ স্পষ্টই মনে আছে যে সত্যেন্দ্রবাবু যাইবার সময় আমাকে বলিলেন যে ইনি পাতঞ্জল সম্প্রদায়ের লোক। সত্যেন্দ্রবাবুর পরে আসিলেন আমার সহকর্ম্মী ও বন্ধু ৺নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমিই তাহাকে কথা প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথা বলিয়াছিলাম। নারায়ণবাবু তুলিলেন সেই দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের চিরন্তন প্রশ্ন। প্রায় একঘণ্টা সেই আলোচনা চলিয়াছিল। আমি সেখানে আগাগোড়াই উপস্থিত ছিলাম এবং কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হইতেছিল যে আলোচনাটা যেন ঠিক রাস্তায় চলিতেছে না, এক কথাই যেন দুইজনে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণবাবু উঠিলেন, আমি তাহাকে রাস্তা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিলাম। নারায়ণবাবু বলিলেন : "সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও ইনি একজন বৈদান্তিক এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের ঠিক বোঝা গেল না।" তখন ঠাকুরের সঙ্গে আমার সবে মাত্র পরিচয় সুতরাং এই সকল বিভিন্ন অভিমত আমার মনে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল, মনে আছে। পরেও এরূপ বিভিন্ন মন্তব্য বহুবার শুনিয়াছি এবং আমার ধারণা এই যে ঠাকুরের মধ্যে যে যাহা খুঁজিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে। তিনি এর সবই ছিলেন, অথচ কোনটাই ছিলেন না।

নারায়ণবাবুর সহিত ঠাকুরের আলোচনার সময়ে আমি লক্ষ্য

করিতেছিলাম যে নারায়ণবাবু বলিতেছিলেন অদ্বৈত-'বাদের' কথা, আর ঠাকুর বলিতেছিলেন অদ্বৈত-আচরণের কথা। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি "বাদে"র কথা ঠাকুরের মুখে বড় একটা শুনি নাই। অনন্যচিন্তা, অনন্যশরণ ইত্যাদি বুঝাইতে তিনি "অদ্বৈত" কথাটা অনেক সময়ে ব্যবহার করিতেন। "দ্বৈত" কথাটাও তাঁহার মুখে প্রায় শুনি নাই বলিলেও চলে, তিনি বলিতেন "দ্বন্দ্বজ" বা "দ্বন্দ্বজ প্রকৃতি"। যাহাই হউক, আমি যে-কথাটা বলিতে চাহিতেছি তাহা হইল এই যে কে কোন্ "বাদী" ইহাই বড় কথা নহে, কে কি ভাবে আছেন, অথবা কাহার কি আচরণ, ইহাই মুখ্য কথা। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে অদ্বৈতবাদী হইয়াও দ্বৈত ভাবাপন্ন হওয়া যাইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। এই সময়ের প্রায় ৫ বৎসর পরে ঢাকায় ৺বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের বাসাবাড়া লেনের বাড়ীতে এক ভদ্রলোক ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, আমিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ভদ্রলোক একজন ঘোরতর অদ্বৈতবাদী, কথাবার্ত্তায় পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে তাহাদের মতই প্রকৃষ্ট মত এবং অন্য মতাবলম্বীরা নিতান্তই কৃপার পাত্র। ঠাকুর ও আমরা সকলে কিছু না বলায় ভদ্রলোকের উৎসাহ যেন আরও বাড়িয়া গেল এবং তিনি একের পর এক, নানা কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরও এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে ভদ্রলোকের কথাগুলি যেন অত্যন্ত সারগর্ভ, তিনি যেন কথাগুলি শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। আমার কিন্তু অত্যন্ত

অসহ্য বোধ হইতেছিল, ভাবিতেছি যে একবার বাহিরে গিয়া তামাক খাইয়া আসিব কিনা, ঠিক সেই সময়েই ভদ্রলোক এক গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। কবে কোথায় কোন্ প্রকৃত অদ্বৈতবাদী দেখিয়াছেন তাহার এক ফিরিস্তি দিয়া অবশেষে বলিলেন যে একবার কাশীতে তিনি এক অত্যাশ্চর্য্য অদ্বৈতবাদীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। একদিন নারদ ঘাটে গঙ্গাস্নানে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে একজন ভদ্রলোক সপরিবারে অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে, ঘাটে সাধুবাবাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যারাও তাহার অনুকরণ করিল। ভদ্রলোকের হাতে একটী ঠোঙ্গায় কিছু প্রসাদ ছিল, তিনি তাহার খানিকটা লইয়া সাধু-সেবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে সাধুবাবা যেন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন: "কেয়া? প্রসাদ! দরিয়ামে ফিক্ দেও"। অদ্বৈতবাদী সেই পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক মন্তব্য করিলেন: "দেখিলেন তো দেবদেবীর ধার ধারেন না, প্রসাদ গ্রাহ্য করেন না, কিরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ, কিরূপ অব্যভিচারী অদ্বৈতবাদী সাধু!" কথা কয়টি বলিয়া তিনি এমন ভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন যেন একেবারে কিস্তিমাত করিয়াছেন। ঠাকুর সম্মুখে রহিয়াছেন বলিয়াই এতক্ষণ অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া ছিলাম কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিলাম না। ভদ্রলোককে বলিলাম: "দেখুন, একটা কথা বলি, কিছু মনে করিবেন না। আপনার সাধুবাবা প্রসাদ গ্রাহ্য করিলেন, কি করিলেন না, সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু প্রসাদ অ-প্রসাদে তাহার এতটা

ভেদবুদ্ধি কেন বলুনতো, এটা কি ব্রহ্মনিষ্ঠের লক্ষণ ?” ভদ্রলোক সহসা আমার কথার কোনও জবাব দিতে পারিলেন না এবং যেন কতকটা অসহায় ভাবে ঠাকুরের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। ঠাকুর “ধরি মাছ না ছুই পাণি” গোছ কিছু বলিয়া ভদ্রলোকের মুখ রক্ষা করিলেন এবং আমার দিকে এমন ভাবে তাকাইলেন যে “আমি যে ঠিকই বলিয়াছি” ইহা বুঝিতে আমার কোন কষ্টই হইল না। ভদ্রলোকটিও কয়েক মিনিট পরেই ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে কাহার কি মতবাদ সেটাই মুখ্য কথা নয়, আচরণই হইল মুখ্য কথা।

সে যাহাই হউক, আমার মনে হয় যে প্রভাতবাবুকে সংবাদ দিতে ৩।৪ দিন বিলম্ব হইয়াছিল, কারণটা ঠিক স্মরণ হইতেছে না। যে দিন সংবাদ পাইলেন, সেইদিনই বৈকালে কলেজের পর প্রভাতবাবু হন্তদন্ত হইয়া ঠাকুর দর্শনে আসিলেন। তেতলায় যে ঘরখানিতে ঠাকুর থাকিতেন তা'রই গায়ে ছোট একটু খোলা ছাদ ছিল, ঠাকুর তখন সেই ছাদে একখানা চেয়ারে বসিয়াছিলেন, আমি ও বরদাবাবু নিকটেই ছিলাম। প্রভাতবাবু আসিয়াই গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে আরও পূর্ব্বে কেন সংবাদ দেওয়া হয় নাই, সে জন্য আমাকে ও বরদাবাবুকে খুব একচোট গালাগালি করিলেন। পরে ঠাকুরের সঙ্গে সামান্য দুই একটি কথা বলিয়াই হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ দুখানি দুই হাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া গীতার একাদশ অধ্যায় আগাগোড়া আবৃত্তি করিয়া গেলেন। ঠাকুর স্থির, নিষ্পলক,

নিস্পন্দ, মনে হইল তিনি যেন এ জগতে নাই। ঠাকুরের তখনকার সেই মূর্ত্তি আমি বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিব না, পরে কখন কখন মনে হইয়াছে যে তিনি যেন গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবানের সেই ভয়াবহ বিশ্বরূপ নিজ মাধুর্য্যে আবরণ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন।

আবৃত্তি শেষ হইয়া গেলে প্রভাতবাবু ঠাকুরের চরণযুগল ছাড়িয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন এবং গলদশ্রুলোচনে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া ঠাকুরকে একবার তাহার বাড়ীতে পদধূলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন যে এ যাত্রায় যাওয়া সম্ভব হইবে না কিন্তু ভবিষ্যতে যাইবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর একাকীই বাহির হইয়া গেলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বরদাবাবুও চলিয়া গেলেন। তখন প্রভাতবাবুকে নিরিবিলি পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে হঠাৎ ঠাকুরের প্রতি তাহার এই অনুরাগ কি করিয়া হইল। প্রথম দর্শনের পর আমাদের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে তো এতটা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। প্রভাতবাবু বলিলেন যে ইতিমধ্যে এমন কিছু ঘটিয়াছে যাহাতে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে ঠাকুর ভিন্ন তাহার আর অন্য গতি নাই। কথাটা তিনি আমাকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আমি যেন কখনও প্রকাশ না করি। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না। প্রভাত-বাবু ঠাকুরের ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষায় আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন এবং তৈল ও লঙ্কা সহযোগে ছোট এক ধামা মুড়ি,

(ইহা তাহার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল,) কয়েকটি সন্দেশ, দুই পেয়ালা চা, ৪।৫ ছিলিম তামাক ও প্রায় এক প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাহার মলঙ্গা লেনের বাসায় প্রভাতবাবু সস্ত্রীক ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছিলেন।

সেদিন ঠাকুর রাত্রি প্রায় দশটার সময় ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম যে তাঁহার সেই অতি সাধারণ উড়ানিখানার পরিবর্ত্তে তিনি একখানি উৎকৃষ্ট মটকার চাদর গায়ে দিয়া ফিরিয়াছেন। চাদরখানি খুলিয়া, ঝাড়িয়া পুঁছিয়া, অতি নিখুঁত ভাবে ভাঁজ করিয়া আলনায় তুলিয়া রাখিলেন। ইহার পর তিন দিন ধরিয়া চলিল এই চাদরের সেবা। দিনের মধ্যে অন্ততঃ ৫।৭ বার চাদর-খানা খুলিতেন, আবার পরিপাটিরূপে ভাঁজ করিয়া আলনায় তুলিয়া রাখিতেন। যত্নের আর সীমা নাই। আমার মনে হইত যে শিশুরা খেলনা হাতে পাইলে যেমন প্রথম প্রথম তাহা লইয়া মত্ত হইয়া থাকে, অথবা শিক্ষার্থী বালক যেমন প্রমোসনের পর নূতন বই পাইলে কয়েক দিন কিছুতেই আর সেগুলি ছাড়িতে চাহে না, এও যেন ঠিক সেই রকমই। এ যে কি মধুর ভাব তাহা বলিয়া বুঝান যাইবে না, পাঠক-পাঠিকারা নিজেরাই কল্পনা করিয়া লইবেন। এই কয়দিন ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য সন্ধ্যার পর একাকী বাহির হইয়া যাইতেন, তৃতীয় দিন দেখিলাম যে তিনি কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই মটকার চাদরখানি নাই। জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন: "যা'র চাদর তা'র কাছেই গেছে।" আরও খুঁটিয়া প্রশ্ন করিয়া

জানিলাম যে জনৈক ভক্ত চাদরখানি ঠাকুরকে দিয়াছিলেন এবং তিনি আজ ঐটি অন্য একজনকে দিয়া আসিয়াছেন। চাদরখানি যেন এই দ্বিতীয় ব্যক্তিরই প্রাপ্য এবং ঠাকুরের কাছে জিনিষটি এই তিন দিন শুধু গচ্ছিত ছিল মাত্র। আমার মনে হইল যে সেই জন্যই বুঝি চাদরখানির এত যত্ন এই তিন দিন ধরিয়া ঠাকুর করিয়াছেন। নিজের জিনিষ অপেক্ষা পরের গচ্ছিত জিনিষের দায়িত্ব যে অনেক বেশী।

ইহার পরের দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাহির হইয়া যাইবার সময় ঠাকুর আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। দুই চারিটি গলি ঘুরিয়া আমরা এক কালীবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর আমাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আবার একাকী বাহির হইয়া গেলেন। একজন সাধু গোছের ভদ্রলোক হারমোনিয়াম বাজাইয়া শ্যামা সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। তিনি একটি একটি করিয়া ৪টি গান গাহিলেন, পরে আরতি আরম্ভ হইল। আরতির শেষে দুইখানা লুচি এবং কয়েকটি ক্ষীরের নাড়ু প্রসাদ পাইয়াছিলাম মনে আছে। কিন্তু আমি এ সকল কিছুই ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছিলাম না, কারণ আমার মন ঠাকুরের দিকেই পড়িয়া ছিল। আরও কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিবার পর তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। এই কালীবাড়ী পরে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বাহির করিতে পারি নাই। ঠাকুর আমাকে গলিঘুঁজির মধ্য দিয়া তথায় লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেন্ট্রাল এভেনিউ রাস্তা বাহির হওয়ার দরুণ ঐ অঞ্চলে ভাঙ্গাচূরাও অনেক হইয়াছে,

বোধ হয় সেই জন্যই আমার চেষ্টা সফল হয় নাই। আমার মনে হয় যে সেন্ট্রাল এভেনিউ ও গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ের কিঞ্চিৎ উত্তরে রাস্তার উপর যে কালীবাড়ীটি বর্ত্তমানে আছে, ইহাই সেই কালীবাড়ী।

যাহাই হউক, ঠাকুর আমাকে সেখান হইতে হেদুয়ায় লইয়া আসিলেন. তখন রাত্রি প্রায় ৯-৩০টা। বৈকালিক বায়ুসেবন কারীরা তখন প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, পার্কটি অনেকটা নির্জ্জন। এখানে সেখানে বেঞ্চের উপর কেউ কেউ একক বা সঙ্গী সমভিব্যাহারে বসিয়া রহিয়াছেন দেখিলাম কিন্তু পথচারী এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। ঠাকুর আমাকে লইয়া একখানি খালি বেঞ্চে বসিলেন। সামান্য দু'একটি কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, আমিও তাহাই করিলাম। কতক্ষণ এভাবে কাটিয়াছিল জানি না, হঠাৎ এক সময় ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দেখি যে তাঁহার মুখশ্রী একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। দেখিলাম যেন একটি ১৫।১৬ বৎসরের কিশোর আমার পাশে বসিয়া রহিয়াছেন। কি অপূর্ব্ব সেই মূর্ত্তি, ভাষার সাধ্য নাই যে তাহাকে চিত্রিত করিতে পারে। সেই আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষুযুগল, সেই স্থির প্রশান্ত দৃষ্টি, মুখশ্রীর সেই অপার্থিব মাধুরিমা, বহু সুকৃতি বলেই সেদিন আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল এবং ঠাকুরের মুখাবয়ব আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। মনে মনে অনেক তর্কবিতর্কের পর কথাটা এখানে প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। স্থির করিয়াছিলাম যে ঘটনাটা গোপন করিয়াই যাইব। কিন্তু

একটু চিন্তা করিতেই মনে হইল যে তাহা হইলে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাই কতকটা অপ্রকাশ থাকিয়া যাইবে। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া আমি প্রতিনিয়তই উপলব্ধি করিয়াছি তাঁহার এক দুর্নিবার আকর্ষণ। আমি তাঁহাকে চাহি নাই, বিষয়কর্ম্ম, বাজে আমোদ-প্রমোদ, বন্ধু-বান্ধব, ধনজনবৈভবাদি লইয়াই মাতিয়া থাকিতে চাহিয়াছি, কিন্তু অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু তিনি, জোর করিয়াই আমার হৃদয়ে একটু স্থান করিয়া লইয়াছেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিবার পর এরূপ ছোট ছোট ঘটনা আমার জীবনে আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে এবং নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি যে এগুলি তাঁহারই অনুগ্রহ। তাঁহার প্রতি আমার আকর্ষণ অটুট রাখিতে ইহারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

৩

ঠাকুর আমার দর্জ্জিপাড়ার বাসায় থাকাকালীন আমি একটা বিষম অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম, অনেক ইতঃস্ততের পর কথাটা বলিয়া ফেলাই সঙ্গত মনে হইতেছে। ঠাকুর আসিবার ৪।৫ দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে আমাদের কুলগুরু তাহার এক পুত্রকে লইয়া আমার সেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি মহা মুশ্‌কিলে পড়িয়া গেলাম। ঠাকুর আমার বাড়ীতে রহিয়াছেন, আবার ইঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমি দুইদিক বজায় রাখিয়া কিরূপে চলিব, সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই গুরুদেব আমার চাকুরীতে ঢোকার পর হইতেই আমাকে মন্ত্র লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন এবং

আমি "যাক্‌না কিছুদিন তারপর দেখা যাবে, আগে একটু বুঝতে শিখি, আমার বয়সই বা এমন কি" ইত্যাদি বলিয়া এড়াইয়া যাইতেছিলাম। এখন একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়িয়া গেলাম। আমি যে ইহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিতাম এমন কথা বলিতে পারি না, বরং অনেক সময়েই লক্ষ্য করিয়াছি যে বংশানুগত অনেক গুণই ইহাদের আছে, যাহা সচরাচর বিরল। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিজেকে কিছুতেই মানাইয়া লইতে পারিতাম না। ছেলেবেলা হইতে বহুবার ইহাদিগকে দেখিয়াছি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও স্মরণ হয় না যে ইঁহারা কখন কোন তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। সর্ব্বদাই দেখিয়াছি যে কবে কোথায় গিয়াছিলেন, কি প্রকার আদর আপ্যায়ন হইয়াছিল, আহারাদির ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, বিদায় আদায় কতটা পাইয়াছিলেন, ইত্যাদিই ছিল ইহাদের আলোচনার বিষয়। ছেলেবেলা হইতেই ইহা আমার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইত। গুরু শিষ্যবাড়ী আসিয়াছেন, এই ব্যাপারটাকে আমি এত লঘু করিয়া ভাবিতে পারিতাম না। আমি মনে মনে কল্পনা করিতাম যে এই উপলক্ষে পাঁচজন পাঁচ রকমের প্রশ্ন লইয়া আসিতেছেন, গুরুদেব তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন, গুরুদেব পারমার্থিক আলোচনা করিতেছেন, সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে, যেন একটা আনন্দের মেলা বসিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই গুরুদেবকে অশ্রদ্ধা না করিলেও পুরাপুরি শ্রদ্ধাও করিতে পারিতাম না। আমার কেবলই মনে হইত যে শিষ্যকে একবার মন্ত্র দান করিয়াই যেন ইনি যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন,

এবং এখন বাকী রহিয়াছে শুধু শিষ্যবাড়ী ঘুরিয়া আহারাদির সুব্যবস্থা করা ও বার্ষিক বৃত্তি আদায় করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া।

সুতরাং ইঁহারা আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আমি একটু অসুবিধায় পড়িলাম। ইহাদিগকে তাড়াতাড়ি দোতলার একখানা ঘরে জায়গা করিয়া দিলাম. ঠাকুরের কথা কিছুই বলিলাম না। কিন্তু বেশীক্ষণ কথাটা গোপন রাখা গেল না। ইহারই মধ্যে এক সময়ে গুরুদেব আমাকে ডাকাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঠাকুরের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। আমার উত্তরাদি শুনিয়া এবং ঠাকুরের প্রতি আমার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ইনি যে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাহা সহজেই বুঝা গেল। পরের দিন প্রাতঃকালে ব্যাপারটা আরও একটু ঘনাইয়া উঠিল। আমি ও বরদাবাবু ঠাকুরের নিকট বসিয়াছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম যে গুরুদেব ও তাহার পুত্র সিড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছেন। আমি তাহাদিগকে ঘরের ভিতর অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু তাঁহারা ভিতরে আসিলেন না, ঘরের সম্মুখে যে প্রশস্ত বারান্দাটি ছিল, তাহারই এমন একটা স্থানে উপবেশন করিলেন যে সেখান হইতে আমাকে ও বরদাবাবুকে স্পষ্টই দেখা যায় কিন্তু ঠাকুরকে দেখা যায় না। তাঁহারা এক দৃষ্টে আমার হাবভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত মৃদুস্বরে আলোচনা করিতে লাগিলেন। বরদাবাবু আমাকে জনান্তিকে বলিলেন যে উঁহারা দেখিতেছেন যে বাস্তবিক আপনি কতটা মজিয়াছেন এবং এখনও উহাদের কোন আশা আছে কিনা। কিছুক্ষণ পরেই

উঁহারা নীচে নামিয়া আসিলেন এবং আহারাদি সমাপন করিয়া ও কিঞ্চিৎ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

কথাগুলি বলিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছে, তথাপি না বলিয়া পারিতেছি না। ইঁহারা ঠাকুরকে ভাবিলেন ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, যেন ইহাদের শিষ্য ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছেন। আমার নিকট বিশদভাবে ঠাকুরের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার নিতান্ত সন্নিকটে গিয়াও একবার সাক্ষাৎ করিতে ইহাদের প্রবৃত্তি হইল না, যেন তাঁহার উপর একটা আক্রোশ লইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরেই গুরুদেবের মৃত্যু হয়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে তাহার পুত্রেরাও ঠাকুরের প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছেন এবং এইজন্য মাঝে মাঝে আমাকে যে অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই, তাহাও বলিতে পারি না। সেই প্রথম দিনই ইহাদের কথা শুনিয়া ঠাকুর কিন্তু আমাকে বলিয়াছিলেন : যেমন আর পাঁচ বিত্তা (বৃত্তিভোগী) ইহারাও তাই, ইহাদের বৃত্তির উচ্ছেদ করিবেন না।" সেই হইতে বরাবরই ইহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তি দিয়া আসিয়াছি কিন্তু তাহাতে ইহাদের ক্ষোভের নিবৃত্তি হয় নাই। শুধু এই কথা বলিবার জন্য আমি এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই। আমার মত অনেকেই কুলগুরুর নিকট না গিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছেন, আবার এমনও দেখিয়াছি যে অন্যত্র দীক্ষা লইয়া পরে আসিয়া ঠাকুরের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠাকুরের দুই চারিটি কথাতেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইয়া গিয়াছে, ক্ষোভ বা অসন্তোষের কোন কারণই থাকে নাই। একবার

একজন গোস্বামী তাহার এক ভাবী শিষ্যের ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া নিজেই একটা অভিযোগের ভাব লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন। ঠাকুর তখন ঢাকায় বীরেন মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন, আমিও ঠাকুরের নিকটেই ছিলাম। গোস্বামী মহাশয় তাহার নালিশ পেশ করিতেই ঠাকুর তাহাকে বলিলেন: "আপনে ওর উপর একটু দয়া রাখবেন, উনি তো অসহায়, দুর্ব্বল, আপনার দয়া ছাড়া ওর আর কি আছে?" কথা কয়টি এমন সহজ, সরলভাবে বলিলেন যে, কেন জানি না, ঐ ভদ্রলোক কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং একটু পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। এরূপ ব্যাপার আমি আরও কয়েকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই জন্যই আমি নিঃসন্দেহ যে সেদিন যদি গুরুদেব ও গুরুপুত্র আমার সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অভিমান বশে বারান্দায় অপেক্ষা না করিয়া অন্ততঃ ৫।৭ মিনিটের জন্যও ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিতেন, তাহা হইলে সমস্যাটা সহজেই মিটিয়া যাইত, কোন প্রকার তিক্ততারই সৃষ্টি হইত না।

আর সামান্য দুই চারিটি কথা বলিলেই এই দর্জ্জিপাড়ার প্রসঙ্গ শেষ হইয়া যায়। ঠাকুর আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার দুই দিন পূর্ব্বে বৈকালের দিকে এক ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে আসিলেন। ইহার সহিত আমার সামান্য পরিচয় ছিল, তবে এইটুকু জানিতাম যে তিনি এক কালে একজন প্রভূত বিত্ত-শালী ব্যক্তি ছিলেন। রেস খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে স্ত্রী ও পুত্রের নামে যে সম্পত্তিটুকু আলাদা করা ছিল,

তাহার উপর নির্ভর করিয়াই কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। একদিকে স্ত্রী ও পরিবারবর্গের গঞ্জনা, অন্যদিকে নিজের মনে কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা,—ভদ্রলোক অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাইতেছিলেন এবং সাধু-সন্ন্যাসীর কথা শুনিলেই সেখানে ছুটিয়া যাইতেন। একা ঠাকুরের নিকট নিরিবিলি বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখিলাম যে আমার ভৃত্য সেই ভদ্রলোককে তেতলায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। আমিও উঠিয়া গিয়া তাহাকে ঘরের ভিতরে লইয়া আসিলাম। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সন্মুখে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। হঠাৎ এক সময় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "শান্তি কিসে পাওয়া যায়, বলতে পারেন?" উত্তরে ঠাকুর বলিলেন: "শান্ত হইলেই শান্তি পাওয়া যায়।" ছোট্ট একটি বাক্য, অথচ কি সুন্দর, কি মর্ম্মস্পর্শী! কথাটা লইয়া আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিয়াছিল মনে আছে এবং ঠাকুরের কথায় আমি ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে শান্তির উপাদান বাহিরে অনুসন্ধান করা বৃথা, নিজের ভিতরেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। বাহিরে খুঁজিয়া ধনজনবৈভবাদি পাইলেও পাইতে পার, কিন্তু শান্তি পাইবে না। আমরা অনেক সময়ে ভাবি যে সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম সমাধা করিয়া, পুত্রকন্যা সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া শেষ বয়সে মহানন্দে ঠাকুর-সেবায় ও আপ্ত-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকিব। কিন্তু এরূপ চিন্তার মূলে কোন যৌক্তিকতা নাই। একজন সাধুর মুখে শুনিয়াছিলাম: "সমুদ্র-

শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।" সমুদ্রের পারে দাঁড়াইয়া ঢেউ থামিবার আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকিলে ইহজীবনেও আর স্নান করা হয় না। সংসার তরঙ্গও তদ্রূপই, ইহা কখনও থামিবে না, স্নান করিতে হইলে এই তরঙ্গের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়াই তাহা করিতে হইবে। তরঙ্গ শান্ত হইবে না, শান্ত নিজেকেই হইতে হইবে।

ভদ্রলোক উঠিলেন এবং তাহাকে নীচে নামাইয়া দিয়া আবার আসিয়া ঠাকুরের নিকটে বসিলাম। ঠাকুরের কাছে একখানা "গুরুগীতা" ছিল, মাঝে মাঝে তিনি ইহার শ্লোকগুলি আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। আসিয়া দেখি যে তিনি সেই গীতাখানি খুলিয়া লইয়াছেন, আমি বসিতেই একাদিক্রমে শ্লোকের পর শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া চলিলেন, আমিও তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। এই ভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক অতীত হইয়া গেল। ঠাকুরের ব্যাখ্যার বিশেষ কিছুই বুঝিলাম না, কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিয়া চলিলাম। সর্ব্বশেষ শ্লোকটির তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া ঠাকুর গীতাখানি রাখিয়া দিলেন এবং আমাকে একটি গল্প শুনাইলেন। ঠাকুর বলিলেন যে এক রাজার হঠাৎ ইচ্ছা হইল যে তাহার প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী একখণ্ড খালি জমিতে একটি হাট বসাইবেন। প্রাসাদটি ছিল সহরের এক প্রান্তে, জনবিরল স্থানে। সুতরাং দোকানীরা সহরের কেন্দ্রে অবস্থিত পুরাতন হাট ছাড়িয়া এই নূতন হাটে উঠিয়া আসিতে সম্মত হইল না। রাজা যখন দেখিলেন যে তাহার প্রস্তাবিত নূতন হাট কিছুতেই মিলিতেছে না, তখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে তাহার হাটে দিনশেষে

যাহার যাহা কিছু অবিক্রীত থাকিবে সমস্তই উচিত মূল্যে তিনি নিজেই কিনিয়া লইবেন। এই ঘোষণার পর অচিরেই হাট মিলিয়া গেল এবং প্রতিশ্রুতিমত রাজার এক কর্ম্মচারী সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাটে আসিয়া অবিক্রীত জিনিষগুলি উচিত মূল্যে কিনিয়া লইতে লাগিল। কয়েক সপ্তাহ এই ভাবে চলিবার পর একদিন সেই কর্ম্মচারী দেখিল যে হাটের সমস্ত জিনিষই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কেবল এক কুমারের একটি পুতুল কেহই কিনে নাই। মূর্ত্তিটি ছিল অলক্ষ্মীর সুতরাং কর্ম্মচারীটি সহসা পুতুলটি কিনিয়া লইতে ভয় পাইল এবং রাজাকে যাইয়া ব্যাপারটা জানাইল। রাজা বলিলেন যে প্রতিশ্রুতি যখন দেওয়া হইয়াছে তখন ইহাকে কিনিতেই হইবে। রাজার আজ্ঞানুসারে কর্ম্মচারী পুতুলটি কিনিয়া প্রাসাদের কোনও এক স্থানে রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

পরের দিন প্রাতঃকালে রাজার এক বিষম পরীক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথমেই আসিলেন লক্ষ্মী, তিনি বলিলেন: "অলক্ষ্মীর যেখানে জায়গা হইয়াছে সেখানে আমি কোনক্রমেই থাকিতে পারি না, আমি চলিলাম।" রাজা বলিলেন: "যাইতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই"। লক্ষ্মী চলিয়া গেলেন। তারপর একে একে অনেকেই আসিলেন ও বিদায় হইয়া গেলেন, রাজা কোন বাধাই দিলেন না। সকলের শেষে আসিলেন ধর্ম্ম, তিনি বলিলেন: "অলক্ষ্মীকে ঠাঁই দেওয়ায় তোমার এই প্রাসাদ শ্রীভ্রষ্ট, শ্মশানতুল্য মনে হইতেছে, আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না, আমিও চলিলাম।" এবার কিন্তু

রাজা ধর্ম্মের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন: "তোমার জন্যই আমি অলক্ষ্মীকে ঠাঁই দিয়া স্ত্রীভ্রষ্ট হইয়াছি, তুমি চলিয়া যাইতে চাও কোন যুক্তিতে? তোমাকে আমি কিছুতেই যাইতে দিতে পারি না।" ধর্ম্মের আর যাওয়া হইল না, তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। রাজার কোন অমঙ্গল বা অসুবিধা হইল না। ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকায় তাহার সকল দিকই বজায় রহিল। ঠাকুরও কখন কখন বলিতেন: "লেগে থাক্‌লে মেগে খায় না।"

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আমরা যে সকল একনিষ্ঠ ধর্ম্মার্থীর দৃষ্টান্ত পাই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া কায়ক্লেশে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত গল্পের রাজার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলা চলে যে তিনি ধর্ম্মরক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সকল দিক বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য অনেকের বেলায়ই একথা বলা যায় না। যাহার অনেক দিক নাই-ই, তাহার সকল দিক বজায় থাকিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু কথাটা ঠিক তাহা নহে। সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে যাহার অর্থ ও বিত্ত আছে সে-ই ধনী, এবং যাহার তাহা নাই সে-ই দরিদ্র। কিন্তু মনের প্রসাদ বা কার্পণ্য অর্থ ও বিত্তের উপর নির্ভর করে না। একদিন ভোর বেলায় গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়া প্রভূত বিত্তশালী একজন অতি ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাহাকে এড়াইতেই চাহিয়াছিলাম কিন্তু তিনি দূর হইতেই আমাকে দেখিয়া তাহার

নিকটে ডাকিলেন, সুতরাং আমাকে যাইতেই হইল। তিনি বলিলেন : "অনেক দিন পরে দেখা, কেমন আছেন, মাষ্টার মশাই?" আমি বলিলাম যে ভালই আছি, সম্প্রতি লেক-মার্কেটের নিকটে ছোট্ট একখানি বাড়ী করিয়াছি এবং সেইখানেই বসবাস করিতেছি। তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতেই আরম্ভ হইল অভাব অভিযোগের এক প্রকাণ্ড ফিরিস্তি। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া তিনি আমাকে কোথায় কোন সম্পত্তি নষ্ট হইতে চলিয়াছে, কোথায় কত টাকা অযথা আটক পড়িয়া আছে, কোন্ কর্ম্মচারী কি করিয়াছে ইত্যাদি নানা কথা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন। আমার মনে হইল যে এই ভদ্রলোক যেন আমার চেয়ে অনেক বেশী দরিদ্র, এত অভাব-বোধ তো আমার নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে অভাব নহে, অভাব-বোধই দারিদ্র্যের লক্ষণ হওয়া উচিত। কথাটা মোটেই নূতন নহে, অনেকেই ইহা বলিয়াছেন এবং অনেকেই ইহা জানেন, কিন্তু কোন কিছু জানা এক কথা এবং অন্তর দিয়া উপলব্ধি করা অন্য কথা। সেই দিন হইতে আমার মনে এই ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে "নাই নাই, চাই চাই" রব যাহার মধ্যে যত বেশী সে তত দরিদ্র এবং যাহার মধ্যে যত কম, সে সেই পরিমাণে ধনী। সাংসারিক অবস্থার সহিত ইহার বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। সেইজন্যই যখন কোন পদস্থ ও স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সামান্য ১০।১২ টাকা লোকসানের আতঙ্কে চঞ্চল হইতে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, আহা, লোকটা কি দরিদ্র! মানুষের কাঙ্গালপনার অন্ত নাই এবং কখন কি ভাবে যে তাহা আত্মপ্রকাশ করে,

তাহাও বলিয়া শেষ করা যায় না। নানা সভা-সম্মেলনে উপস্থিত কোন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তির সামান্য এক-আধ মিনিটের সাহচর্য্য লাভের প্রত্যাশায় কত চতুরতা, কত সতর্কতা ও কত অধ্যবসায়ই না অপব্যয়িত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু যাক্, এই প্রসঙ্গ আর বাড়াইয়া লাভ নাই। বলিতেছিলাম যে ধর্ম্ম ধরিয়া থাকিলে সকল দিক বজায় থাকে, এই কথাটার বিচার শুধু বাহ্যিক অবস্থার মাপকাঠিতে চলে না।

"লেগে থাক্‌লে মেগে খায় না", ঠাকুরের এই কথাটিও একটু বিচার করিয়া বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। তিনি শুধু এইটুকুই বলিলেন যে তাঁহাকে লইয়া থাকিলে মাগিয়া খাইতে হয় না। ধনজনবৈভবাদির কথা তিনি কিছুই বলিলেন না, কেবল এই আশ্বাসই দিলেন যে সংসার কখনও অচল হইবে না। কিন্তু "লেগে থাকা" বলিতে কি বুঝিতে হইবে? ঠাকুর সে যাত্রায় আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বের দিন রাত্রে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কথাটা খানিকটা পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর ঠাকুরের নিকটে বসিয়াছিলাম, আর কেহই সেখানে ছিল না। কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল স্মরণ নাই, হঠাৎ এক সময় আমি ঠাকুরকে বলিলাম: "আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, আমার মতিগতির কোন ঠিক্-ঠিকানা নাই। আজ আপনাকে ভাল লাগিয়াছে, আপনার নিকটে বসিয়া সাগ্রহে আপনার উপদেশ শুনিতেছি, কালই হয়তো রাস্তায় দাঁড়াইয়া আপনাকে ভণ্ড, মিথ্যাচারী বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিব। আমার আত্মবিশ্বাস মোটেই নাই। আপনাকে যদি ছাড়িয়াই দেই

তখন আমার কি উপায় হইবে?" ঠাকুর উত্তরে বলিলেন: "আপনে ছাড়্তে পারেন, কিন্তু সে তো ছাড়বে না।" আমি আনন্দে হতবাক্ হইয়া গেলাম, কি আশ্চর্য্য করুণা, কি জীবন্ত আশ্বাস! তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। সত্যইতো, আমি চিন্তা করিয়া মরি কেন? আমি আসিতে চাহি নাই, তিনিই আমাকে কাছে টানিয়া লইয়াছেন, রাখিতে হয় রাখিবেন, মারিতে হয় মারিবেন। ঠাকুর বলিতেন যে মর্কট বুদ্ধি ভাল নয়, মার্জ্জার বুদ্ধিই ভাল। বানরের বাচ্চাগুলি নিজেরাই মা'কে ধরিয়া থাকে, সুতরাং মা যখন এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইয়া যায় তখন তাহাদের নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হয় এবং কখন কখন পড়িয়া গিয়া মরিতেও হয়। মার্জ্জাব শিশুর কিন্তু কোন চিন্তাই নাই। সে সম্পূর্ণরূপে মা'কে নির্ভর করিয়া থাকে এবং মা যখন যেখানে রাখে নির্বিবচারে সেইখানেই পড়িয়া থাকে। ক্ষুধা হইলে স্বভাবতঃই কাঁদে, মা আসিয়া আহার দিয়া যায়। ঠাকুরও আমাদিগকে নানা কথার ভিতর দিয়া এই মার্জ্জার শিশুর মত পড়িয়া থাকিতেই নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন কিন্তু মর্কট-বুদ্ধি যে ছাড়িয়াও ছাড়ে না। একখানি পত্রে ঠাকুর লিখিয়াছিলেন: "সর্ব্বদাই গুরুর নিকট থাকিতে লালসা রাখিয়া, তাহারই নিকটে তাহারই বাঞ্ছিত অবস্থায়, তাহারই কোলে ছোট ছেলেটির মত সর্ব্বদা বসিয়া আছেন এরূপ কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহার রক্ষিত জনের ভয় কি?" (বেদবাণী, প্রথম খণ্ড, ৮৬নং) ইহাও এক প্রকার মার্জ্জার শিশুর অবস্থা। ঠাকুর রহিয়াছেন, সুতরাং আমার আর ভাবনার কিছুই

নাই, এই চিন্তার অনুশীলনই "লেগে থাকা"। পরে প্রসঙ্গক্রমে কথাটা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

যাহাই হউক, দর্জ্জিপাড়ায় অবস্থানের শেষের দিকে ঠাকুর একদিন প্রাতঃকালে একাকীই বাহির হইয়া গেলেন এবং সেইদিন আর ফিরিলেন না। আমি একটু চিন্তিতই হইলাম। বৈকালে বরদাবাবু আসিলেন, তিনি বলিলেন যে ঠাকুর হামেশাই এভাবে বাহির হইয়া যান, ইহাতে চিন্তার কিছুই নাই। কিন্তু আমার মনের কথাটা বরদাবাবুকে, কেন জানি না, খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। আমি ভাবিতেছিলাম যে অজানিতে বুঝি বা কোন অন্যায় করিয়া বসিয়াছি। তখন বুঝি নাই, কিন্তু এখন ভাবি যে অন্যায় তো প্রতিনিয়তই করিয়াছি এবং গোটা জীবনটাই তো নানা ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কাটাইয়া দিলাম কিন্তু কই, তিনি তো কিছুই ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিলেন না। তাঁহার স্নেহানুগ্রহ হইতে কখনও তো বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু তখন ঠাকুরের বিশেষ কিছুই জানিতাম না, সুতরাং বরদাবাবুর কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। এই সময় মতিবাবু (৺মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বৌবাজার ষ্ট্রীটের উপর মুচীপাড়া থানার পশ্চিমে ৺সত্যনারায়ণ ভাণ্ডার নামে ইহার একখানা কাটা-কাপড়ের দোকান ছিল) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার সহিত তখনও আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই, সামান্য পরিচয় মাত্র ছিল। বরদাবাবু উপস্থিত থাকায় তিনি তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া চলিলেন, আমি মাঝে মাঝে তামাকের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ পর বরদাবাবু বলিলেন: "মনে হয় যেন আপনি

ঠাকুরের উপর ভীষণ চটিয়াছেন।" মতিবাবু বলিলেন: "না, রাগ আমার হয় নাই, কিন্তু আমার অভিমান হইয়াছে। আজ ১৭।১৮ দিন ঠাকুর কলিকাতায় আসিয়াছেন অথচ আমি একটা সংবাদ পর্য্যন্ত পাই নাই, ইহাতে আমার অভিমান হইতে পারে কিনা আপনিই বলুন।" আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিবার পর আমি বলিলাম: "দেখুন মতিবাবু, আপনি পুরাতন লোক, ঠাকুরের অনেক সঙ্গ করিয়াছেন এবং আপনার বনিয়াদ পাকা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের সহিত এক যাত্রায় আপনার দেখা না হইলে দুঃখ নিশ্চয়ই হইতে পারে কিন্তু বোধ হয় খুব বেশী ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমি একেবারেই নূতন, এখনও ঠাকুরের কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, সেই জন্যই বোধ হয় ঠাকুর এবার আমাকে লইয়াই নিরিবিলি কাটাইয়া গেলেন।" মতিবাবু তখন কিছু বলিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন, কিন্তু ২।৪ মিনিট পরে আমাকে বলিলেন: "ঠাকুরের কাছে কেহ নূতন নাই, সকলেই পুরাতন।" কথাটা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ. তখন কিন্তু তাহা মনে হয় নাই।

দুই দিন পরেই আনন্দের মেলা ভাঙ্গিয়া গেল। ঠাকুর কাশী চলিয়া গেলেন, বরদাবাবু ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। কয়েক দিন অত্যন্ত মনমরা হইয়া রহিলাম। বরদাবাবু, মতিবাবু প্রভৃতির সহিত ঠাকুর প্রসঙ্গ করিয়া কতকটা সান্ত্বনা পাইতাম বটে কিন্তু দুধের সাধ ঘোলে মিটিতে চাহিত না। সময় পাইলেই একা বসিয়া ঠাকুরের কথা ভাবিতাম। একদিন হঠাৎ মতিবাবুর কথাটা মনে পড়িয়া গেল। ঠাকুরের কাছে সকলেই পুরাতন, ইহাই তিনি বলিয়াছিলেন। জন্মান্তরের সম্বন্ধ,

জাতিস্মরতা প্রভৃতি কথা তুলিয়া বিষয়টাকে ঘোরালো করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই, বস্তুতঃ এ সকল কথা তখন আমার মনেও আসে নাই। ঠাকুর যে আমার বাড়ীতে প্রায় তিন সপ্তাহ কাটাইয়া গেলেন, ইহাই আমি ভাবিতেছিলাম। তখন তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নিতান্তই সামান্য, বাড়ীর অন্যান্য সকলে এর পূর্ব্বে তাঁহাকে কখন দেখেও নাই, কিন্তু এই অপরিচিত স্থানে, অপরিচিতদিগের মধ্যে তিনি এমন সহজ, অকুণ্ঠ অন্তরঙ্গতার সহিত দিনগুলি কাটাইয়া গেলেন যে মনে হইল যেন তিনি আমাদের কত কালের পরিচিত, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আপনার জন। স্নানের বালাই নাই, দিনে রাত্রে ১০।১২ গ্লাস জল খাইয়াই কাটাইয়া দিতেন, ঘরে কুঁজা ও গ্লাস ছিল, প্রয়োজন মত নিজেই ঢালিয়া লইতেন। আমরা অবশ্য প্রতিদিনই ফলমূল কাটিয়া একখানা থালায় সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিতাম, তিনি কোন দিন এক আধ টুকরা গ্রহণ করিতেন, কোন দিন বা করিতেন না। কোন ঝঞ্চাটই ছিল না। আমার বড় মেয়ে হাসির তখন বছর দেড়েক বয়স, তাহাকে নিকটে বসাইয়া যে সকল রহস্যালাপ করিতেন, তাহা মনে হইলে এখনও আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠি। একটা অপরিচিত পরিবেশে এরূপ ব্যবহার শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব যিনি নিতান্ত সহজ এবং কোন প্রকারের কোন সঙ্কোচই যাঁহাতে নাই। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ঠাকুরকে আবার দেখিবার জন্য মন অস্থির হইয়া উঠিল এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার পথ চাহিয়া রহিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

১

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দর্জ্জিপাড়ার বাসা তুলিয়া দিয়া আমি ৫২।১ বিডন ষ্ট্রীটে শক্তি ঔষধালয়ের উপরে একটি মেসে আসিয়া উঠিলাম। তখন কোনও সিট্ মেসে খালি ছিল না কিন্তু তেতলায় একখানি স্বতন্ত্র ঘর ছিল, কবিরাজ ৺প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই ঘরে থাকিতেন। আমি তাহার সঙ্গে প্রায় মাসাধিককাল কাটাইলাম এবং পরে দোতলায় একখানা ঘর খালি হইতে সেখানে যাইয়া অধিষ্ঠিত হইলাম। এই বাড়ীতে আমি প্রায় সাড়ে পাঁচ বৎসর ছিলাম। দেড় বছর পরে মেস উঠিয়া যায় এবং চার বৎসর এই বাড়ীতেই সপরিবারে বসবাস করি। আমি মনে করি যে এই কয়টা বৎসরই আমার জীবনের প্রকৃষ্টতম অধ্যায়। ঠাকুর ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বদাই আমার বাড়ীতে আসিতেন, কখন ৩।৪ দিন, কখন বা সপ্তাহকাল থাকিয়া আবার চলিয়া যাইতেন। কলিকাতায় অন্যত্রও, বিশেষতঃ মতিবাবুর বাড়ীতে, হামেশাই তাঁহার দর্শন পাইতাম। ছুটীতে ঢাকা গেলেও তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইতাম না। অনেক সময়েই সেখানেও তাঁহাকে পাইতাম। উপরন্তু, কলিকাতার বাহিরে ঠাকুরের সমভিব্যাহারে এখানে সেখানে যাইবার সুযোগও কয়েকবার আমার হইয়াছিল। এত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়ভাবে ঠাকুরের সঙ্গ বোধ হয় পরে আর কখনও পাই নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঠাকুরের সম্বন্ধে কখন কিছু লিখিব, এরূপ সঙ্কল্প কোনকালেই আমার ছিল না, সুতরাং আমি কিছুই লিখিয়া রাখি নাই। ক্রমে ক্রমে অনেক কথাই মনে আসিতেছে বটে কিন্তু সেগুলির পারম্পর্য্য ও সময়ক্রম সকল ক্ষেত্রে স্থির করিতে পারিতেছি না। পাঠক-পাঠিকারা স্মরণ রাখিবেন যে এখন হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো আগের ঘটনা পরে এবং পরের ঘটনা আগে চলিয়া যাইবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তাহাতে মূল বিষয়ের অনুসরণে বিশেষ কোনও অসুবিধা হইবে না। মানুষের জীবনে দেখা যায় যে বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মতামতও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি যে পূর্ব্বে এমন অনেক মত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছি, যাহা এখন কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে হয়তো লজ্জাই পাইতে হয়। কিন্তু ঠাকুরের বেলায় ৩০ বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে তিনি এক কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে কোন ক্রমবিকাশও দেখি নাই এবং কালের স্বাভাবিক নিয়মে দেহের পরিবর্ত্তন ছাড়া কোন পরিবর্ত্তনও দেখি নাই। তাঁহার মুখে মূলতঃ প্রথম দিন যাহা শুনিয়াছিলাম, শেষদিনও তাহাই শুনিয়াছি। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে সময়ক্রম বজায় না থাকিলেও পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না।

সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে একদিন বৈকালে কে যেন আমায় সংবাদ দিয়া গেলেন যে পরের দিন প্রাতঃকালে ঠাকুর আমার এখানে আসিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তখন আমি দোতলায় একখানি স্বতন্ত্র ঘর লইয়া থাকিতাম,

সুতরাং অসুবিধার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। সুবিধা অসুবিধার কথা অবশ্য আমার তরফ হইতে, ঠাকুরের কখন কোন অবস্থাতেই অসুবিধা হইতে দেখি নাই। দোতলায় প্রশস্ত হল ঘরে বিজলী পাখার নীচে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরেও ঠাকুরকে দেখিয়াছি, আবার জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠফাটা রোদে ৩॥´×৬´ ফুট পরিমিত টিনের ছাদওয়ালা চিলাকোঠায় সামান্য একখানা মাদুরের উপরেও তাঁহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি স্নান করিতেন না, আহারও তথৈবচ, ছাড়াইয়া না দিলে কাপড়ও ছাড়িতেন না। বিছানা যাহা হয় একটা হইলেই চলিত, সুতরাং তাঁহাকে লইয়া কোন অসুবিধার কথা উঠিতেই পারে না। তথাপি আমি এমন অপদার্থ এবং স্বভাবতঃই এমন সেবা-বিমুখ যে প্রতাপবাবু যখন নিজ হইতেই বলিলেন যে ঠাকুরের পরিচর্য্যার ভার তিনিই লইবেন, আমি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। প্রতাপবাবু তখনও ঠাকুরকে দেখেন নাই। কিন্তু আমার কাছে তাঁহার কথা শুনিয়া এবং ঠাকুরের একখানা ফটো দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই যাত্রায়ই তিনি ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে ঠাকুরের একজন নিতান্ত অনুরক্ত ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ তাহার গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোডের বাড়ীতে, ঠাকুর বহুবার বহু সময় কাটাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু অন্য একটা দুশ্চিন্তা মন হইতে কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলাম না। এই মেসে একটি উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছিলেন,

এখানে থাকিয়া তিনি আলিপুরে ওকালতী করিতেন। এই উকীলবাবু নানা কথা লইয়া আমার সহিত ঠাট্টা তামাসা করিতেন। আমি তখন শিখ-ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছি। উকীলবাবু হঠাৎ একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আচ্ছা ইন্দুবাবু, নানকের মায়ের নাম কি ছিল?" আমি সরল বিশ্বাসে বলিলাম "তৃপ্তা"। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিলাম যে তিনি আমাকে ঠাট্টা করিতেছেন। এ রকম প্রায় প্রত্যহই করিতেন। কিন্তু এই উকীলবাবুর মাত্রা জ্ঞানের অভাব ছিল; কোন কোন সময়ে এই সকল ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্যে ঠাকুরকেও প্রকারান্তরে টানিয়া আনিতেন। আমার একজন আত্মীয় ঐ মেসে থাকিতেন এবং উকীলবাবুর এই ঠাট্টা তামাসাগুলি অত্যন্ত উপভোগ করিতেন। প্রায়ই দুইজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া আলোচনা করিতেন এবং আমার বুঝিতে মোটেই কষ্ট হইত না যে আমাকে লইয়াই কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

এই নূতন পরিবেশের মধ্যে ঠাকুর আসিতেছেন, আমি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম এবং আমার আশঙ্কা যে অমূলক নয় ঠাকুর আসিতেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমার দোতলার ঘরখানার সম্মুখের বারান্দায় পূর্ব্ব হইতেই এক বাল্তি জল আনাইয়া রাখিয়াছিলাম, ঠাকুর আসিতেই আমি তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিলাম। উকীলবাবু তখন তেতলার বারান্দায় ছিলেন, "দেখে যান. দেখে যান" বলিয়া তাহার অন্তরঙ্গ আমার সেই আত্মীয়টিকে ডাকিতে লাগিলেন; ঠাকুরের পা ধোয়াইয়া দেওয়াটা যেন একটা হাস্যকর ব্যাপার

ঠাকুর আমার বাড়ীতে আসিবেন, এ কথাটা অনেকেই জানিতেন সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার কাছে বেশ একটু ভীড় জমিয়া গেল। কিন্তু আমার মন পড়িয়াছিল উকীলবাবুর দিকে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে তিনি এক একবার আসিয়া দরজার নিকটে দাঁড়াইতেছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই আবার উপরে চলিয়া যাইতেছেন। সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে তিনি—কে কি ভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছে, ঠাকুরের কথায় কাহার কিরূপ ভাবান্তর হইতেছে, ইত্যাদি বিষয়গুলি লক্ষ্য করিতেছেন এবং তেতলায় আমার সেই আত্মীয়টির নিকটে রিপোর্ট করিতেছেন। সেদিন ছুটি ছিল, উকীলবাবুর আদালত নাই, সুতরাং তিনি মহানন্দে উপর নীচ করিতে লাগিলেন। বেলা ১২টা নাগাদ সকলেই চলিয়া গেলেন। প্রতাপবাবু তাড়াতাড়ি ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। দু' চামচ ঘি, এক চামচ চিনি (চা'র চামচের) ও আঁধখানা চাঁপা কলা, ইহাই ছিল তখন ভোগের সামগ্রী। আমিও স্নানাহার সারিয়া আসিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। উকীলবাবু কয়েকবার জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গেলেন, দু'তিন বার আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, আমি শুনিয়াও শুনিলাম না।

ঠাকুরকে নিরিবিলি পাইয়া আবার আমি আমার সেই প্রশ্নটার অবতারণা করিলাম, অখণ্ড যিনি তিনি খণ্ড হইলেন কি করিয়া, সেই মামুলী সমস্যা। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটার আলোচনা করিলেন। আমার এক একবার মনে হইল যেন বুঝিতেছি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই

আলোচনা ঠাকুরের সহিত আমার আরও কয়েকবার হইয়াছে কিন্তু বিশেষ লাভবান হইতে পারি নাই। ক্রমে এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে যে বিষয়টা বুদ্ধির অগম্য। কিছুদিন পূর্ব্বে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন'এর ভগবদ্গীতার ইংরেজী সংস্করণে দেখিলাম যে তিনিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—"The question cannot be answered on the empirical plane", অর্থাৎ প্রয়োগজ স্তরে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। আমি দর্শনশাস্ত্রের কিছুই জানি না, তথাপি একটা কথা বলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। এদেশে বা বিদেশে, যেখানেই এই প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই যেন দু'চারটা ভিত্তিহীন অনুমানের আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং একটু গোঁজামিল যেন সর্ব্বত্রই আছে। নিতান্ত অনধিকারী হইয়াও একটা বড় কথা বলিয়া ফেলিলাম, পাঠক-পাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

সেদিন বৈকালে প্রভাতবাবু ঠাকুর দর্শনে আসিলেন, আর কে আসিয়াছিলেন ঠিক স্মরণ নাই। উকীলবাবুর কার্য্যকলাপে আমি অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিলাম। প্রভাতবাবু আসিতেই ব্যাপারটা তাহাকে বিশদভাবে খুলিয়া বলিলাম। আমরা যেমন অনেক সময়ে রাখিয়া ঢাকিয়া বলি, প্রভাতবাবুর সে বালাই ছিল না। সুতরাং উকীলবাবুর বরাতে যে শীঘ্রই একটা বিপর্য্যয় আসিতেছে, ইহা ভাবিয়া মনে মনে বেশ একটু আনন্দই অনুভব করিলাম। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাহা হইল না, ব্যাপারটা দাঁড়াইল অন্য রকম। কাশীতে এক

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই ভদ্রলোক ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ঠাকুর সেবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন অসময়ের গুটিকয়েক আম, প্রায় ৩ ডজন মর্ত্তমান কলা, সের ৩।৪ বড় বাজারের উৎকৃষ্ট রাবড়ি এবং বড় একটা ঠোঙ্গায় সন্দেশ, তাহাও প্রায় ৩ সের হইবে। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার এক ভৃত্য আসিয়াছিল, সে ক্রমে ক্রমে জিনিষগুলি আনিয়া ঠাকুরের খাটের সম্মুখে রাখিল। প্রভাতবাবু তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন এবং হাতছানি দিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমিও তাহার ইঙ্গিত মত বাহির হইয়া আসিলাম। প্রভাতবাবু বলিলেন: "চমৎকার রাবড়ি আসিয়াছে, শীগ্‌গির কিছু গরম মুড়ি আনাও।" চাকরকে পয়সা দিলাম, অবিলম্বে গরম মুড়ি আসিয়া পড়িল। পাশের ঘরে সুখলালবাবু (শ্রীসুখলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার আত্মীয় ও ঠাকুরের আশ্রিত) থাকিতেন, তাহার ঘরেই মুড়ি রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু বিপদ হইল এই যে ইহার পর প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টা কাটিয়া গেল, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের উঠিবার নাম নাই। প্রভাতবাবু ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, একবার সিগারেট ধরান, একবার তামাক আনান, একবার ওঘরে যান একবার এঘরে আসেন, কিন্তু মাড়োয়ারী উঠে না। মহা মুশ্‌কিলে পড়া গেল, কিন্তু ঠাকুরই উপায় করিয়া দিলেন। জিনিষগুলি দেখাইয়া আমাকে বলিলেন: "এগুলি ঐঘরে নিয়া রাখেন।" তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালিত হইয়া গেল। প্রভাতবাবু রান্নাঘর হইতে কয়েকটি বাটি আনাইলেন এবং রাবড়ির

সদ্ব্যবহার আরম্ভ হইল। মুড়ি আসিয়াছে দেখিয়াই উকীল-বাবু একবার ঘুরিয়া গিয়াছিলেন, এখন পাকাপাকি আসিয়া জুটিলেন। যতদূর স্মরণ হয় আমরা সেখানে চারজন ছিলাম, অর্থাৎ আমি, প্রভাতবাবু, সুখলালবাবু এবং উকীলবাবু। একখানা থালায় সাজাইয়া সবই কিছু কিছু ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকে দিয়া আসিলাম এবং প্রভাতবাবু ঠাকুরের জন্য কিছুটা আলাদা করিয়া তাকে তুলিয়া রাখিলেন। পরে তিনটি বাটি লইয়া রাবড়ি, মুড়ি প্রভৃতি তুলিতে লাগিলেন। সুখলালবাবু উকীলবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন : "ও'র জন্য একটা বাটি লইবেন না?" প্রভাতবাবু জিভ কাটিয়া বলিলেন : "সর্ব্বনাশ! প্রসাদ কি ওকে দিতে পারি।" উকীলবাবু বলিলেন : "কই, প্রসাদ তো এখনও হয় নাই।" তদুত্তরে প্রভাতবাবু বলিলেন : "বলেন কি মশাই, ওঁদের দৃষ্টিতেই প্রসাদ হইয়া যায়। আর তাই বা কেন? ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক যখন ঠাকুরের নামে জিনিষ-গুলি কিনিয়াছেন, তখনই প্রসাদ হইয়া গিয়াছে।" উকীলবাবুও নাছোড়বান্দা, বলিলেন : "এই জিনিষগুলি প্রসাদ হইয়া গিয়াছে বলিয়া যখন আমি বিশ্বাস করি না, আমি না হয় রাবড়ি সন্দেশ জ্ঞানেই খাইব, তাহাতে আপনার আপত্তি কি?" প্রভাতবাবু বলিলেন : "প্রসাদের অবমাননা করিতে দিয়া আমি মহাপাতকের ভাগী হইতে পারিব না," এবং নিবিষ্ট মনে রাবড়ি সেবায় নিযুক্ত হইলেন। উকীলবাবু ক্ষুণ্ণ মনে তেতলায় চলিয়া গেলেন। আমার একটু দুঃখই হইল, বুঝিলাম যে একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। কিন্তু প্রভাতবাবু দৃঢ়সঙ্কল্প, সুতরাং নীরবেই রহিলাম

জানিতাম যে কিছু বলিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া যাইবে। প্রভাতবাবু চলিয়া যাওয়ার পর তাহার ন্যায্য ভাগের কিছু বেশী অংশই উকীলবাবুকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং তিনি তাহা হৃষ্টমনেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে আমি ও বরদাবাবু ঠাকুরের নিকট বসিয়াছিলাম, হঠাৎ উকীলবাবু আসিয়া আমাদের পাশে বসিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়াছিলেন কিনা স্মরণ নাই। বসিয়াই পা নাড়িতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ গা চুলকাইলেন এবং পরে ঠোট কামড়ান আরম্ভ হইল। ৩।৪ মিনিট পরে হঠাৎ উঠিয়া গেলেন, আবার আসিলেন, আবার উঠিলেন, এরূপ হয়তো বহুক্ষণই চলিত কিন্তু আদালত খোলা থাকায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বরদাবাবুও বিদায় লইলেন এবং আমি ঠাকুরকে লইয়া একাই রহিলাম। কি প্রসঙ্গে কথাটা উঠিয়াছিল ঠিক মনে আনিতে পারিতেছি না, কিন্তু এইটুকু বেশ স্পষ্ট মনে আছে যে আমি ঠাকুরকে তাঁহার নিজের রাশিচক্র সম্বন্ধে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি একটুকরা কাগজ লইয়া তাহাতে চক্রটি আঁকিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। সেইদিনই প্রথম জানিতে পারিলাম যে মাঘী শুক্লা দশমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রে, বৃহস্পতিবার ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনই মনে মনে স্থির করিলাম যে এই তিথিতে যা হো'ক একটা কিছু করিতেই হইবে এবং কথাটা ঠাকুরকে বলিয়াই ফেলিলাম। ঠাকুরও তিথি-উৎসবে কি করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমাকে বলিয়া দিলেন। অতঃপর

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম: "এরূপ রাশিচক্রের ফল কেমন হয়?" ঠাকুর বলিলেন: "ইচ্ছা-মৃত্যু যোগ হয়।" তাহাতে আমি বলিলাম: "ইচ্ছামৃত্যু যোগ হয় তাহা আপনি না বলিয়া দিলেও আমি জানি, কিন্তু ইচ্ছাটা কখন হইবে তাহার কোন ইঙ্গিত এই রাশিচক্রে আছে কি?" ঠাকুর যেন প্রশ্নটা এড়াইয়া গেলেন এবং উত্তরে যাহা বলিলেন তাহা আমার কাছে কতকটা হেঁয়ালির মতই মনে হইল। আমি এমন দুর্ভাগা যে ঠাকুরের সেই স্বহস্ত লিখিত কাগজখানা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

বেলা হইতেছিল সুতরাং উঠিতে হইল এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে একা রাখিয়াই কলেজে চলিয়া গেলাম। ফিরিবার সময় প্রভাতবাবুকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। ঘরে ঢুকিয়া দেখি যে সেখানে একটি ছোটখাট সভা বসিয়া গিয়াছে। একটু মনোযোগ দিতেই বুঝিলাম যে ঠাকুর জীবের বন্ধনের কারণ ও উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ঠাকুরের সহিত পরিচয়ের প্রথম দিকে আমি প্রায় সর্ব্বদাই দেখিয়াছি যে এই প্রসঙ্গে তিনি সীতা ও মায়ামৃগের উপাখ্যানটির সাহায্যে এই গুরুতর প্রশ্নটার মীমাংসা করিতেন, এখনও তাহাই করিতেছিলেন। তাঁহার নিজস্ব ভাষায় কথাটা বলিয়া উঠা সম্ভব হইবে না। সুতরাং "বেদবাণী"র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "সীতা, রাম ও লক্ষণের সহিত, পঞ্চবটীতে কুটীর বাঁধিয়া মহাসুখে বাস করিতেছিলেন। তিনি যে রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের সেই বিলাসপঙ্কিল, খরস্রোত জীবন তাঁহার নিকট

স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইত। পরিধানে সামান্য বল্কল, ফলমূল আহার, কিন্তু সকলই অমৃততুল্য। স্বামীর অকুণ্ঠ প্রেম ও দেবরের নিষ্কলুষ স্নেহ তাঁহাকে এক বিচিত্র মধুর নিগড়ে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এক কথায়, কোন অভাবই তাঁহার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি প্রলোভনে পড়িয়া গেলেন, মায়ামৃগ দেখিয়া তিনি আত্মহারা হইলেন। স্বর্ণমৃগ যে কখন বাস্তব হইতে পারে না, তাহা যে নিশ্চিতই অলীক, মায়ামরীচিকা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, এই প্রকারের কোন যুক্তিই তাঁহার মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল না, নিদারুণ প্রলোভনে তিনি তখন কাণ্ডজ্ঞানহীন। ফল দাঁড়াইল এই যে রাবণ তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, পথে জটায়ুর সাহায্যে কিছুই হইল না, সীতা অশোক বনে বন্দিনী হইয়া রহিলেন। জীবও এই প্রকার মায়ামরীচিকার পিছনে ঘুরিয়া বন্দী হয়, প্রলোভনই বন্ধনের কারণ।”

“আবার রামই আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া, সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া, ঘোরতর যুদ্ধের পর রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু সীতা করিলেন কি? তিনি চেড়ীগণের প্রলোভন ও শাসন অকাতরে সহ্য করিয়া অনুক্ষণ রাম-চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন। সুতরাং দেখা গেল যে বন্ধনের কারণ যেমন প্রলোভন, উদ্ধারের উপায় অনন্যচিন্তা ও অকাতরে প্রারব্ধ বেগ সহ্য করা।” ঠাকুর বলিতেন যে বদ্ধ হইবার শক্তি জীবের আছে কিন্তু উদ্ধার হইবার শক্তি নাই। এই কথাটাই সীতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বিশদভাবে বলিতেছিলেন।

এই আলোচনা নানাভাবে আমি ঠাকুরের মুখে বহুবার শুনিয়াছি কিন্তু হইলে কি হইবে, 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" আমাদের বিপদ হইল এই যে আমরা যে বন্দী এই বোধই আমাদের নাই, যদি তাহা বুঝিতাম তবে উদ্ধারের জন্যও ছট্‌ফট্ করিতাম। সংসার কখনও আমাদের কাছে গারদ বলিয়া প্রতিভাত হয় না এবং শত দুঃখ কষ্ট পাইলেও আমরা ইহার ভিতরই সুখের অনুসন্ধান করি। এই প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়িতেছে। কোন সময়ে এক ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশের জন্য এক খ্যাতনামা মুনির নিকট গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সেই ব্যক্তি মুনিকে বলিল : "আপনার কথায় বুঝিলাম যে সংসারে সুখ নাই, কিন্তু আমার সন্দেহ মিটিতেছে না। বাস্তবিক কি সংসারে কোন সুখই নাই ?" মুনি কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, পরে বলিলেন : "একেবারে যে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেই সুখের স্বরূপ তুমি সহজে বুঝিবে না। একটা গল্প বলি শোন।" মুনি বলিতে লাগিলেন যে কোনও গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বাস করিত। তাহাদের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ ছিল নিতান্ত দুর্ভাগা, কায়ক্লেশে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ভিক্ষাও সকল সময়ে জুটিত না, মধ্যে মধ্যে উপবাস করিয়াও কাটাইতে হইত। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণী একদিন জ্বরে পড়িল এবং তিন দিন পরে সেই জ্বরের বিরাম হইল। ব্রাহ্মণী এই কয়দিন পথ্য বিশেষ কিছুই পায় নাই সুতরাং চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ব্রাহ্মণকে ভিক্ষায় পাঠাইয়া দিল। নিজে উনান ধরাইয়া

হাড়িতে জল চড়াইয়া বসিয়া রহিল, ইচ্ছা যে চাল কটি আসিলেই যেন তাড়াতাড়ি ফুটাইয়া লইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর আসে না, মধ্যাহ্ন পার হইয়া গেল তবু তাহার দেখা নাই। ক্ষুধার তাড়নায়, ক্রোধে, ক্ষোভে ব্রাহ্মণীর জ্ঞান হারাইবার উপক্রম হইল। এমন সময় নিতান্ত বিষণ্ণ চিত্তে চোরের মত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। অদৃষ্টের এমনই বিড়ম্বনা যে সেদিন ব্রাহ্মণ যেখানে গিয়াছে সেখান হইতেই 'দূর দূর' করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, এক মুষ্ঠি ভিক্ষাও মিলে নাই। ব্রাহ্মণ আসিতেই ব্রাহ্মণী ভিক্ষার ঝুলিটি টানিয়া লইল কিন্তু যখন দেখিল যে তাহা একেবারে শূন্য, এক দানা চালও তাহাতে নাই, তখন সে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। "ড্যাক্‌রা মিন্‌সে, খেতে যদি না দিতে পার্‌বি তবে বিয়ে করেছিলি কেন?" এই কথা বলিয়া উনান হইতে একখানা অর্দ্ধদগ্ধ কাঠ লইয়া ব্রাহ্মণের পিঠে সপাসপ কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে ম্রিয়মান হইয়া ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। সে তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য, কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে, কিছুই তাহার হুস নাই। হুস হইল তখন যখন অকস্মাৎ তাহার খেয়াল হইল যে চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। একটু লক্ষ্য করিয়াই বুঝিল যে সে এক গভীর অরণ্যের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ দেখিতে পাইল যে এক বিপুলকায় বন্য হস্তি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, ঊর্দ্ধে শুঁড় তুলিয়া মহাবেগে তাহার দিকে ধাইয়া আসিতেছে। প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ব্রাহ্মণ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য

হইয়া দৌড়াইল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে হঠাৎ একটা কূপের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছিল, অতিকষ্টে একটা লতাগাছ আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিল এবং কূপের উপরার্দ্ধে ঝুলিতে লাগিল। শুধু ইহাই নহে। একটু লক্ষ্য করিতেই ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিল যে কূপটি শুষ্ক এবং উহার তলদেশে এক মহা ভয়ঙ্কর বিষধর কাল সর্প ফণা তুলিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছে। আবার এদিকে লতা গাছটির গোড়ায় একটি মৌচাক ছিল, টানাটানিতে সেই চাকটি ভাঙ্গিয়া গেল এবং মৌমাছিগুলি উড়িয়া আসিয়া নির্বিবচারে ব্রাহ্মণের গায়ে হুল ফুটাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের অবস্থাটা একবার কল্পনা করিয়া দেখুন, উপরে ক্রোধোন্মত্ত হস্তি ধাওয়া করিয়া আসিতেছে, নীচে বিষধর গর্জ্জন করিতেছে, মৌমাছিরা মনের আনন্দে হুল ফুটাইতেছে, এবং সে যে লতাটি আশ্রয় করিয়া আছে, তাহা এত সরু যে যে-কোন মুহুর্ত্তেই মূল শুদ্ধ উঠিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও ব্রাহ্মণের সুখলিপ্সা অটুটই রহিয়াছে। মৌচাক ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় লতা বাহিয়া একটু একটু করিয়া মধু চুয়াইয়া আসিতেছে এবং ব্রাহ্মণ তাহা চাটিতেছে। উপসংহারে মুনি বলিলেন: "সংসারের সুখ এই মধু-চাটা সুখ।" অথচ এই সুখের জন্য কত না রেষারেষি, কত না দলাদলি, কত না লাঠালাঠি। তাই বলিতেছিলাম যে সংসার যে একটা নিষ্করুণ বন্ধন এই বোধই আমাদের নাই, শত উপদেশেও আমাদের চৈতন্য হয় না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে একবার এই বোধ জাগ্রত হইলেই ছটফটানি আরম্ভ হয় এবং পথের

অনুসন্ধানও সুরু হইয়া যায়। বিষাদ-যোগ হইতেই গীতার আরম্ভ।

যাহাই হউক, দশটা নাগাদ সকলেই চলিয়া গেলেন এবং সে রাত্রিতে উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে না। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে ঢাকা হইতে কোনও বিশেষ কাজে প্রফুল্লবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার ঘরে ঠাকুরকে দেখিয়া একান্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "ইনি কে?" আমি বলিলাম: "সেই বেশী পাকা লোকটি।"

প্রফুল্লবাবু চমকাইয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্ব মন্তব্য স্মরণ করিয়া বোধ হয় একটু লজ্জিতও হইলেন। আমি পরিচয় করাইয়া দিলাম এবং প্রফুল্লবাবু ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত প্রফুল্লবাবু খাটের উপরে তাঁহার পাশেই উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল কিন্তু কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। সে দিন আমার অনেক কাজ ছিল, একটু পরেই উঠিয়া গেলাম এবং স্নানাহার সারিয়া প্রফুল্লবাবুর হেপাজতে ঠাকুরকে রাখিয়া কলেজে চলিয়া গেলাম। ফিরিতে ৬টা বাজিয়া গেল। দোতলায় উঠিয়া দেখি যে আমার ঘর অন্ধকার এবং কেহই সেখানে নাই। তখন ঐ বাড়ীর দোতলা এবং তেতলায় ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থা ছিল না, হারিকেন লণ্ঠন জ্বালাইয়া আমাদের কাজ চালাইতে হইত। মনে হইল যেন বাথ্‌রুমের দিকে একটু আলো দেখা যাইতেছে। সেখানে যাইয়া দেখিলাম যে ঠাকুর বাথ্‌রুমে গিয়াছেন এবং প্রফুল্ল-

বাবু লণ্ঠন হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি বলিলাম: "দেখিলে তো লোকটি কেমন পাকা, একদিনেই তোমাকে লণ্ঠন ধরাইয়া ছাড়িয়াছেন।" সেই সময় ঠাকুর বাথ্‌রুম হইতে বাহির হইয়া আসায় প্রফুল্লবাবু উত্তরের দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন কিন্তু আমি তাহাকে সহজে নিষ্কৃতি দেই নাই। এই কথা লইয়া অনেক ঠাট্টাই তাহাকে হজম করিতে হইয়াছে।

শীঘ্রই আরও অনেকে আসিয়া জুটিলেন এবং ঠাকুর প্রায় দুই ঘণ্টাকাল নানা বিষয়ে আলোচনা করিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে ঠাকুরের আলোচনার মূল বিষয় ছিল—স্বভাব। তিনি বলিতেছিলেন যে স্বভাবে থাকাই ধর্ম্ম, স্বভাবকে ছাড়িয়াই জীব অভাবে পড়িয়া যায় এবং তাহাতেই সুখদুঃখকর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই কথাগুলি বিশদভাবে বিস্তার করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন: "অকর্ত্তাবুদ্ধিই স্বভাব, কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিই অভাব।" জীবের স্বরূপোপলব্ধির প্রধান অন্তরায় অহংবুদ্ধি এবং এই অহঙ্কারাত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যাহা কিছু করি সকলই দক্ষযজ্ঞ—শিবহীন যজ্ঞ, প্রমথগণের উৎপাতে শেষ পর্য্যন্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইতে বাধ্য। আমার মনে হয় যে মানব সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থা এই কথাটিরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিছুকাল যাবৎ মানুষ কেবল বুদ্ধির চর্চ্চাই করিয়াছে এবং ফল হইয়াছে এই যে মানুষের সৃষ্টিই হইয়া দাঁড়াইয়াছে বড়, মানুষ নিজে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে। স্বকীয় সৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানুষ আজ স্তব্ধ, অসহায়, বিপর্য্যস্ত। ইহাই দক্ষযজ্ঞ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই প্রমথগণের উৎপাতে এই দক্ষযজ্ঞে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

কথাটা পরে আবার উঠিবে এবং তখন ইহাকে যথাসাধ্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ দিন সকালবেলা ঠাকুর অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সেদিনকার একটি রহস্যজনক ব্যাপার বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। এক ভদ্রলোক বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া ঐ মেসেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি যে কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন কিনা, এই কথাটি ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু তিনি আমার ঘরে আসিবার সামান্য কিছু পূর্ব্বেই ঠাকুর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়েন এবং তিনি চলিয়া গেলেই আবার উঠিয়া বসেন। এইরূপ ২।৩ বার হইল। ৯'টার সময় ঠাকুর চলিয়া গেলেন, সুতরাং ভদ্রলোকের আর কথাটা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার পর প্রফুল্লবাবুর সহিত নিভৃতে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। কিসে কি হইল প্রফুল্লবাবু পরিষ্কার কিছুই বলিতে পারিলেন না, কিন্তু দেখিলাম যে তিনি "পাকা লোকটির" বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাকে জানাইলেন যে ঠাকুরের সঙ্গে তাহার বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শীঘ্রই ঢাকা যাইবেন এবং বাসাবাড়ী লেনে ৺বীরেন মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিবেন। প্রফুল্লবাবুদের বাড়ীতেও যাইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

দুপুর বেলা কলেজে এক রকম কাটিয়া গেল কিন্তু বাড়ী ফিরিতেই কেমন খালি খালি বোধ হইতে লাগিল। প্রফুল্লবাবু বাহির হইয়া গিয়াছিলেন সুতরাং হাত মুখ ধুইয়া জলযোগান্তে

বাবু লণ্ঠন হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি বলিলাম: "দেখিলে তো লোকটি কেমন পাকা, একদিনেই তোমাকে লণ্ঠন ধরাইয়া ছাড়িয়াছেন।" সেই সময় ঠাকুর বাথ্ রুম হইতে বাহির হইয়া আসায় প্রফুল্লবাবু উত্তরের দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন কিন্তু আমি তাহাকে সহজে নিষ্কৃতি দেই নাই। এই কথা লইয়া অনেক ঠাট্টাই তাহাকে হজম করিতে হইয়াছে।

শীঘ্রই আরও অনেকে আসিয়া জুটিলেন এবং ঠাকুর প্রায় দুই ঘণ্টাকাল নানা বিষয়ে আলোচনা করিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে ঠাকুরের আলোচনার মূল বিষয় ছিল—স্বভাব। তিনি বলিতেছিলেন যে স্বভাবে থাকাই ধর্ম্ম, স্বভাবকে ছাড়িয়াই জীব অভাবে পড়িয়া যায় এবং তাহাতেই সুখদুঃখকর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই কথাগুলি বিশদভাবে বিস্তার করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন: "অকর্ত্তাবুদ্ধিই স্বভাব, কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিই অভাব।" জীবের স্বরূপোপলব্ধির প্রধান অন্তরায় অহংবুদ্ধি এবং এই অহঙ্কারাত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যাহা কিছু করি সকলই দক্ষযজ্ঞ—শিবহীন যজ্ঞ, প্রমথগণের উৎপাতে শেষ পর্য্যন্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইতে বাধ্য। আমার মনে হয় যে মানব সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থা এই কথাটিরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিছুকাল যাবৎ মানুষ কেবল বুদ্ধির চর্চ্চাই করিয়াছে এবং ফল হইয়াছে এই যে মানুষের সৃষ্টিই হইয়া দাঁড়াইয়াছে বড়, মানুষ নিজে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে। স্বকীয় সৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানুষ আজ স্তব্ধ, অসহায়, বিপর্য্যস্ত। ইহাই দক্ষযজ্ঞ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই প্রমথগণের উৎপাতে এই দক্ষযজ্ঞে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

কথাটা পরে আবার উঠিবে এবং তখন ইহাকে যথাসাধ্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ দিন সকালবেলা ঠাকুর অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সেদিন-কার একটি রহস্যজনক ব্যাপার বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। এক ভদ্রলোক বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া ঐ মেসেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি যে কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন কিনা, এই কথাটি ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু তিনি আমার ঘরে আসিবার সামান্য কিছু পূর্ব্বেই ঠাকুর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়েন এবং তিনি চলিয়া গেলেই আবার উঠিয়া বসেন, এইরূপ ২।৩ বার হইল। ৯'টার সময় ঠাকুর চলিয়া গেলেন, সুতরাং ভদ্রলোকের আর কথাটা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার পর প্রফুল্লবাবুর সহিত নিভৃতে কিছু-ক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। কিসে কি হইল প্রফুল্লবাবু পরিষ্কার কিছুই বলিতে পারিলেন না, কিন্তু দেখিলাম যে তিনি "পাকা লোকটির" বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাকে জানাইলেন যে ঠাকুরের সঙ্গে তাহার বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শীঘ্রই ঢাকা যাইবেন এবং বাসাবাড়ী লেনে ৺বীরেন মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিবেন। প্রফুল্লবাবুদের বাড়ীতেও যাইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

দুপুর বেলা কলেজে এক রকম কাটিয়া গেল কিন্তু বাড়ী ফিরিতেই কেমন খালি খালি বোধ হইতে লাগিল। প্রফুল্লবাবু বাহির হইয়া গিয়াছিলেন সুতরাং হাত মুখ ধুইয়া জলযোগান্তে

নিজের ঘরে একাকীই বসিয়া রহিলাম। কিন্তু নিরিবিলি থাকিবার জো কি, একটু পরেই উকীলবাবু আসিয়া আমার পাশে বসিলেন। আমার মেজাজটা বিগড়াইয়া গেল কিন্তু মুখে কিছু বলিলাম না। প্রথমে ঠাকুরের সম্বন্ধে কি একটা কথা বলিয়া উকীলবাবু এক মাতাজীর কথা বলিলেন। এই মাতাজী নাকি কবে তাহাকে একটা রুদ্রাক্ষ দিয়াছিলেন এবং এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া তিনি নাকি অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছিলেন। আমি হাঁ না কিছুই বলিলাম না। ইহার পর উকীলবাবু আরম্ভ করিলেন অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীদের কথা। আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে উকীলবাবু বলিতে চাহিতেছেন যে এই সকল সাধুদের তুলনায় ঠাকুর নিতান্তই নগণ্য। আমরা নির্ব্বোধ বলিয়াই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। এই সময় প্রফুল্লবাবু আসিয়া পড়ায় আমি উকীলবাবুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। প্রফুল্লবাবু রাত্রের গাড়ীতেই ঢাকা চলিয়া গেলেন। তিনি যে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তাহার কিছুই তখনও হয় নাই, সুতরাং আমি তাহাকে আরও ২।৪ দিন অপেক্ষা করিয়া যাইতে বলিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। আমার মনে হইয়াছিল যে বাড়ী ফিরিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া হরিদাসবাবুকে, ঠাকুরের কথাটা বলিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন।

২

আমার মেস হইতে ঠাকুর সেবার গিয়াছিলেন ৺মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে। মতিবাবু তখন বৌবাজারে গিনি হাউসের নিকটে একটা গলিতে থাকিতেন, নামটা স্মরণ হইতেছে না। সে বাড়ীতে এক তলায় আর এক ঘর ভাড়াটিয়া ছিলেন, মুখে কিছু না বলিলেও তাহাদের হাবভাবে বুঝা যাইত যে তাঁহারা ঠাকুরকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না। ঠাকুরের কাছে যে সর্ব্বদা লোকজন আসিত ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতেন এবং মুখভার করিয়া থাকিতেন। আবার এদিকে মতিবাবুরও কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না, তিনি বাড়ী না থাকিলে তাহার স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া উপরে যাইবার ব্যবস্থা করাও অনেক সময়ে কঠিন হইয়া উঠিত। বাজার সারিয়া দোকানে যাইতে মতিবাবুর প্রায় ৮টা বাজিয়া যাইত, সুতরাং একটু তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চা-সহযোগে কিঞ্চিৎ জল-খাবার খাইয়া ৭।৩০'টার মধ্যেই মতিবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম যে মতিবাবুকে নিশ্চয়ই বাসায় পাইব এবং আমার দোতলায় যাইয়া ঠাকুর দর্শনে কোনও অসুবিধা হইবে না। নীচের তলায় ছোট্ট একখানি বসিবার ঘর ছিল, সেখানে গিয়া দেখিলাম যে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছেন। তাহার নিকট জানিলাম যে মতিবাবু বাড়ী নাই, তথাপি "মতিবাবু, মতিবাবু" বলিয়া দুই তিনবার হাঁক দিলাম, মনে মনে এই আশা যে আমার আওয়াজ শুনিয়া কেহ হয়তো আমার উপরে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। দুই তিন মিনিট

অপেক্ষা করিলাম কিন্তু কোন সাড়াই পাইলাম না, তখন অগত্যা তক্তাপোশের উপর সেই ভদ্রলোকের পাশে যাইয়া বসিলাম। তাহার দিকে তাকাইতেই বুঝিলাম যে তিনি অত্যন্ত চটিয়াছেন। আমাকে বলিলেন: "'মতিবাবু, মতিবাবু' ব'লে ষাঁড়ের মত চেঁচালেন কেন মশাই, আমার কথা আপনার বিশ্বাস হ'ল না?" আমি তাহাকে আমার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিতে তিনি যেন কিছুটা ঠাণ্ডা হইলেন মনে হইল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে মতিবাবু শীঘ্রই আসিয়া পড়িবেন এবং আমরা দুজনে গল্পগুজব করিয়া অনায়াসেই সময়টা কাটাইয়া দিতে পারিব। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন: "সে পরে হবে এখন, আগে আমার একটা কথা শুনুন। এই দুনিয়াটা কি ক'রে ভাল করা যায় বলতে পারেন?" আমি কোন উত্তর না দিয়া একটু নিবিষ্টভাবে ভদ্রলোকের দিকে তাকাইলাম। আগে ততটা লক্ষ্য করি নাই, এখন দেখিলাম যে অদ্ভূত চেহারা। বয়স আন্দাজ ৫০।৫৫ বৎসর, মুখে কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বোধ হয় ৮।১০ দিন ক্ষুরের সংস্পর্শে আসে নাই, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উন্নত নাসা, চোখ দুটি বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সমুজ্জ্বল। সমগ্র চেহারায় একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ। পোষাকেও বৈচিত্র্যের অভাব নাই। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতা, পরিধানে মোটা মিলের ধুতি, গায়ে একটি লংক্লথের ফতুয়া, তাহার উপর একখানি মোটা চাদর এবং সর্ব্বোপরি একখানা লাল রঙের জাপানী কম্বল। আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া আছি দেখিয়া ভদ্রলোক বলিলেন: "হয়েছে তো, এইবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন্।" আমি একটু

লজ্জিত হইলাম এবং বিনীতভাবে বলিলাম : "ঠাকুরের কাছে আসিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি আর কি জবাব দিব।" উত্তরে তিনি আমাকে জানাইলেন যে গত রাত্রে ঠাকুরের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাঁহাকেও তিনি এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাহার কথার জবাব না দিয়া উল্টা তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছেন : "ছুনিয়াটা ভাল করার আপনার কি প্রয়োজন?" জবাবে তিনি কি বলিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন : "কথাটা তাহ'লে আপনাকে খুলেই বলি। আপনি বোধ হয় আমাকে অৰ্দ্ধ উন্মাদ বা ঐ রকম একটা কিছু ঠাওরাইয়াছেন, অনেকেই ঐরূপ ভাবে, কিন্তু আগে আমার কথাটা শুনুন।" ভদ্রলোক বলিলেন যে তাহার বাড়ী যশোহর জেলার কোনও এক গ্রামে, পশ্চিমাঞ্চলে সেচ বিভাগে চাকুরী করিতেন। ৩ বৎসর পূর্ব্বে অসময়ে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ভদ্রলোকের দুইটি কন্যা, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীও ৫ বৎসর পূর্ব্বে গত হইয়াছেন, সুতরাং এখন তাহার ঝাড়া হাত-পা। প্রায় দু'শ টাকা পেন্সন পান এবং এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। চাকুরী জীবনের এক নিদারুণ অভিজ্ঞতাই নাকি তাহার অসময়ে অবসর গ্রহণ করিবার কারণ। সেচ বিভাগে চাকুরীর সময় তিনি দেখিতেন যে একটা নিখুঁত পরিকল্পনা কিছুতেই করিয়া উঠা যায় না। একদিকে খাল কাটিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইল, অনাবাদী জমি আবাদে আসিল, সুন্দর সুন্দর নূতন গ্রাম গড়িয়া উঠিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ আসিল যে এই দিকে অতিরিক্ত জল চলিয়া যাওয়ায় অন্য একদিকে

জলাভাব উপস্থিত হইয়াছে, আবাদের অসুবিধা হইতেছে এবং স্থানে স্থানে ম্যালেরিয়াও দেখা দিয়াছে। এই নূতন সমস্যারও যাহা হউক একটি ব্যবস্থা করিতে না করিতে আবার তৃতীয় কোনও স্থান হইতে অভিযোগ আসিতে আরম্ভ করিল। দেখা গেল যে নিছক ভাল কিছুই করা যায় না, ভাল'র সঙ্গে মন্দ যেন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়াই আছে। তাহার মনে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে স্ত্রী গত হওয়ায় সংসারের দায়িত্বও আর বিশেষ কিছুই রহিল না, চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

অনেক স্থানে ঘুরিয়াছেন, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, সাধু, সন্ত প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই আলাপ আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহার সমস্যার সমাধান হয় নাই। অবশেষে পশ্চিমের কোনও এক স্থানে অশীতিপর বৃদ্ধ, সৌম্যকান্তি, দীর্ঘশ্মশ্রু এক সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুবাবা কয়েকজন শিষ্যসেবক লইয়া একটি আশ্রমে বসবাস করিতেছিলেন। সাধুবাবার নিকট তাহার সমস্যার কথা উত্থাপন করিতেই তিনি বলিলেন : "বেটা, আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা।" কথাটা পুরাতন এবং পূর্ব্বেও তিনি ইহা বহুবার শুনিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সাধুবাবার মুখে কেমন যেন নূতন নূতন ঠেকিল। ভদ্রলোক সেখানে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সহজেই অনুমতি পাইলেন এবং তাহার জন্য একটি ছোট ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল। সাধুবাবার সংসর্গে কিছুকাল বেশ আনন্দেই কাটাইলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় একটা সজীব সরসতা অনুভব করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন কিনা,

এরূপ চিন্তাও যে মাঝে মাঝে না আসিত এমন নহে। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবার এক খটকা লাগিয়া গেল। "আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা" কথাটা লইয়াই আলোচনা হইতেছিল। সাধু-বাবার কথায় ভদ্রলোক বুঝিলেন যে তিনি ভাল হইলেই জগৎটাও যে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হইয়া যাইবে তাহা তো সাধুবাবা বলিতেছেন না। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য তিনি এই বুঝিলেন যে তিনি ভাল হইলে জগতের ভালমন্দ বোধ তাহার থাকিবে না, ভালমন্দ যেমন আছে তেমনই থাকিবে। তাহার সমস্যার এরূপ সমাধান তো তিনি চাহেন নাই, সুতরাং সেই রাত্রেই বিছানা বাক্স বাঁধিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। এদিক ওদিক দু'চার জায়গা ঘুরিয়া কাশী আসিয়া উপস্থিত হ'ন এবং সেখানেই ঠাকুরের সন্ধান পান। স্থানীয় এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে মতিবাবুর ঠিকানা লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

এই কাহিনী শুনিয়া সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে ভদ্রলোক বাতিকগ্রস্ত এবং তাহাকে কিছু বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তথাপি, কেন জানি না, চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহাকে বলিলাম: "দেখুন, একটা কথা বলি, অপরাধ লইবেন না। আমি বিশেষ কিছুই জানি না এবং ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়ও আমার বেশী দিনের নয়, তথাপি আমি বলিব যে আপনি গোড়ায়ই একটু গলদ করিয়া বসিয়াছেন। জগৎটাকে আপনি কখনও ভাল করিতে পারিবেন না, কারণ ইহার প্রকৃতিই দ্বন্দ্বজ। ঠাকুর বলেন ইহা সুখদুঃখে গঠিত গতাগতি, সুতরাং ভাল টানিলেই মন্দও কিছু সঙ্গে সঙ্গে আসিবে, ইহার অন্যথা করিবার শক্তি

কাহারও নাই।” ভদ্রলোক চটিয়া গেলেন এবং একটু রাগত-ভাবেই বলিলেন: “আপনি তো প্রকারান্তরে সেই সাধুবাবার কথাই বলিলেন।” আমি কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখি যে ছোট একটা মাটির খোরা হাতে লইয়া ঠাকুর নিজেই নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। খোরাটি আমার হাতে দিয়া ঠাকুর তক্তাপোশের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। খোরার ভিতরে চারিটি রসগোল্লা ছিল, আমরা দুইজনে তাহা প্রসাদ পাইলাম এবং উঠানের কলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে তক্তাপোশের উপরে তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। ইহার পর যে দৃশ্যের অবতারণা হইল তাহা যেমন আকস্মিক, তেমনই অভাবনীয়। ঠাকুর ঐ ভদ্র-লোকের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, হঠাৎ তিনি ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং এই কান্না কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিল। ভদ্রলোক কি যেন একটা বলিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কথা বাহির হয় না, কেবল কাঁদিতেই থাকেন। এইরূপ প্রায় ১০ মিনিট চলিবার পর ভদ্রলোক ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং কিছুক্ষণ ঠাকুরের পায়ে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিলেন। ঠিক এই সময় মতিবাবু বাজার লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর উঠিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত উপরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু দেখিলাম যে ঐ ভদ্রলোক বাহির হইয়া যাইতেছেন। তাহার আচরণে আমার এমন একটা কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছিল যে এত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল না। আমি

ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া রাস্তায় আসিয়া ভদ্রলোককে ধরিলাম এবং অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে আমার মেসে লইয়া আসিলাম।

জামা কাপড় ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া একটু সুস্থ হইয়া বসিয়াই আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি ঠাকুরের সম্মুখে হঠাৎ এমন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন কেন। তিনি নীরবেই রহিলেন এবং একাধিকবার কথাটা জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও কিছুই বলিতে চাহিলেন না। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা, অত্যন্ত পীড়াপীড়ি সুরু করিয়া দিলাম। অবশেষে তিনি বলিলেন : "কথাটা বলিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না, কিন্তু আপনি যখন কিছুতেই ছাড়িবেন না, তখন না বলিয়াই বা করি কি। মতিবাবুর বাড়ীতে সেই তক্তাপোশের উপর বসিয়া আমার মনে হইল যেন বহুদিনের এক বিস্মৃতির আবরণ ধীরে ধীরে সরিয়া গেল, দেখিলাম যে যিনি সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন তিনি যেন আমার চিরপরিচিত নিতান্ত আপনার জন।" কথা কয়টি বলিয়াই তিনি আবার কাঁদিতে সুরু করিলেন। আমি নীরবেই রহিলাম, কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই শান্ত হইলেন। স্নানাহারের পর প্রায় ঘণ্টা দুই তাহার সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। বুঝিলাম যে তিনি একজন কৃতবিদ্য লোক এবং অনেক বিষয়েই রীতিমত পড়াশুনা করিয়াছেন। স্পষ্ট স্মরণ আছে যে তাহার সহিত লেনিনের নব-গঠিত বোলসেভিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। দেখিলাম যে তিনি মার্ক্সবাদ সম্পর্কে অনেক খবর রাখেন এবং মনে হইল যে এই দুঃখময় মানব-

সমাজকে চেষ্টার দ্বারা শান্তি ও প্রাচুর্য্যের (peace and plenty) এক নূতন স্বর্গে পরিণত করা যায়, মার্ক্সপন্থীদিগের এই জ্বলন্ত বিশ্বাসই তাহাকে মার্ক্সবাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। সে যাহাই হউক, কিছুক্ষণ পরে আমরা দুইজনেই একটু বিশ্রামের চেষ্টা করিলাম। আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, জাগিয়া দেখি যে ভদ্রলোক নাই। একতলায় আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। জীবনে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

শুধু একবার ৪।৫ ঘণ্টার জন্য এই ভদ্রলোকের সঙ্গ পাইয়াছিলাম, তাহার নামটাও জানিয়া রাখি নাই, কিন্তু তথাপি তিনি আমার মনে বরাবরই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি যে অভাবনীয় রকমে ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়াছিলেন তাহা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। আর তাহার সেই 'দুনিয়া ভাল করা' বাতিকের কথা লইয়া অনেক ভাবিয়াছি এবং অনেক আলোচনা করিয়াছি কিন্তু সেদিন তাহাকে যাহা বলিয়াছিলাম আজও আমার সেই মত অটুটই রহিয়াছে। আমার বাড়ীতে আসিয়া কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে সাম্যবাদীরা যদি তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, খাওয়া, পরা, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষ যদি নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তাহা হইলে দুঃখ বহুলাংশে কমিয়া যাইবে একথা আমি স্বীকার করি কিনা। আমি বলিয়াছিলাম যে সুখ দুঃখের রকমফের হইবে ইহা আমি অবশ্যই স্বীকার করি, কিন্তু তাহাদের পরিমাপ অন্য প্রকারের হইবে আমি

তাহা মানি না। আজ ৩৫ বৎসর পরেও আমি আমার এই মত পরিবর্ত্তনের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম যে পুত্রশোক মহা দুঃখ সন্দেহ নাই কিন্তু "ক্ষুধাৎ পরতরং নাস্তি।" ক্ষুধার মতন দুঃখ মানুষের অল্পই আছে, এমন যে প্রবল সন্তান-শোক তাহাকেও ক্ষুধাই প্রথম ছাপাইয়া উঠে। শোক যত মর্ম্মান্তিকই হউক না কেন, দুদিন আগেই হউক বা পরেই হউক, শোক-বিহ্বলা মাতাকেও কিছু না কিছু মুখে দিতেই হয় এবং তখনই হয় শোক প্রশমনের আরম্ভ। সুতরাং ক্ষুন্নিবৃত্তির এবং মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির যদি একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা হইয়া যায়, তাহা হইলে একদিক হইতে মানুষের দুঃখ যে বহুলাংশে লঘু হইয়া যাইবে কোন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই ইহা অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আধিভৌতিক দুঃখই মানুষের একমাত্র দুঃখ নহে। গ্যালিলিও যখন প্রকাশ্য আদালতে তাহার বৈজ্ঞানিক অবদানকে প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার বেশী দুঃখ হইয়াছিল, অথবা বাকী জীবন অর্দ্ধাশনে, বা কখন কখন অনশনে কাটাইলে বেশী দুঃখ হইত, এই প্রশ্নের বিচার করিবার কোন নির্ভরযোগ্য উপায় আছে বলিয়া আমি জানি না। মানব সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই সাম্যবাদের অবলম্বন এবং উহা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলিয়াই পরিচিত। মার্ক্সবাদীদের মতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই তাহার প্রতিবাদও সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হইয়া যাইবে, পরে আসিবে এক নূতন সমাধান, আবার প্রতিবাদ, আবার সমাধান, মনুষ্য-সমাজের বিবর্ত্তন অতীতেও এই ভাবেই হইয়াছে, ভবিষ্যতেও

এই ভাবেই হইবে। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখি যে যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানেই দুঃখ, সুতরাং এই দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকিয়া এবং ইহাকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া দুঃখাবসানের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

ব্যষ্টি এবং সমষ্টির পারস্পরিক অধিকারের সীমা-নির্দ্দেশ মানুষ কখনও করিয়া উঠিতে পারে নাই। ব্যাপারটা একাধারে জটিল এবং সূক্ষ্ম, উভয়ের দাবী-সাম্য বজায় রাখা মোটেই সহজ-সাধ্য নহে। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে মানুষ কখন জোর দিয়াছে ব্যষ্টির উপর, আবার কখন জোর দিয়াছে সমষ্টির উপর, সমস্যাটার একটা সন্তোষজনক সমাধান কোনদিনই হয় নাই। আমার বিশ্বাস যে এই কথাটাকে সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ইতিহাসের আলোচনা করিলে কিছুটা নূতন আলোকসম্পাত হইতে পারে। সে যাহাই হউক, আমার বক্তব্য হইল এই যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এই চিরাগত দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান থাকার জন্যই কোন মতবাদ বা তদানুষঙ্গিক কোন বিপ্লব সর্ব্বাংশে প্রগতিশীল হইতে পারে না। একদিক হইতে দেখিলে যাহা প্রগতি, অন্য-দিক হইতে দেখিলে তাহাই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মতোন্মত্ততা যাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে তাহারা কোন কথাই শুনিতে চাহিবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার পরিচিত একজন অত্যুগ্র প্রগতিবাদী কোন কার্য্যোপলক্ষে আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমস্যাটা তুলিয়া তাহার সহিত আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলাম। এটা একটা সমস্যাই না, এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি ধানাই

পানাই নানা কথা বলিয়া তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কথাটা এড়াইয়া যাইতে চাহিলেন। আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল ; হঠাৎ দেখি যে আমার টেবিলের উপর হইতে তিনি রামায়ণের সারানুবাদখানা তুলিয়া লইয়াছেন। দু'চার পাতা উল্টাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন : "এই রামায়ণের মত এতগুলি অপদার্থ চরিত্রের একত্র সমাবেশ আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। স্বজাতিদ্রোহী, দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ, তাহাকে আপনারা বানাইয়াছেন একটা ধর্ম্মপ্রাণ মহাভক্ত।" এই কথা বলিয়া পরে শম্বুকের শিরশ্ছেদের সেই মামুলী কাহিনীটার উল্লেখ করিয়া রামচরিত্রের নৃশংসতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। এ সকল কথা আগেও অনেকবার ইহার মুখে শুনিয়াছি কিন্তু কখনও বিশেষ কিছু বলি নাই কিন্তু সেদিন আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে বলিলাম : "কমিণ্টার্নের যুগে যে সকল আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী মস্কোতে বসিয়া নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেন, আমি যদি বলি যে তাহারা সকলেই অল্পবিস্তর দেশদ্রোহী ও স্বজাতিদ্রোহী ছিলেন, আপনি তাহা মানিয়া লইবেন কি ?" ভদ্রলোক বলিলেন : "ইহাদের সঙ্গে আপনি বিভীষণের তুলনা করিলেন; ইহারা যাহা করিয়াছেন, দেশ, জাতি ইত্যাদি অপেক্ষা একটা উচ্চতর আদর্শের অনুপ্রেরণায়ই তাহা করিয়াছেন।" আমি বলিলাম : "বিভীষণও তো ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত তো রামায়ণে যথেষ্টই আছে।" তিনি চটিয়া উঠিলেন, একটু রাগতভাবেই বলিলেনঃ "একটা রাজ্যলোলুপ বিশ্বাস-

ঘাতক, তাহার আবার আদর্শ।" এবারে আমিও একটু উষ্মার সহিতই বলিলাম: "যদি তাহাই বলেন, তবে আমিও বলিব যে আদর্শের বালাই আপনাদেরও বড় একটা নাই, লোভ, হিংসা ও ক্ষমতালিপ্সাই আপনাদের চালক-শক্তি।" এবার তিনি আরও চটিয়া গেলেন এবং "আপনাদের সঙ্গে কোন কিছু বলাই বিড়ম্বনা' এই কথা বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিন্তু আমি পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিলাম: "এতটাই যখন শুনিয়াছেন, শম্বুকের কথাটাও শুনিয়া যান। তখন সমাজে যে আদর্শ প্রচলিত ছিল, সেই আদর্শানুযায়ী সমষ্টি-সংহতি রক্ষা করিবার জন্যই শম্বুকের শিরশ্ছেদের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাকে সমষ্টির স্বার্থে ব্যষ্টির উপর নির্যাতন বলা যাইতে পারে। রামের সম্বন্ধে এরূপ দৃষ্টান্ত আর দু' একটির বেশী নাই, অথচ সুযোগ পাইলেই রাম চরিত্রের এই কলঙ্কের কথাটা আমাকে শুনাইয়া যান। কিন্তু আপনাদের পীঠস্থানে সিকি শতাব্দী ধরিয়া যে নৃশংসতা ও বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান চলিয়াছে সেগুলিকে ধনতান্ত্রিক অপপ্রচার বলিয়াই উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন এবং যেটুকু অস্বীকার করিতে পারেন নাই, সমষ্টি-স্বার্থের অজুহাতেই তাহা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এখন তাহারা নিজেরাই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে; কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, সুতরাং আপনারাও নূতন সুরে গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" ইহার পর আর ভদ্রলোককে কিছুতেই ধরিয়া রাখা গেল না।

কি বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম। বলিতেছিলাম যে দ্বন্দ্বের মধ্যে দুঃখাবসানের অনুসন্ধান কখনও ফলপ্রসূ হইবে না।

সুখী হইতে হইলে হয় নির্দ্বন্দ্ব হইতে হইবে, না হয় দ্বন্দ্বাতীতের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইবে। শ্রুতির সহিত সম্পর্কবর্জ্জিত যে স্মৃতি, তাহা কখনই পরিণামে কল্যাণকর হইতে পারে না। ঠাকুরের কথা বলিতে বসিয়া এই সকল যুক্তিতর্কের কচকচি নিতান্তই বিরক্তিকর মনে হইতেছে, কিন্তু এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে কিছু কিছু না বলিয়াও পারিতেছি না। আমি জানি যে আমার এই লেখা অতি অল্প লোকেই পড়িবে; তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বাভাবিক আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাদের হয়তো কিছুটা উপকারে আসিতে পারে, এই ভরসায়ই মাঝে মাঝে কিছু কিছু অবান্তর যুক্তিতর্কের অবতারণা করিব। আমার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার আমি যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছি এবং তাহাদের মতিগতির সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে আমার কথাগুলি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত উড়াইয়া দিতে চাহিবেন, তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই।

৩

আমি যে দিন সেই "দুনিয়া ভাল করা" ভদ্রলোককে আমার বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছিলাম সেই দিন রাত্রেই ঠাকুর ঢাকা চলিয়া যাওয়ায় সে যাত্রায় আর তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। কিছুদিন পরে বড়দিনের ছুটিতে ঢাকা যাইয়া শুনিলাম যে ঠাকুর ইতিমধ্যে সেখানে গিয়াছিলেন, কয়েক দিনের জন্য বিক্রমপুর গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। মনটা উৎফুল্ল

হইয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এক দুশ্চিন্তাও আসিয়া উপস্থিত হইল। মাত্র ১০ দিনের ছুটি, ৩ দিন তো প্রায় পার হইয়া গেল, বাকী কয়টা দিনের মধ্যে ঠাকুর আসিয়া না পড়িলে তো আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না। সে দিন বৈকালেই কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম। ঠাকুরের খোঁজে ৺বীরেন মজুমদার মহাশয়ের ঔয়াইজ ঘাট রোডের দোকানে আসিয়া জানিলাম যে সে দিন প্রাতঃকালেই ঠাকুর আসিয়াছেন এবং বীরেনবাবুর বাড়ীতেই আছেন। শুধু নিয়ম রক্ষার জন্যই বৈকালে আসিয়া তিনি দোকানটি খুলিয়াছেন। প্রফুল্লবাবু ও হরিদাস-বাবুও আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমার মনে হইল যে বীরেনবাবু যেন অত্যন্ত বিষণ্ণ; কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে দুপুর বেলা তাহার ঠাকুরের সঙ্গে এই দোকান সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল এবং সকল কথা শুনিয়া ঠাকুর নাকি দোকানটি বাড়ীতেই লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। সেই জন্যই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন এই দোকানটির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া রহিয়াছে। আমি কি বলিয়াছিলাম স্মরণ নাই কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঠাকুরের কথামত দোকানটি বাড়ীতেই আনিতে হইয়াছিল। দোকানটি ছিল চার দরজার একটি বড় ঘর লইয়া। কয়েক মাস পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকা আসিয়া দেখিলাম যে একটি দরজা গিয়াছে। আরও এক বৎসরের মধ্যে দুইটি দরজা চলিয়া গিয়া একটিতে আসিয়া ঠেকিল। কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিয়া দোকানটি বাড়ীতেই চলিয়া আসিয়াছিল।

সে যাহাই হউক, কিছুক্ষণ পরেই বীরেনবাবু দোকান বন্ধ করিলেন এবং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। আমরা উপরে যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বসিলাম। সাধারণ কুশল প্রশ্নাদি ছাড়া অন্য কোন আলোচনা হইয়াছিল কিনা মনে পড়িতেছে না। প্রফুল্লবাবুর অনুরোধে ঠাকুর পরের দিন প্রাতঃকালে তাহাদের বাড়ীতে, অর্থাৎ আমার শ্বশুরালয়ে, যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং স্থির হইল যে তিনি দুই দিন সেখানেই থাকিবেন। ব্যবস্থাটা বীরেনবাবুর বিশেষ মনঃপূত হইল না বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু ঠাকুর নিজে সম্মতি দেওয়ায় তিনি আর বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না। বীরেনবাবু সহজে ঠাকুরকে তাহার বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে দিতে চাহিতেন না, সুতরাং কথাটার এত সহজে মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পরের দিন ভোর হইতেই অধীর আগ্রহে ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম কিন্তু ঠাকুর আসিলেন না। প্রফুল্লবাবু আমাকে যাচ্ছেতাই করিতে লাগিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে অতি ভোরে আসিয়া ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। এই কথার উপর আমি বলিয়াছিলাম যে প্রফুল্লবাবুর অতি ভোর অর্থ অন্ততঃ বেলা ৯টা। এই শীতের দিনে কখনই তিনি ৭টার পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিতে পারিবেন না, তারপর শৌচ, দাঁতমাজা, মুখ ধোয়া ইত্যাদিতে অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক প্রয়োজন, এক গলা পরিষ্কার করিতেই তাহার প্রায় ২০ মিনিট

লাগে, সুতরাং তাহার পক্ষে ভোরে যাইয়া ঠাকুরকে লইয়া আসার কোন মানেই হয় না। আর ঠাকুর যখন বলিয়াছেন যে তিনি নিজেই যাইতে পারিবেন, কাহারও আসার প্রয়োজন নাই, তখন তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকাই ভাল। এখন ঠাকুর না আসাতে প্রফুল্লবাবু আমার উপর খুব এক হাত লইলেন। একটু থামিয়া পরে আবার গম্ভীরভাবে বলিলেন : "নিশ্চয়ই বীরেন দা'র কারসাজি, একবার দেখিয়া আসিতে হইবে ব্যাপার কি।" এই কথা বলিয়া তিনি জামা কাপড় পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং বেলা প্রায় একটার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে ঠাকুরের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। বীরেন-বাবুর বাসা হইতে ভোরেই তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন কিন্তু সম্ভাব্য সকল স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও প্রফুল্লবাবু কোন কিনারাই করিতে পারেন নাই।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এবং নিতান্ত বিষণ্ণ মনে দিনটা অতিবাহিত করিলাম। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর একাকীই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার শ্বশুর বাড়ীর সদরের একখানা ঘর পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে গিয়া তাঁহাকে বসাইলাম। সংবাদ পাইয়া শ্বশুর মহাশয় (ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ৺মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী) ও তাহার একজন বন্ধু ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শ্বশুর মহাশয় ছিলেন বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য। কে যেন তাহাকে বলিয়াছিল যে ঠাকুর লোকনাথবাবার গুরুভ্রাতা বেণীমাধব

ব্রহ্মচারীর শিষ্য। কথাটা যে সত্য নহে তাহা আমি আমার শ্বশুর মহাশয়কে জানাইয়াছিলাম কিন্তু তথাপি তিনি ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, স্মরণ আছে। বেণীমাধব ব্রহ্মচারী সম্বন্ধেও অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি জীবিত আছেন কিনা এবং থাকিলে কোথায় আছেন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল মনে আছে। কিন্তু সে-দিনকার ঠাকুরের কথায় স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে বেণীমাধব ব্রহ্মচারীবাবা ইহার পরেও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ঢাকার অতি নিকটে প্রসিদ্ধ লাঙ্গলবন্ধ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। বরদাবাবু ও হরিদাস-বাবুর মুখে শুনিয়াছি যে একবার তাঁহারা দুইজন এবং আরও ৩।৪ জনে মিলিয়া ঠাকুরের সমভিব্যাহারে বেণীমাধব ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ছোট্ট একখানা ভাঙ্গা কোঠায় বেণীমাধব বাবা থাকিতেন, ঠাকুর সেই ঘরের নিকটে আসিতেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর ও বেণীমাধব-বাবা উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন কথা-বার্ত্তাই হইল না। মিনিট পাঁচেক পরে ব্রহ্মচারী ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং ঠাকুরও চলিয়া আসিলেন। বরদাবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে বেণীমাধব বাবার চেহারা এত উগ্র মনে হইয়াছিল যে বেশী নিকটে যাইতে তাহাদের সাহস হয় নাই, একটু দূরে থাকিয়াই তাহারা ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বেণীমাধব ব্রহ্মচারী বাবার বয়স প্রায় দুইশত বৎসর হইয়াছিল।

আমি অনেক সময়ে ভাবিয়াছি যে সেদিন শ্বশুর মহাশয়ের প্রশ্নের একটা স্পষ্ট উত্তর ঠাকুরের মুখ দিয়া বাহির হইল না কেন? বেণীমাধব বাবা যে লাঙ্গলবন্ধে আছেন তাহা তো ঠাকুর নিশ্চয়ই জানিতেন। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বেণীমাধব ব্রহ্মচারী লাঙ্গলবন্ধে আছেন, এই কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িলে লোকনাথ বাবার আশ্রিত ভক্তেরা তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। আমার মনে হয় যে ইহা বোধ হয় বেণীমাধব বাবার নিতান্তই অনভিপ্রেত ছিল এবং সেই জন্যই ঠাকুর স্পষ্টতঃ কিছুই বলেন নাই। ক্রমে বেণীমাধব বাবার সংবাদ কতকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং শুনিয়াছি যে তাঁহার ফটোও কেহ কেহ পাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লোকনাথ বাবার ভক্তেরা কেহই এই সংবাদ পান নাই। হরিদাসবাবু ও বরদাবাবুর নিকট এবং পরে ঠাকুরের মুখে এই সংবাদ পাইবার পর আমি বহুবার মনে করিয়াছি যে কথাটা আমার শ্বশুর মহাশয়কে জানাইব কিন্তু কেন জানি না, কথাটা বলিয়া উঠিতে পারি নাই। এই না-বলাটাকে কিন্তু একটা সাধারণ ভুল বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। শ্বশুর মহাশয় এই সংবাদটা পাইলে যে কতটা আনন্দিত হইতেন তাহা আমার অজানা ছিল না। আমিও খবরটা তাহাকে জানাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলাম কিন্তু তথাপি কথাটা তাহাকে বলিতে পারি নাই। এক দিন দুই দিন নয়, প্রায় ৮।১০ বৎসরেও কথাটা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইহার মধ্যে অল্পাধিক পাঁচশত বার আমার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে হরিদাসবাবুও শ্বশুর মহাশয়ের সহিত বিশেষ ভাবেই পরিচিত ছিলেন এবং হামেশাই তাহাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু হরিদাসবাবুরও কখন কথাটা তাহাকে জানাইতে ইচ্ছা হইল না। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা আমার জীবনে অল্পই ঘটিয়াছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বেণীমাধব বাবার অমোঘ ইচ্ছায়ই এই অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল।

যাহাই হউক, সেই রাত্রেই আমার স্ত্রী ও প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী ঠাকুরের নিকট "নাম" পাইয়াছিলেন স্মরণ আছে। ঠাকুর তাহাদিগকে অনেকক্ষণ ধরিয়া "পতিব্রতা ধর্ম্ম" সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা কি বুঝিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু আমার মনে হইতেছিল যে ঠাকুর তাঁহার সেই চিরন্তন অনন্যশরণ বা অনন্যচিন্তার কথাই বলিতেছেন। সাবিত্রীর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বুঝাইতেছিলেন যে সাবিত্রী তাহার অনন্য পতিভক্তি দ্বারা সত্যবানকে যমের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সত্যকে কালের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সত্য দেশ, কাল, কার্য্যকারণ ইত্যাদিতে আবরিত হইয়া আছে, সেই সত্যকে এই আবরণ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে প্রয়োজন অনন্য পতিসেবা। মুখ্যতঃ পতি শব্দে ঠাকুর বুঝাইতেন আশ্রয়, কিন্তু এই পতি শব্দকে গৌণ সাংসারিক অর্থে গ্রহণ করিলেও অনন্য পতিসেবা যে ক্রমে অনন্য ভগবৎসেবায় রূপান্তরিত হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে ঠাকুর বলিতেন যে নিরপেক্ষ ভাবে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ পোষণে যত্নশীল হইলে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আসক্তিই বন্ধনের মূল। অনাসক্ত

ভাবে কর্ম্ম করিয়া গেলে সংসারে থাকিয়াই সব কিছুই পাইতে পারে।

আরও মনে পড়িতেছে যে ঠাকুর সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। এখানেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে অনন্য ও নিরপেক্ষ না হইলে প্রকৃত সেবাধিকারী হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে ঠাকুর একটি গল্প বলিতেন, কথাটা বিশদ করিবার জন্য সেই গল্পটি এখানে বিবৃত করিব। কৃষ্ণভক্ত নারদ বীণা বাজাইয়া অহর্নিশি হরিগুণ গান করিয়া মহানন্দে কাল যাপন করেন, তথাপি তাঁহার একটা ক্ষোভ আর কিছুতেই যাইতে চাহে না। তিনি বরাবরই লক্ষ্য করিয়াছেন যে প্রভুর নিকট ব্রজগোপীদিগের যে আদর, তাহা তিনি কোনদিনই লাভ করিতে পারিলেন না। এমনও কখন কখন তাঁহার মনে হইত যে ইহাতে প্রভুর অবিচার ও পক্ষপাতিত্বই সূচিত হইতেছে। ইহা অতি সাংঘাতিক চিন্তা। এরূপ চিন্তা স্থায়ী হইলে নারদের পতন অবশ্যম্ভাবী, অথচ তিনি একজন প্রকৃত ভক্ত ও সাধক, এই জন্যই নারদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভুল ভাঙ্গাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে নারদ একদিন মথুরায় আসিয়া উপস্থিত। সেখানে আসিয়া শুনিলেন যে কিছুদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ শীরঃপীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইবে না। নারদ কথাটা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, প্রভুর অসুখ, এও কি সম্ভব ? অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তিনি প্রভুর সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে বাস্তবিকই তিনি দুই হাতে মাথা

চাপিয়া ধরিয়া বিছানায় শুইয়া রহিয়াছেন এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। নারদ নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এ তিনি কি দেখিলেন, এ যে স্বপ্নেও অগোচর। নারদ অস্থির হইয়া পড়িলেন। যাহাই হউক, একটু প্রকৃতিস্থ হইতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "এই ব্যাধির কি কোন প্রতিকার নাই?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন: "আছে এবং তাহা অতি সহজ। কোন ভক্ত যদি তাহার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দিতে পারে তাহা হইলেই এই অসুখ সারিয়া যায়।" এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারদের নিকটেই তাঁহার একটু পায়ের ধূলা প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। নারদ ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে আৎকাইয়া উঠিলেন। কি সর্ব্বনাশ, প্রভু বলেন কি, আমি দিব তাঁহাকে পায়ের ধূলা! প্রকাশ্যে বলিলেন: "এ কি বিপরীত আদেশ করিতেছেন প্রভু? আমি আপনার দাসানুদাস, আমার সঙ্গে এরূপ পরিহাস কি আপনার সাজে?" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে নারদ যদি নিজে দিতে না-ই পারেন, তাহা হইলে তিনি অন্য কাহারও নিকট হইতে তাঁহার জন্য একটু চরণধূলা আনিয়া দিন, চরণধূলা ছাড়া এই রোগের উপশম হইবে না, ইহা নিশ্চিত। নারদ বাহির হইলেন, ত্রিভুবনের প্রায় সর্ব্বত্রই ঘুরিলেন কিন্তু চরণধূলা কোথাও মিলিল না। ব্রহ্মা, মহাদেব, দেবতাগণ, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি সকলেরই এক কথা। "এ কি সাংঘাতিক কথা! প্রভুকে পায়ের ধূলা দিলে নরকেও যে আমার স্থান হইবে না। আপনি দেবর্ষি নারদ, ধর্ম্মজ্ঞ, মহাভক্তিমান, এ কি ভয়াবহ প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন," ইত্যাদি, ইত্যাদি, পায়ের ধূলা কেহই

দিল না। নারদ মহা মুশকিলে পড়িলেন, শূন্য হাতে প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইতেও পারেন না, অথচ কি করিয়া যে চরণধূলি সংগ্রহ করিবেন তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না। আন্তরিক বিরাগবশতঃই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এতক্ষণ তাঁহার ব্রজগোপীদিগের কথা স্মরণ হয় নাই, কিন্তু এইবার বিপাকে পড়িয়া হঠাৎ তাঁহাদের কথা মনে হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নারদকে দেখিয়া গোপীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সকলে প্রায় একযোগে শ্রীকৃষ্ণের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদের মুখে তাঁহার অসুখের কথা শুনিয়া গোপীগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং বিষাদ-কাতর বদনে, এই রোগোপশমের উপায় কিছু আছে কিনা, নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ যখন বলিলেন যে একটু পায়ের ধূলা পাইলেই রোগ সারিয়া যায় তখনই তাঁহাদের মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা একযোগে সকলেই নারদের দিকে পা বাড়াইয়া দিলেন। নারদ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন। এ কি আশ্চর্য্য ভগবৎপ্রীতি, ইহা তো বাস্তবিকই আর কোথাও নাই। নারদের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাঁহাব মনেও আর কোন ক্ষোভ রহিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার ও অন্যান্য সকলের ভগবৎপ্রীতি আত্মপ্রীতিরই নামান্তর, স্বকীয় শুভাশুভই তাহার মান। নিজের অনিষ্টাশঙ্কায় প্রভুর নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুটি কেহই দিতে পারিলেন না। কিন্তু ব্রজগোপীদের মনে কোন প্রশ্নই উঠিল না, কারণ তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতি শুধু কৃষ্ণপ্রীতিই, আত্মপ্রীতির গন্ধও সেখানে নাই।

মুখ্যতঃ বলিতে গেলে ইহাই সেবা এবং অনন্যনিষ্ঠাই ইহার ভিত্তি। কিন্তু গৌণ অর্থে সংসার ধর্ম্মেও সেবা কথাটি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং আমার মনে হয় যে গৌণ সেবা অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ মুখ্য সেবায় উঠাই ইহার তাৎপর্য্য। ঠাকুর বলিতেছিলেন যে নিরপেক্ষভাবে পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-পরিজন, আশ্রিতবর্গের সেবায়ও ভগবৎসেবাই হয়। যিনি অকর্ত্তা বা আসক্তিশূন্য, সম্যকরূপে নিরপেক্ষ, শুধু তিনিই হইতে পারেন। কিন্তু সেজন্য বসিয়া থাকিলে চলে না, ধীরে ধীরে এই সংসার ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষতা অভ্যাস করিতে হয়। আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি এই শিক্ষার একটি চমৎকার ক্ষেত্র ছিল। উপার্জ্জনের তারতম্যানুসারে উপভোগের তারতম্যের কথা কেহ মনেও আনিত না, যে যাহাই উপার্জ্জন করুক সকলই আসিয়া একত্রে জমা হইত এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যয় হইত, কাহারও বেলাই কোন ইতর বিশেষ ছিল না। ইহাই ছিল একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ এবং নিরপেক্ষ সেবা অভ্যাস করিবার এমন সুন্দর প্রতিষ্ঠান খুব অল্পই দেখা যায়। বালক বালিকারাও এই উদার পরিবেশে লালিত হওয়ায় অল্পাধিক পরার্থ-পরতায় অতি সহজেই অভ্যস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং অল্পাধিক অন্যান্য কারণে এই প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, ইহাকে আর ফিরাইয়া আনা যাইবে না।

আমাদের নেতারা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে ভারত এখন স্বাধীন হইয়াছে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই এখন সেবা-প্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে, আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিতে না পারিলে শুধু কথায় কোন কাজই হইবে না। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে আমরা অত্যন্ত আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছি। নিজ নিজ ক্ষুদ্র বেষ্টনীর বাহিরে আমাদের সেবা-পরায়ণতা আর অগ্রসর হইতে চাহে না। মনকে চোখ ঠারিবার উপায়ের অবশ্য অভাব নাই, দুই চারিটা সেবা প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু চাঁদা দিয়াই আমরা মনে করি যে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সেবা যে একটা শিক্ষণীয় বস্তু এবং সমগ্র জীবন দিয়াই যে ইহার সাধনা করিতে হয়, এমন কোন ধারণার ধারও আমরা ধারি না। সেবার স্থান অধিকার করিয়াছে বরাতী সেবা এবং সেই জন্যই যে দেশে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে সংবাদ পাইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দলে দলে লোক আসিয়া জুটিত, সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে সৎকার-সমিতির শরণাপন্ন হইতে হয়। পারিবারিক এবং সামাজিক দৈনন্দিন জীবনে এই সেবা ধর্ম্মের সাধনা করিতে হয় এবং তাহা না করিলে বা করিবার সুযোগ না থাকিলে মানুষ আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতে বাধ্য। শুনিতে পাই যে আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের সংজ্ঞাই বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আর রাষ্ট্র শুধু শাসক নহে, প্রধানতঃ ইহা লোক-সেবক ; সুতরাং সেবা যখন প্রধানতঃ রাষ্ট্রেরই কর্ত্তব্য, ব্যক্তিগত সেবাধর্ম্মের এখন একটা নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ লইয়াই রাষ্ট্র, এবং মানুষের মধ্যে যদি সেবাধর্ম্মের দীক্ষা না থাকে, তবে অচিরেই রাষ্ট্র লোক-সেবক না হইয়া লোক-দমন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে বাধ্য।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে প্রকৃত সেবাচারীর দাবী অতি সামান্য, দায়িত্বই বেশী। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা নিজ নিজ দাবী সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিয়াছি এবং দায়িত্ববোধ ঠিক সেই পরিমাণেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃত সেবাচারীর বিশেষ কোন মতলব থাকে না, সেবার প্রেরণায়ই সে সেবা করিয়া যায়। সেবাচারীর লক্ষণগুলি কোথাও বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কিন্তু মুশকিল হইল এই যে তথাপি সকলেই আমাদের সেবা করিতে চায়। একদিকে কংগ্রেস, অপরদিকে সাম্যবাদী, মধ্যখানে কতকগুলি দল এবং উপদল, ইহারা সকলেই সেবাচারী এবং নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে আসর জমাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মজা হইল এই যে ইহাদের মধ্যে কেহ প্রকৃত জনহিতকর কোন কার্য্য করিলে বা করিতে চাহিলে অন্যান্যের চক্ষু টাটাইয়া উঠে, অর্থাৎ সকলেরই ইচ্ছা যে সেবাটা একাই করে, আর কাহাকেও অংশীদার হইতে দিতে চাহে না। সেবাধিকার এখন কংগ্রেসের, অন্যান্যেরা আমাদের ঘাড়ে সেবা চাপাইবার জন্য ওত পাতিয়া আছে, একবার সুযোগ পাইলেই হয়। কথাগুলি বলিতে হইতেছে এইজন্য যে আমাদের নিকট "সেবা" কথাটার একটা বিশেষ মর্য্যাদা আছে এবং ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার কোনমতেই বরদাস্ত করিতে পারি না। সে দিন দেখিলাম যে একটা দোকানের সম্মুখে সাইন বোর্ডের তলার দিকে লেখা রহিয়াছে : "আপনাদের সেবার জন্যই আমাদের এই আয়োজন।" এক এক সময় ভ্রম হয় যে আজকাল "সেবা" বলিয়া যাহা শুনি সেগুলি বোধ হয় বেশীর ভাগই এই জাতীয়।

যাহাই হউক, সে রাত্রে ঠাকুর আমার স্ত্রীকে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহাতে আমি ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে সংসারই সেবাধর্ম্ম শিক্ষার ও সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র এবং ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা নিরপেক্ষ ভাবে ইহা করিতে পারিলে এই সেবাই ভগবৎ সেবায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। ঠাকুর সর্ব্বদাই গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে একটা প্রকৃষ্ট মর্য্যাদা দিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে "বিবাহ করিলে বন্ধন হয় না, আসক্তিই বন্ধনের কারণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সকলেই বিবাহ সংসার পালন করিয়াছেন।" স্ত্রী-পুত্রাদির মধ্যেও ভগবান সম্যকরূপেই বিরাজ করেন, নিরপেক্ষ ভাবে তাহাদের ভরণ পোষণে, তৃপ্তিদানে, তৃপ্তিলাভে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ তিনি অক্লান্ত ভাবে গৃহে গৃহে ঘুরিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন। যখন কাহারও বাড়ীতে আসিতেন তখন সে বাড়ীরই একজন হইয়া যাইতেন। যে কয়দিন থাকিতেন নিতান্ত আপনার জনের মতই থাকিতেন, আবার যখন চলিয়া যাইতেন একবার ফিরিয়াও তাকাইতেন না। তিনি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে বহুবার বলিয়াছেন: "আমি তো আপনাদের এখানে সর্ব্বদাই আছি" এবং তাঁহার আচরণে স্পষ্টই মনে হইয়াছে যে আমার পক্ষে আমার এই গৃহ অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর স্থান যেন আর কোথাও নাই। তীর্থ ভ্রমণে যাওয়া, নানাস্থানে ঘুরিয়া বিগ্রহাদি দর্শন করা, ইত্যাদি বিষয়ে কোন দিন কোন কথাই তিনি আমাকে বলেন নাই। কিন্তু আমি জানি যে কেহ সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন শুনিলে তিনি কখন কখন বলিয়াছেন: "উনি তো

সন্ন্যাসী হ'ন নাই, উনি সুখান্বেষী হইয়াছেন।" এই কথা হইতে কেহ যেন সিদ্ধান্ত করিয়া না বসেন যে ঠাকুর প্রকৃত সন্ন্যাসকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। "সুখান্বেষী" কথাটা তিনি মর্কট বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহার করিতেন। সে যাহাই হউক, তাঁহার যাহা শিক্ষা কার্য্যতঃ গৃহই তাহার কেন্দ্র। কিন্তু একদল লোক এই গৃহকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে ও ক্রমে ক্রমে ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। ইহাও দক্ষযজ্ঞেরই অপর এক অধ্যায় এবং ইহার পরিণতি সম্বন্ধেও আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

কিছুতেই নিশ্চিন্ত মনে ঠাকুরের কথার অনুসরণ করিতে পারিতেছি না, মাঝে মাঝে ফ্যাকড়া বাহির হইয়া আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। যাহাই হউক, সে রাত্রে আর কোনও কথা হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। পরের দিন অনেকেই ঠাকুর দর্শনে আসিলেন, মহানন্দে সকালবেলাটা কাটিয়া গেল, কিন্তু ছোট একটি ঘটনা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই মনে আসিতেছে না। বেলা প্রায় ৯টা, আমি বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছিলাম, এমন সময় সামনের রাস্তা হইতে এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "এখানে নাকি একজন সাধু আছেন?" আমি বলিলাম: "হাঁ আছেন, আপনি আসুন।" এইবার ভদ্রলোকের চেহারার দিকে আমার নজর পড়িল; আবক্ষলম্বিত কাঁচাপাকা দাড়ি, বাবরি চুল, দু'একটা জট পাকাইতে সুরু হইয়াছে, পরিধানে রক্তাম্বর, পায়ে খড়ম, খালি গা, কপালে একটা প্রকাণ্ড লাল রঙ্গের ফোটা,

গলায় দুই তিনটি বড় রুদ্রাক্ষের মালা, উভয় হস্তে বালা ও তাগার আকারে আরও কতকগুলি রুদ্রাক্ষ, বুঝিলাম যে ইনি একজন তান্ত্রিক। ভদ্রলোক আমার নিকটে আসিতে আরও বুঝিলাম যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি "কারণ" সেবা করিয়াছেন। দরজার কাছে আসিয়া ঠাকুরকে দেখিয়াই তাঁহার কিন্তু ভাবান্তর উপস্থিত হইল। হঠাৎ তিনি জিভে এক কামড় দিয়া ফেলিলেন এবং খট্‌খট্‌ করিয়া সিড়ি দিয়া রাস্তায় নামিয়া গেলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইল যে তিনি যেন একটা ঘোরতর বিপদে পড়িতে পড়িতে অতি কষ্টে বাঁচিয়া গিয়াছেন। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝিতে পারি নাই কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম যে ঠাকুরের গলার তুলসীর মালাছড়াই এই বিভ্রাট বাধাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও একজন ভদ্রলোকের কথা মনে হইতেছে, তিনিও ঐ পাড়াতেই থাকিতেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব এবং অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঠাকুর পূজার জন্য পুষ্পচয়ন তাহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। তাহার বাড়ীর অতি নিকটেই ছিল শক্তিব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, সেখানে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং নিত্য সেবাপূজা হইত। এই ভদ্রলোকের ধারণা ছিল যে লোকনাথ ছিলেন অদ্বৈতবাদী, সুতরাং ফুল তুলিতে যাইয়া তিনি ঐ আশ্রমের বাহিরে যাহা পাইতেন শুধু তাহাই লইয়া আসিতেন, কারণ অদ্বৈতবাদী লোকনাথের আশ্রমের ফুল তাহার ঠাকুর সেবায় ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাদের একজন শাক্ত, আর একজন বৈষ্ণব কিন্তু বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় উভয়েই অন্ধ।

দিনটা মহানন্দে কাটিয়া গেল। কিন্তু বৈকালে বীরেন্দ্র মজুমদার রূপী অক্রুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কি সব অজুহাত দেখাইয়া বলিলেন যে ঠাকুরকে তখনই তাহার বাসায় লইয়া যাইবেন। আমরা সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, কারণ কথা ছিল যে ঠাকুর এখানে দুইদিন থাকিবেন। বীরেনবাবু বলিলেন যে কাল আসিয়াছেন, আজ যাইবেন, দুইদিন তো হইলই, এখন না গেলেই চলিবে না। আমি বলিলাম যে শ্বশুর মহাশয় আসুন, তারপর ঠাকুর যাইতে হয় যাইবেন, আমরা বাধা দিব না। কিন্তু বীরেনবাবু কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না, তৎক্ষণাৎ ঠাকুরকে লইয়া রওয়ানা হইতে মনস্থ করিলেন। ঠাকুরকে বলিতেই তিনি ছোট ছেলেটির মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যে শ্বশুর মহাশয় আসিয়া পড়ায় বীরেনবাবুকে বাধ্য হইয়াই একটু অপেক্ষা করিতে হইল। তারপর আরম্ভ হইল দুইজনে বাদানুবাদ। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন যে দুইদিন থাকিবার কথা সুতরাং কাল বৈকালে ঠাকুর যাইবেন, ইহার পূর্ব্বে যাইবার কথা উঠিতেই পারে না, আর বীরেনবাবু বলিতেছিলেন যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তখনই ঠাকুরের না গেলেই চলিবে না। আমি কিন্তু লক্ষ্য করিতেছিলাম ঠাকুরকে, হরিদাসবাবুই তাঁহার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি থাকিবেন কি যাইবেন ইহা লইয়াই তর্ক, কিন্তু তিনি এমন ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন যেন এই ব্যাপারের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই। শেষ পর্য্যন্ত বীরেনবাবুই জয়ী হইলেন এবং আমাদের সকলের প্রাণে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়া ঠাকুরকে লইয়া চলিয়া গেলেন। সে

য়াত্রায় আরও ৩।৪ বার ঠাকুরের সঙ্গ পাইয়াছিলাম, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই মনে পড়িতেছে না।

চতুর্থ অধ্যায়

১

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা যেন গোটা দেশটাকেই ভাসাইয়া দিতে চাহিতেছে। নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর মতই গৃহীত হইয়াছে এবং যদিও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বে গান্ধীজীর বিরোধিতা করিয়াছিলেন, এখন তিনিই এই আন্দোলনের প্রাদেশিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া, পুলিশের লাঠি ও বেটনকে অগ্রাহ্য করিয়া রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বাহির হইল। মাদক দোকানের সম্মুখে পিকেটিং চলিতে লাগিল; একদল গ্রেপ্তার হইতে না হইতেই অন্য দল আসিয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্যভার হাতে লয়, পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া চলে, ইহার যেন আর শেষ নাই। ছেলেরা দলে দলে স্কুল, কলেজ খালি করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, মনে হইল যেন জাতির জীবনে এক মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। একজনের পর একজন নেতা গ্রেপ্তার হইতে লাগিলেন, পাইকারী গ্রেপ্তারের তো কথাই নাই, শীঘ্রই দেখা গেল যে জেলে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। দলে দলে লোক চাকুরী ছাড়িল, ওকালতি ছাড়িল, ডাক্তারি

ছাড়িল, ব্যারিষ্টারী ছাড়িল, নির্বিবচারে এই আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িল। এমন উন্মাদনা জীবনে আর বোধ হয় দেখি নাই।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিয়া "ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট" হলে "শিক্ষার-মিলন" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। স্যার আশুতোষ সেনেট হলে ছাত্রদের সমবেত করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তাহাদের সম্মুখে এক বক্তৃতা করিলেন। কিছুটা কাজ যে না হইল তাহা নহে কিন্তু তাহাতে কর্ণধারগণের দুশ্চিন্তা দূর হইল না। বাহিরের অবস্থা যখন এই প্রকার সেই সময়ে আমার মনের মধ্যেও এক বিষম বিপ্লব চলিতেছিল। এই আন্দোলনে যোগ দিব কি দিব না, এই চিন্তাই অহর্নিশি করিতেছিলাম। রাত্রে ঘুম হইত না, আহারেও রুচি ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের সহিত নানা দিক হইতে কথাটার আলোচনাও করিতাম কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। কথাটা স্যার আশুতোষের কানেও উঠিয়াছিল এবং তিনি আমাকে ডাকাইয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। আমার মনের যখন এই দোদুল্যমান অবস্থা, কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, এমন সময় একদিন বৈকালে বরদা-বাবু আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবন হইতে ঠাকুর তাহাকে একখানা চিঠি লিখিয়াছেন এবং তিনি ঐ চিঠিখানা আমাকে দেখাইতে লইয়া আসিয়াছেন। আমার সম্বন্ধে ঠাকুর লিখিয়াছেন: "ইন্দুবাবুর মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে, তাহাকে একটু স্থির হইতে বলিবেন।" ঠাকুরের অপার করুণায় আমার

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল, অনেক দিন পরে সে রাত্রিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিলাম।

জীবনে এই ব্যাপারটা লইয়া অনেক চিন্তাই করিয়াছি এবং নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে ঠাকুর আমাকে এক মহাবিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছি যে সার্থক কংগ্রেসকর্ম্মী হইতে হইলে যে সকল দোষগুণ অত্যাবশ্যক আমার মধ্যে তাহার অধিকাংশই নাই। সুতরাং হঠকারিতা করিয়া একটা কিছু করিয়া বসিলে আমার একূল ওকূল দু'কূলই যাইত। তখনও ঠাকুরের সহিত আমার পরিচয় বেশী দিনের নয়, সুতরাং বৃন্দাবনে থাকিয়া যে তিনি আমার মনের চাঞ্চল্য টের পাইয়াছিলেন ইহাতে কম বিস্মিত হই নাই। কিন্তু ক্রমে বুঝিয়াছি যে তিনি সবই জানিতে পারেন, মনের নিভৃততম চিন্তাও তাঁহার অগোচর থাকে না। একদিন তিনি জনৈক ভদ্রলোককে শাসনের ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন : "আকাশ সর্ব্বত্রই আছে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা, ফাঁকি দিবার জো নাই ; পুণ্ডরীক চক্ষে সবই প্রকাশ থাকে।" ইহার প্রমাণ আমি জীবন ভরিয়াই পাইয়াছি, কিন্তু কথাগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত, সুতরাং এখানে কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

২

একদিন কলেজে প্রভাতবাবু আমাকে বলিলেন যে অনেক দিন ঠাকুরের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, একবার মতিবাবুর দোকানে খোঁজ লওয়া প্রয়োজন। ইহাতে আমার অন্যমত

হওয়ার কোন কারণ ছিল না, সুতরাং সেইদিনই ক্লাসের পর নিকটেই এক দোকানে জলযোগ সারিয়া লইয়া মতিবাবুর "সত্যনারায়ণ ভাণ্ডারে" যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া দেখি যে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক হাতে চায়ের পেয়ালা এবং সম্মুখে একখানি পিতলের রেকাবে এক বাণ্ডিল বিড়ি, একটি ম্যাচবাক্স এবং গুটিকয়েক পান লইয়া বেশ জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন। মতিবাবু পরিচয় করাইয়া দিলে জানিলাম যে তিনি এ, বি, রেলওয়েতে চাকুরী করিতেন। বর্ত্তমানে সেখানে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হওয়ায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। কয়েকদিন যাবৎ বৈকালে নিয়মিত মতিবাবুর দোকানে আসেন এবং ঠাকুর আসিলেন কিনা সন্ধান লইয়া যান। মতিবাবুর কথার ভাবে বুঝিলাম যে তিনি ইহাকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ইহাকে একজন গুরুগতপ্রাণ ভক্ত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রেলবাবু (তাহাকে আমি এই নামেই উল্লেখ করিব) নীরবে চা' পান সমাধা করিলেন এবং উপর্য্যুপরি তিনটি বিড়ি ধ্বংস করিয়া আমাদের দিকে তাকাইলেন। দেখিলাম যে তাহার চোখে কেমন যেন একটা ঢুলুঢুলু ভাব। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাটা, গোঁফদাড়ি কামান, বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে ইনি ঠাকুরেরই আশ্রিত এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রভাতবাবু রেলবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন : "আপনি তো নিশ্চয়ই ঠাকুরকে অনেকদিন দেখিতেছেন, তাঁহার কথা কিছু বলুন, আমরা শুনি।" রেলবাবু চোখ বুজিলেন, খানিকক্ষণ পরে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে প্রভাতবাবুর দিকে

তাকাইলেন এবং ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। প্রায় ৩।৪ মিনিট এই ভাবেই কাটিয়া গেল, পরে রেলবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন: "ঠাকুরের কথা কি কিছু বলা যায় রে ভাই, জানিই বা কি, আর কিই বা বুঝিয়াছি।" এই কথা কয়টি বলিয়াই আবার চক্ষু বুজিলেন। এই অবসরে মতিবাবু আমাদিগকে জানাইলেন যে রেলবাবু খ্যাতনামা অপর একজন মহাপুরুষের শিষ্য, কিন্তু ঠাকুরকেও প্রাণ ভরিয়া শ্রদ্ধা করেন এবং অনেক দিন ধরিয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছেন। কিন্তু বড় চাপা, সহজে কিছুই বলিতে চাহেন না। এই কথা শুনিয়া আমরা রেলবাবুকে চাপিয়া ধরিলাম যে তাহাকে একটু ঠাকুর প্রসঙ্গ করিতেই হইবে। রেলবাবুও যে নিতান্ত অনিচ্ছুক তাহা মনে হইল না, কিন্তু একটা বাধা পড়িয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, দোকানের জনৈক কর্ম্মচারী ধূপ, দীপ জ্বালাইয়া আনিল। মতিবাবুর দোকানে কাঁচে ঢাকা একটি সুন্দর আসনের উপর লক্ষ্মীনারায়ণের একটি যুগল মূর্ত্তি ছিল। মূর্ত্তিটি মাটির কিন্তু অত্যন্ত মনোরম। দোকানে ধূপ বাতি দেওয়ার সময় সেই যুগল মূর্ত্তির একটু আরতি করা হইত। এই আরতি আরম্ভ হওয়ায় আমাদের কথা চাপা পড়িয়া গেল। রেলবাবু সোজা হইয়া আসন করিয়া বসিলেন এবং স্থির নেত্রে যুগল মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরেই তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং শীরদাঁড়া কাঁপিতে লাগিল। আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি যে সব সাত্ত্বিক লক্ষণের কথা শুনিয়াছি ইহাও কি তাহাই? আমার

কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল। শীঘ্রই আরতি থামিয়া গেল, আমরাও একটু পরেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সে দিন আর রেলবাবুর সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না।

কিন্তু আমাদের কি রকম একটা কৌতূহল হইয়াছিল, পরের দিনও আমি ও প্রভাতবাবু যথাসময়ে মতিবাবুর দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। রেলবাবু সেখানেই ছিলেন এবং বরদাবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। একটু মনোযোগ দিতেই বুঝিলাম যে তিনি তাহার কলিকাতা আসিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বরদাবাবুকে অবহিত করিতেছেন। রেলবাবু বলিতেছিলেন যে তাহার একটি ছোট ভাই আছে, সে কলিকাতাতেই থাকে। এমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ছোট একখানি কয়লার দোকান খুলিয়াছে। এই ভাইটিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন এবং তাহাকে কোনও মহাপুরুষের পদাশ্রিত করিতে না পারায় তিনি অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাইতেছেন। তাহার নিজের গুরুদেব শ্রীদেহে থাকিলে কোনই চিন্তা ছিল না, ভাইকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া গুরুদেবের পায়ে ফেলিয়া দিতেন। কিন্তু তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই রেলবাবু ঠাকুরের খোঁজে কলিকাতায় আসিয়াছেন। ধর্ম্মঘটের দরুণ এখন তাহার অখণ্ড অবসর, ছোট ভাই কলিকাতাতেই আছে, ঠাকুরও প্রায়ই ঘুরিয়া ফিরিয়া এখানে আসেন, যদি একটা যোগাযোগ হইয়া যায় এই আশাতেই তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। প্রভাতবাবু একবার ধর্ম্মঘটের অবস্থা ও তাহার চাকুরীর ভবিষ্যতের কথা তুলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি দক্ষিণ হস্তের মধ্যের তিনটি অঙ্গুলী দুইবার কপালে

ঠেকাইয়া এমন সরাসরি ভাবে কথাটার জবাব দিয়াছিলেন যে সে প্রসঙ্গটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে রেলবাবু তাহার ধর্ম্মজীবনের অনেক কথাই আমাদিগকে বলিলেন। ঠাকুরের কথাও নানাভাবেই উঠিত এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কি করিয়া রেলবাবুর গুরুনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রাণতা দৃঢ়তর হইয়াছে, তাহাও তিনি আমাদিগকে বিশদভাবে জানাইলেন। আমি তখন নূতন ঠাকুরের সঙ্গ পাইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, সুতরাং রেলবাবুর কথাগুলি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। তিনি ভুলেও কোন বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনা করিতেন না। ধর্ম্মঘটের ফলাফল কিরূপ হইবে, তাহার চাকুরী থাকিবে কিনা, না থাকিলে পোষ্যবর্গের কি উপায় হইবে, ছোট ভ্রাতার দোকান কেমন চলিতেছে, এই সকল প্রশ্নের ধার দিয়াও তিনি যাইতেন না, অথচ প্রতিদিন তাহার ছোট ভাই ঠাকুরের কৃপালাভে সমর্থ হইবে কিনা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই আলোচনা করিতেন। কথাবার্ত্তা যাহা বলিতেন তাহাও বেশ যুক্তিপূর্ণ ও শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মনে হইত। তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা উচ্চ ধারণা গড়িয়া উঠিতেছিল কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তাহার ঐ অশ্রু ও কম্পন আমরা সরলভাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম না, একটা সন্দেহ থাকিয়াই যাইত।

বৈকালে মতিবাবুর দোকানে যাইয়া রেলবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা আমাদের একটা প্রাত্যহিক কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। একদিন সেখানে যাইয়া শুনিলাম যে ঠাকুরের চিঠি আসিয়াছে, ৩।৪ দিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতা আসিবেন। কথাটা শুনিয়াই

ভাবিলাম যে বোধ হয় এতদিনে রেলবাবুর কার্য্যসিদ্ধি হইতে চলিল। তিনি সেখানেই উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া যেন একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। খবরটা শুনিয়া তাহার উৎফুল্ল হইবারই কথা কিন্তু উৎফুল্ল হওয়া দূরে থাকুক মনে হইল যে তিনি যেন একটু বিষণ্ণই হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মতিবাবুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু বলিলেন: "হরিষে-বিষাদ রে ভাই, হরিষে-বিষাদ; ঠাকুর সেই আসা আসিলেন কিন্তু আমাকে কালই কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে।" কথাটা একটু খুলিয়া বলিবার জন্য আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম কিন্তু তিনি সহজে আর কিছুই বলিতে চাহিলেন না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর যাহা বলিলেন তাহাতেও কথাটা মোটেই পরিষ্কার হইল না। তিনি বলিলেন যে গতকল্য তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে তাহার ভ্রাতৃবধূ কিছুদিন পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জে তাহার পিত্রালয়ে ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়াছেন। কি করিয়া কি হইল এই খবরটা বিশদভাবে জানিয়া না লইয়া তিনি ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন না। কিন্তু ইহাতেও প্রকৃত কথাটা যে কি, কিছুই বোঝা গেল না। রেলবাবু ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলিলেন না এবং আমাদের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পরের দিনই ঢাকা মেলে নারায়ণগঞ্জ রওয়ানা হইয়া গেলেন। রহস্যটা রহস্যই রহিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ঠাকুর আসিয়া পৌঁছিলেন এবং মতিবাবুর বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। আর কে কে

সেখানে ছিল ঠিক স্মরণ নাই। আমি আসিতেই মতিবাবু ঠাকুরের নিকট রেলবাবুর কথাটা পাড়িলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরবেই রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন : "সকল বিষয়েরই একটা নিয়ম আছে। আম গাছে যখন বোল হয়, সেই বোল চিবাইলে আম্রত্ব একটু আধটু বুঝিতে পারা গেলেও আমের স্বাদ তাহাতে পাওয়া যায় না। পরে যখন গুটি বাঁধিয়া ছোট্ট আমটি বাহির হয় তখন তাহার স্বাদ হয় কষা। আম যেমন বড় হইতে থাকে তাহার স্বাদও ক্রমে অম্ল, অম্ল-মধুর এবং পরিণামে মধুর হইয়া দাঁড়ায়। ধৈর্য্য ধরিয়া স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে আম নিজেই পাকিয়া মধুর হয়, কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যের অভাব, কষা আমেই পাকা আমের স্বাদ পাইবার আশায় খানিক গুড় মাখিয়া লয়, ফল দাঁড়ায় এই যে যে-আমটি কালে পাকিয়া হয়তো মধুর হইতে পারিত তাহার আম্রত্বই নষ্ট হইয়া যায়।" একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন : "ইহারই নাম পাটোয়ারী, এই পাটোয়ারীর মার্জ্জনা নাই।" বুঝিলাম যে রেলবাবুটি একটি ইঁচড়ে পাকা ভণ্ড কিন্তু এই কয়দিনের নিয়মিত সাহচর্য্যে রেলবাবুর উপর কেমন যেন একটু মায়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই জন্যই বোধ হয় তাহার হইয়া ঠাকুরের নিকট একটু ওকালতি করিয়াছিলাম। ঠাকুরকে বলিয়াছিলাম : "আপনি যা-ই বলুন রেলবাবু কথাগুলি কিন্তু ভালই বলিতেন, বেশ যুক্তিযুক্ত ও তথ্যপূর্ণ।" উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন : "সব বই-পড়া কথা, কোন মূল্য নাই।" ইহার কিছুদিন পরে এক ভদ্রলোকের নিকট রেলবাবু সম্বন্ধে আরও একটা কথা শুনিয়াছিলাম।

তিনি একবার ঢাকাতে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি নাকি রেলবাবুকে বলিয়াছিলেন: "আপনে এইখেনে!" দুইটি মাত্র কথা কিন্তু ইহাতেই রেলবাবু এতটা বিচলিত হইয়া পড়েন যে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুরের সামান্য দুটা একটা কথা, এমন কি শুধু একটা চাহনির মধ্যে যে কি কঠোর বজ্র লুক্কায়িত থাকিতে পারে তাহার অনেক উদাহরণ আমার জানা আছে, সুতরাং রেলবাবুর এই আচরণে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম শুধু এই ভাবিয়া যে কিসের ভরসায় তিনি ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মনে হয় যেন গোড়া হইতেই তিনি মতলব আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন যে ঠাকুর আসিবার দুই একদিন পূর্ব্বে কোন একটা অজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়িবেন।

রেলবাবুর কথাটা বোধ হয় একটু অতিমাত্রায় দীর্ঘ হইয়া গেল। কেহ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারটার সহিত একটা গুরুতর বিষয় জড়িত আছে, সেই জন্যই রেলবাবুর কথাটা ভূমিকা হিসাবে একটু বিশদ করিয়া বলিতে হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রেলবাবু যে আচরণ করিয়া গেলেন ঠাকুর তাহার আখ্যা দিলেন "পাটোয়ারী" এবং এই পাটোয়ারীর কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ভয়াবহ ও উৎকট পরিণতি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে এখানে কথাটার একটা বিস্তৃত আলোচনা সঙ্গত মনে হইতেছে। এক কথায় পাটোয়ারী মানে ভণ্ডামি, নিজের মনের প্রকৃত ভাব গোপন রাখিয়া

কৃত্রিম আচরণ। এই প্যাটোয়ারী নানা সূত্রে আরম্ভ হইতে পারে। গুরোপদিষ্ট কর্ম্ম প্রথম দিকে একটু নীরস বলিয়া মনে হয় এবং কৃত্রিম উপায়ে এই নীরসতার মধ্যে একটু সরসতা আনিবার চেষ্টা হইতে পাটোয়ারী সুরু হইতে পারে। নানা উপায়ে একটা "আল্‌গা রসের" সৃজন করিয়া তাহাতেই মত্ত হইয়া থাকিতে চায়। ঠাকুর ইহাকেই "কষা আমে গুড় মাখা" বলিতেন। আমি এক ভদ্রলোককে জানিতাম যিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তারকব্রহ্ম নাম করিতে করিতে ঘাটে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিতেন, কীর্ত্তনাদিতে সহজেই মাতিয়া উঠিতেন, নিয়মিত ভাগবত পাঠে যাইতেন, কিন্তু গুরোপদিষ্ট কর্ম্ম করিতে হইলেই তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত। বহুদিন যাবৎ আল্‌গা রসের সাধনা করিতে করিতে তাহার এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে ইষ্টকর্ম্মের কথা তাহার আর মনেও আসিত না। তিনি ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন, শুধু ঠাকুর কেন, অনেকের নিকটেই তিনি যাইতেন, অনেকের উপদেশই তিনি শুনিতেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কা'রো কথাই শুনিতেন না। কৃত্রিম রসচর্চ্চা তাহার এত মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে অনেক সময়ে তাহার মাত্রাজ্ঞান পর্য্যন্ত থাকিত না। তিনি যেখানে ভাগবত শুনিতে যাইতেন সেখানে এক ভদ্রমহিলাও আসিতেন। কোনও পারিবারিক কারণে ভদ্রমহিলাটি কিছুদিন নিয়মিত আসিতে পারেন নাই, মাঝে মাঝে অনুপস্থিত হইতেন। এইরূপ এক অনুপস্থিতির পর তিনি একদিন পাঠ শুনিতে আসিয়াছেন, হঠাৎ সেই পূর্ব্বোল্লিখিত ভদ্রলোক তাহার সম্মুখে আসিলেন এবং হাত নাড়িয়া সুর করিয়া তাহাকে

বলিলেন : "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।" একটা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল, লজ্জায় ও অপমানে ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শেষ পর্য্যন্ত ভদ্রলোক নিতান্ত বৃদ্ধ বলিয়াই ব্যাপারটা কোন প্রকারে মিটিয়া গেল। ইনি ভদ্রবংশের সন্তান, চাকুরীও নেহাৎ মন্দ করেন নাই, ভদ্রসমাজেই ইহার গতিবিধি, অথচ একটা অসঙ্গত ও অভদ্র আচরণ অনায়াসেই করিয়া ফেলিলেন। ইহারও মূলে সেই কৃত্রিম রসচর্চ্চা। ভদ্রলোক যদি জীবনে ধর্ম্মের ধার দিয়াও না যাইতেন, তাহা হইলে তাহার এতটা বিকৃতি নিশ্চয়ই হইত না।

পাটোয়ারী এই ভদ্রলোকের একেবারে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে কৃত্রিমতা করিতেছেন ইহা বুঝিবার সামর্থ্যও তাহার ছিল না। আমি ইহাকে কখনই রেহাই দিতাম না, নানা-ভাবে আঘাত করিয়া ইহার একটু চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতাম কিন্তু ফল কিছুই হইত না। একবার ঠাকুরের আশ্রিত এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল, আমি সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে এই পাটোয়ার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিবামাত্রই গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : "কি আনন্দ, কি আনন্দ, টাকায় কি এ আনন্দ হয় ?" আমি তাহাকে বলিলাম : "টাকা ছাড়া আপনি এখানে কি দেখলেন ? রাসবিহারী এভেনিউর উপর তেতলায় দক্ষিণ-খোলা একটি প্রশস্ত হলঘর, মানে টাকা ; সুপ্রসিদ্ধ একটি দলের কীর্ত্তন, মানে টাকা ; চর্ব্ব্যচোষ্য রকমারি প্রসাদের ব্যবস্থা, মানে টাকা, টাকাই তো সব।" তিনি আমার কথায় কর্ণপাত

করিলেন না, কীর্ত্তনের আসরে গিয়া বসিলেন এবং "আহা, উহু" ইত্যাদি শব্দ করিয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন। জীবনে এই প্রকৃতির আরও অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে কিন্তু তাহাদের কথা বলিতে গেলে অনেকটা পুনরুক্তিই হইবে, সুতরাং ভিন্ন প্রকারের এবং অপেক্ষাকৃত লঘুতর আর দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মহাশয়ের (সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও কংগ্রেসকর্ম্মী, ঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক) গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে তিন-দিনব্যাপী এক মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল, ঠাকুরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বহুদূর হইতে এক কীর্ত্তনের দল আমদানী করা হইয়াছিল। বেশ স্মরণ আছে যে কখন ঠাকুরের নিকট বসিয়া, কখন কীর্ত্তন শুনিয়া, কখন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া এবং নানাবিধ উপাদেয় উপকরণে আকণ্ঠ প্রসাদ পাইয়া দিনগুলি মহানন্দে কাটাইয়াছিলাম। উৎসবের প্রথম দিন দ্বিপ্রহরে আমি ও প্রভাতবাবু কীর্ত্তনের আসরে একপার্শ্বে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ প্রভাতবাবু দুইটি ভদ্রলোকের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইহারা দুইজনেই ঠাকুরের আশ্রিত এবং কীর্ত্তনে ইহাদের একটা প্রবল অনুরক্তি ও উৎসাহ বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। দেখিলাম যে দুইজনে গলা জড়াইয়া ধরিয়া অঝোরে কাঁদিতেছেন, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। মনে হইল যে কীর্ত্তনানন্দে ইঁহারা এমন মাতিয়াছেন যে ইহাদের বাহ্য-জ্ঞান যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, নীচে একজন কর্ম্মকর্ত্তার নিকট সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলাম যে দেড়টা

নাগাদ প্রসাদ পাওয়া যাইবে, সুতরাং মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখিতেছিলাম। বেলা যখন প্রায় কাঁটায় কাঁটায় একটা তখন দেখিলাম যে উহাদের একজন বুক পকেট হইতে একটি ঘড়ি বাহির করিলেন এবং আস্তে আস্তে তাহাতে দম দিতে লাগিলেন। কান্না কিন্তু সমানভাবেই চলিতে লাগিল, কোন ব্যতিক্রমই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে প্রসাদ পাইবার ডাক পড়িল, আমরাও উঠিলাম, ঐ আশ্রিত দুইটিও উঠিলেন। যিনি ঘড়িতে দম দিতেছিলেন তাহার নিকটে যাইয়া প্রভাতবাবু বলিলেন: 'ক'টা বাজল দেখ ত?' তিনি ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন: "একটা চল্লিশ মিনিট।" তাহাতে প্রভাতবাবু বলিলেন: "না আমার মনে হয় যেন তোমার ঘড়িটা শ্লো, আজ দম দিয়াছ তো?" ভদ্রলোক উত্তর করিলেন যে তিনি নিয়মিত একটার সময় ঘড়িতে দম দিয়া থাকেন এবং আজও ঠিক সময়েই দম দিয়াছেন। আর যায় কোথায়? ইহার পর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল তাহা না বলিলেও চলে, ভদ্রলোক একেবারে নাজেহাল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহাতে ঐ ভদ্রলোকের উপকারই হইয়াছিল, পরে দেখিয়াছি যে তিনি অনেকটা সাবধান হইয়া গিয়াছেন। নীচে নামিবার সময় দেখিলাম যে বারান্দার এক কোণে একটি পেয়ালায় করিয়া মূল কীর্ত্তনিয়া মহাশয় গরম দুগ্ধ পান করিতেছেন। প্রভাতবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "নিজে তো বেশ দুধ খা'চ্ছেন, দলের আর সকলে কি দোষ করল?" উত্তর হইল: "কীর্ত্তনের পরে আমি কি খাই না খাই তাকি আর আমার খেয়াল থাকে।" বাস্, আরম্ভ হইল আর এক দফা, প্রভাতবাবু সেই কীর্ত্তনিয়াকে একেবারে কাঁদাইয়া

ছাড়িলেন। প্রসাদ পাইতে আমাদের আধ ঘণ্টার উপর বিলম্ব হইয়া গেল। সর্ব্বশেষ যে ঘটনাটির উল্লেখ করিব এইগুলির তুলনায় তাহা অনেকটা অকিঞ্চিৎকর কিন্তু পাটোয়ারীর প্রারম্ভ হিসাবে এইটিরও মূল্য আছে। যাদবপুর কৈবল্যধামে প্রতি বৎসর ১৩ই ফাল্গুন তারিখে প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেবার সকাল বেলা এই উৎসব উপলক্ষে আমি আশ্রমে গিয়াছিলাম। কীর্ত্তন চলিতেছিল, দেখিলাম যে আসরের এক ধারে বিভাসবাবু (৺বিভাস চন্দ্র দে, ইনি কন্ট্রাকটারী করিতেন, সম্প্রতি গত হইয়াছেন) বসিয়া রহিয়াছেন, আমিও যাইয়া তাহার একপাশে উপবেশন করিলাম। একটি যুবক কীর্ত্তনের তালে তালে নাচিতেছিল, তাহার গায়ে একটি নূতন গরম কোট ছিল। একটু পরে দেখা গেল যে সে কোটটি খুলিয়া অপর একজন ভদ্রলোকের নিকট রাখিয়া দিল। বিভাসবাবু জনান্তিকে আমাকে বলিলেন: "এইবার এই লোকটা আছাড় খাবে।" ঠিক তাহাই হইল, কিছুক্ষণ পরেই লোকটা ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল এবং মাটিতে গড়াগড়ি সুরু করিল। সহজেই বোঝা গেল যে শুধু নূতন কোটটির মায়াতেই সে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমার এই লোকটিকে দু' চারিটি কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ইহার "দশা" আর কিছুতেই ভাঙ্গিতে চাহিল না। আমার কলেজ ছিল, সুতরাং শীঘ্রই চলিয়া আসিতে হইল। এই লোকটির সহিত আমার আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই এবং ইহার পরিণতি কি হইয়াছে তাহাও আমি জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে গোড়ার দিকে কেহ তাহাকে সমঝাইয়া

দিয়া থাকিলে সে হয়তো আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, পাটোয়ারীর উদ্ভব হয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হইতে। প্রথম প্রথম হয়তো অনেকটা তামাসার ছলেই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়। বন্ধুবান্ধবদের কাছে একটু বাহাদুরী নেওয়া, তাহাদের একটু চমক লাগাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি বালক-সুলভ বুদ্ধি হইতে ইহা সুরু হয়। সত্যের মধ্যে কিছু কিছু মিথ্যার প্রক্ষেপ পড়িতে থাকে। সময়ে সাবধান হইয়া গেলে ইহাতে বিশেষ কোনও অনিষ্ট হয় না কিন্তু একবার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেলে মহা অনর্থের সূত্রপাত হয়। প্রতিষ্ঠার নেশা এক মারাত্মক নেশা, এই নেশায় একবার পাইয়া বসিলে মানুষের ক্রমে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু যেখানে প্রতিষ্ঠা-কামনা গৌণ এবং মুখ্য উদ্দেশ্য বিষয় লিপ্সার চরিতার্থতা, সেই সকল ক্ষেত্রে আরও ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই, কিন্তু ধর্ম্মজীবনে ইহার ফল যে কি সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় এবং দেশের দশের কি মহা অনিষ্টের কারণ হয়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না। মহাজনেরা বলিয়াছেন : "প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা", কিন্তু ইহার প্রভাব এড়াইয়া যাওয়া সহজ নহে। গোড়া হইতেই অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চলিতে হয়। একবার হাল ছাড়িয়া দিলে জটের পর জট এমন ভাবে পাকাইতে থাকে যে শেষে নিজের আর বিশেষ কিছু করিবার থাকে না, স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে হয়। আর কথা না বাড়াইয়া এখানে এক ভদ্রমহিলার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া

বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে গোড়ায় একটু খ্যাতির প্রলোভন ক্রমে পাটোয়ারীতে পরিণত হইয়া কিরূপ উৎকট অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে।

তখনও আমি সেই বিডন ষ্ট্রীটের মেসেই আছি। এখন আর ইহাকে মেস না বলিলেও চলে, আমি আর আমার তিনজন আত্মীয় বামুন চাকর লইয়া সেখানে থাকিতাম। একদিন এক ভদ্রলোক আসিয়া সংবাদ দিয়া গেলেন যে পরের দিন প্রাতঃকালে ঠাকুর আমার এখানে আসিবেন। উকীলবাবু সেখানে না থাকাতে অত্যন্ত আরাম বোধ করিলাম, কিন্তু তখন বুঝি নাই যে নূতন যিনি জুটিয়াছেন তিনি কত বেশী মারাত্মক! আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের ঐ বাসাতেই ছিলেন। এরূপ একটি অদ্ভুত স্ত্রীলোক জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি সধবা কিন্তু স্বামীর ধার বড় একটা ধারিতেন না, নিঃসন্তান হওয়ায় অনেকটা ঝাড়া হাত-পা ছিলেন, কোন একটা সুযোগ পাইলেই এখানে সেখানে যাইয়া দু'চার মাস কাটাইয়া আসিতেন। তাহার বয়স তখন পঞ্চাশের উপরে, সেইজন্যই কেহ বিশেষ কিছু মনে করিত না। ধর্ম্মের নামে তিনি সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা উড়াইয়া দিতে চাহিতেন। স্বামী, সংসার, আত্মীয় পরিজন, সকলই মায়ামরীচিকা মাত্র, সেই জন্যই তিনি তাহাদের সংস্পর্শ এড়াইতে চাহিতেছেন, ইহাই ছিল তাহার এই বিসদৃশ আচরণের কৈফিয়ৎ। সকলে জানিত যে তিনি আহার এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন, সামান্য ফলমূল খাইয়া থাকেন, এক কথায় তিনি নিজেকে একজন ধর্ম্মপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী

সাধিকা বলিয়া জাহির করিতে চেষ্টা করিতেন এবং প্রথম পরিচয়ে কেহ্ কেহ যে প্রতারিত না হইত এমন কথাও বলিতে পারি না।

আমি ইহাকে পূর্ব্বেও কয়েকবার দেখিয়াছিলাম এবং ইহার আচরণ সর্ব্বথা পছন্দ না করিলেও আমার মনে ইহার প্রতি বিশেষ কোন বিদ্বেষ ভাব ছিল না। সুতরাং উকীলবাবুর উপস্থিতিতে যেরূপ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম এক্ষেত্রে সেরূপ কিছুই হইল না। ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ না হওয়ায় এই ভদ্রমহিলার প্রকৃত স্বরূপ আমার কাছে তখনও অজ্ঞাতই ছিল। ইনি ঠাকুরকে চিনিতেন এবং ইহার কথাবার্ত্তায় তাঁহার প্রতি একটা সশ্রদ্ধ ভাবই প্রকাশ পাইত। প্রতাপবাবু এখানে নাই, ইনিই ঠাকুরের সেবার ভার স্বচ্ছন্দে লইতে পারিবেন, এরূপ ভাবিয়া আমি বরং আশ্বস্তই হইলাম। ঠাকুর আসিবেন শুনিয়া ভদ্রমহিলা গদগদস্বরে বলিলেন: "রাম আস্‌বে, কি ভাগ্যি, কি ভাগ্যি, তোমার বরাতেই আমার এই সৌভাগ্য" এবং আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। যাহাই হউক, পরের দিন সকাল বেলা প্রায় ৯'টার সময় ঠাকুর আসিয়া পৌঁছিলেন, সঙ্গে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। ইনি ঠাকুরকে পৌঁছাইয়া দিয়াই বাড়ী চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে ঠাকুর তখন সামান্য কয়েক টুকরা কাঁচকলা আহার করেন, অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। এই কাঁচকলা একটা বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়। টুকরাগুলি একটু বড় বড় করিয়া কাটিয়া, পরিষ্কার ভাবে ধুইয়া, ভাল ঘি কিংবা মাখনে সাঁৎলাইয়া লইতে হয় এবং পরে একটু নুন্ ও গোল

মরিচের গুঁড়া মাখাইয়া ভাপে সিদ্ধ করিতে হয়। আমি নিজে বাজারে যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া কয়েকটি ভাল কাঁচকলা লইয়া আসিলাম, ভাল ঘি ঘরেই ছিল, ইকমিক কুকারও একটা ছিল; আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিদিকে (ঐ ভদ্রমহিলাকে এখন হইতে 'দিদি' বলিয়াই উল্লেখ করিব) ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়া তাহার উপরেই এই কাঁচকলা প্রস্তুতের ভার অর্পণ করিলাম। তিনিও তৎক্ষণাৎ স্নান সারিয়া ফেলিলেন এবং ইকমিক কুকার, কাঁচকলা ইত্যাদি লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে প্রভাতবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন যে ঠাকুর আসিবেন, ৯'টার ভিতরেই স্নানাহার সারিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। কি একটা কারণে দুইদিন কলেজ বন্ধ ছিল, প্রভাতবাবু বলিলেন যে এই দুইদিন তিনি এখানেই থাকিবেন, বাড়ীতেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। জামা ছাড়িয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রভাতবাবু স্থির হইয়া বসিলেন এবং কিছুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিল। ইতিমধ্যে দিদি একখানা রেকাবিতে ঠাকুরের জন্য ৬।৭ টুকরা কাঁচকলা লইয়া আসিলেন। ঠাকুর একটি টুকরা তুলিয়া মুখে দিয়াই হাত দিয়া রেকাবিখানা সরাইয়া দিলেন। দিদির অনুরোধ সত্ত্বেও ঠাকুর কিছুতেই ঐ কাঁচকলা গ্রহণ করিলেন না। দিদি যে বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়াছেন এরূপ মনে হইল না, যেন একটু রাগতভাবেই রেকাবিখানা লইয়া চলিয়া গেলেন এবং ঠাকুরও একখানি চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রভাতবাবুকে কথাটা খুলিয়া বলিলাম

এবং তাহাকে লইয়া পাশের ঘরে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে কুকার মোটে জ্বালানই হয় নাই, ঘি যেমন ছিল ঠিক তেমনই রহিয়াছে। আমি অবাক হইয়া গেলাম, মানুষ যে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হইতে পারে তাহা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। বামুনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে রান্নাঘরের উনানে একটি ছোট এলিউমিনিয়ামের কড়ায় কাঁচকলা সিদ্ধ করিয়া দিদি তাহাতে নুন এবং আরও কি মিশাইয়া ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়াছেন। উনানে তখনও আঁচ ছিল, প্রভাতবাবু তাড়াতাড়ি আর একটি কাঁচকলা কাটিয়া ঐ ভদ্রলোকের নির্দ্দেশ মত ঘি'য়ে সাঁৎলাইয়া লইলেন এবং পরে নুন ও গোলমরিচ মাখাইয়া কুকারে চাপাইয়া দিলেন। কিঞ্চিদধিক আধঘণ্টা পরে সেই কাঁচকলা আনিয়া দেওয়া হইল, ঠাকুর সব কয়টি টুকরাই তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিলেন। আহারের পর ঠাকুর একটি গল্প বলিলেন। গল্পটি কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছি না, তবে উহার মর্ম্মার্থ ছিল এই যে কোন অর্দ্ধপরিচিত ও অপরীক্ষিত লোকের উপর সেবার ভার ন্যস্ত করিতে নাই। ঠাকুর এ যাত্রায় দুইদিন আমার বাড়ীতে ছিলেন, দ্বিতীয় দিনও প্রভাতবাবুই ঠাকুরের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, দিদিকে কাছেও ঘেঁষিতে দেওয়া হয় নাই।

বৈকালে ঠাকুর আমাকে প্রভাতবাবুর জন্য ভাল মাছ আনাইতে বলিলেন এবং আমি নিজে বাজারে যাইয়া একটি উৎকৃষ্ট গঙ্গার ইলিশ কিনিয়া আনিলাম। বাড়ী আসিয়া শুনিলাম যে মাংস রান্না হইতেছে এবং এক ভদ্রলোক ঠাকুরের

জন্য কিছু আম ও রাবড়ি দিয়া গিয়াছেন। প্রভাতবাবু প্রস্তাব করিলেন যে সে রাত্রে আর মাছ রাঁধিয়া কাজ নাই, সাঁৎলাইয়া রাখিয়া দেওয়া হউক। কথাটা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন: "সামনের জিনিষ খাইয়া ফেলাই ভাল, কাল কি হইবে কে জানে।" শেষে প্রভাতবাবু একটা মাঝামাঝি বন্দোবস্ত করিলেন। সেই রাত্রে কিছুটা ভাজা খাওয়া হইল এবং বাকীটা রাখিয়া দেওয়া হইল। পরের দিন প্রাতঃকালে রান্নাঘরে একটা গোলমাল শোনা গেল। বামুন বলিতেছে যে সে উপরের তাকে বেশ শক্ত করিয়া ঢাকিয়া মাছের টুকরাগুলি রাখিয়া দিয়াছিল, এখন দেখে যে এক খানাও নাই, ঢাকনাটা নীচে পড়িয়া আছে। দিদি বলিতেছেন যে নিশ্চয়ই সে মাছের টুকরাগুলি যত্ন করিয়া রাখে নাই, তাহার দোষেই সব বিড়ালে খাইয়া গিয়াছে। বামুন ঢাকনাটা দেখাইয়া বলিল যে বিড়ালে ফেলিয়া দিলে ঢাকনাটা কখনই এভাবে থাকিতে পারিত না, নিশ্চয়ই কেউ ঢাকনাটাকে নামাইয়া রাখিয়াছে; যে এই কার্য্য করিয়াছে সে-ই মাছগুলি চুরি করিয়া খাইয়াছে। দিদি বলিলেন যে যত সব আজগুবি কথা, নিশ্চয়ই বিড়ালে খাইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কোন প্রকারে গোলমালটা থামাইয়া দিলাম এবং ভৃত্য প্রভাসকে একটি ভাল মাছ আনিতে বলিয়া দিলাম। মাছের টাকা লইতে আমার ঘরে আসিয়া প্রভাস গোপনে আমাকে বলিল যে একটু গভীর রাত্রে দিদিই মাছের টুকরাগুলি খাইয়াছেন, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। সে রাত্রে বাহিরে গিয়াছিল, রান্নাঘরে আলো দেখিয়া উঁকি মারিয়া দেখে যে দিদি বেশ মৌজ

করিয়া টুকরার পর টুকরা মুখে তুলিতেছেন এবং আরামে নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। সহসা কথাটা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না কিন্তু প্রভাসকে অবিশ্বাসও করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তাহাকে এই বিষয় লইয়া আর কোন উচ্চবাচ্য করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। কথাটা শুনিয়া প্রভাতবাবু বলিলেন : "ঠাকুরের কথা না শোনাতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে, এমন ভাল মাছটা শেষে কিনা দিদির পেটে গেল।"

সেদিন অনেকেই ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন কিন্তু রাত্রি ৮।৮-৩০'র মধ্যেই সকলে চলিয়া গেলেন। কাঁচকলার ব্যাপারের পর দিদি আর ঠাকুরের নিকট আসেন নাই, এখন নিরিবিলি পাইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া ঠাকুরের নিকট বসিলেন এবং তাঁহার একখানা পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে নীরবে কাটিয়া গেল, আমরা কেহই কিছু বলিলাম না। প্রভাতবাবুর বোধ হয় হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে কাঁচকলার ব্যাপারটা দিদির সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া লওয়া হয় নাই, তাই তিনি দিদিকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে দিদি অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইবেন, সেই জন্যই প্রসঙ্গটা আর উত্থাপন করি নাই কিন্তু এখন দেখিলাম যে মস্ত একটা ভুল করিয়া বসিয়াছিলাম। দিদি প্রভাতবাবুর অনুযোগটাকে মোটে আমলেই আনিলেন না এবং বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিলেন : "কেন তাতে হইয়াছে কি? কাঁচকলা সিদ্ধ আগুনের জ্বালেও হইতে পারে, ভাপেও হইতে পারে, সিদ্ধ সিদ্ধ, তাহা যে আবার ঘি'য়ে সাঁৎলাইয়া লইতে হয় এমন কথা

জীবনেও শুনি নাই, রামের যত সব আজগুবি ফরমাশ।" ইহার পর আর কথা চলে না, আমরাও কিছু বলিলাম না, ঠাকুরও কিছু বলিলেন না, আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। হঠাৎ এক সময় দিদি ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "রাম, আমার কি কোন ব্যবস্থাই করবে না? তোমাকে বলিয়া বলিয়া যে হয়রান হইয়া গেলাম।" ঠাকুর বলিলেন: "আপনাকে তো বলাই হইয়াছে যে পতিসেবাই ধর্ম্ম।" এই কথাটায় দিদির বেশ একটু আঁতে ঘা লাগিত; পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, এখনও দেখিলাম যে কথাটা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারেন না। দিদি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কতকটা উষ্মার সহিত বলিলেন: "এ সব বাজে কথা তোমার কাছে কে শুনতে চায়? আসল কথাটা বল।" ঠাকুর বলিলেন যে আসল নকল তিনি কিছু জানেন না, এক কথাই জানেন এবং তাহাই বলিয়াছেন। পরে বিশদভাবে পতিব্রতা ধর্ম্ম কি, পতিসেবা কাহাকে বলে, ইত্যাদি বুঝাইয়া দিলেন। দিদির দিকে চাহিয়া মনে হইল যে তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কথাগুলি শুনিতেছেন। ঠাকুরের কথা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া গেলেন। দিদির সহিত কথাবার্ত্তায় পরে বুঝিয়াছিলাম যে ব্রজগোপীরা যেমন স্বামী ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন, সেই জাতীয় একটা কোন নির্দ্দেশ তিনি ঠাকুরের নিকট চাহিতেছিলেন। তাহা হইলেই তিনি তাহার এই অসামাজিক আচরণের এবং স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনাদির প্রতি অমার্জ্জনীয় তাচ্ছিল্যের একটা সমর্থন পাইয়া যাইতেন।

ঠাকুর চলিয়া গেলেন কিন্তু দিদি আমাদের ছাড়িলেন না। কয়েক দিনের মধ্যেই বামুনকে বিদায় দিয়া রান্নাঘরে অধিষ্ঠিত হইলেন। আমাদের বুঝাইলেন যে তাহার তো কোন কাজ নাই, এই চারজন লোকের রান্না তিনি অনায়াসেই করিতে পারিবেন; অযথা এতগুলি টাকা বামুনের পিছনে খরচের কোন প্রয়োজন নাই। প্রভাস আমাকে বলিল যে এখন হইতে ভাল মাছটাছ আর কেহই কিছু পাইবে না, বেচারী ধমক খাইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর আরম্ভ হইল এক নির্য্যাতনের পালা। মধ্যাহ্নে খাইতে বসিয়া দেখি যে রান্না হইয়াছে শুধু ডাল আর একটু মাছের ঝোল। তরকারী রান্না হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করাতে দিদি বলিলেন যে ডালেই যথেষ্ট তরকারী দেওয়া হইয়াছে। ডালের ভিতর পাইলাম দুই খণ্ড মূলা, আর কিছুই না। ডালটা তবু কোন প্রকারে খাইতে পারিলাম কিন্তু মাছের বাটিতে হাত দিয়া চক্ষু স্থির হইয়া গেল। বুঝিলাম যে ইহাতে তেলের বিন্দুও নাই এবং আঁশটে গন্ধে আমার বমির উপক্রম হইল। মাছখানা একটু নাড়াচাড়া করিয়া সরাইয়া রাখিলাম, খাইতে পারিলাম না। প্রভাসকে ডাকিয়া দই আনাইলাম, ঘরে আম ছিল, তাহা দিয়াই কোন প্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারিলাম না। দিদির হাত হইতে ভাত যেন আর পাতে পড়িতে চাহে না। সামান্য দুটি দিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করেন "আর চাই", মানুষ কতবার চাহিতে পারে, সুতরাং আধ-পেটা খাইয়াই উঠিতে হইল। এইরূপ দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। প্রভাসের কথাও অক্ষরে অক্ষরে ফলিল, মাছের ভাল

টুকরাগুলি আমরা চোখেও দেখিতাম না, রাত্রিতে দিদিই সেগুলি সাবাড় করিতেন। আমি প্রায়ই প্রভাতবাবুর বাড়ীতে অথবা হোটেলে খাইয়া আসিতাম, বাড়ীতে একবার বসিয়া শুধু নিয়ম রক্ষা করিতাম, খাওয়া হইত না।

আমিও দিদির উপর প্রতিশোধ লইবার এক ফন্দী আবিষ্কার করিলাম। যখন তখন পতিসেবার কথা তুলিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিতাম এবং তিনিও ক্ষেপিয়া যাইতেন। ইহাতে যাহাই হউক কিছুটা সান্ত্বনা পাইতাম। একদিন বৈকালে প্রভাতবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন যে রাত্রিতে তিনি এই খানেই থাকিবেন। আমি প্রমাদ গণিলাম; প্রভাতবাবু ভোজনবিলাসী লোক, আর এদিকে দিদির এমন মর্ম্মান্তিক ব্যবস্থা। কিন্তু প্রভাতবাবু অবস্থাটা জানিতেন, নিজেই বাজারে গিয়া হাঁসের ডিম ও কিছু মাছ কিনিয়া আনিলেন, তৈল, মসলা প্রভৃতিও আলাদা লইয়া আসিলেন, যেন দিদির খপ্পরে আর কিছুতেই না পড়িতে হয়। নিজেই ষ্টোভ জ্বালিয়া আমার ঘরে ডিমগুলি সিদ্ধ করিবার আয়োজন করিলেন। ডিমগুলি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, খোসাও ছাড়ান হইয়াছে, এইবার কড়ায় তেল চাপাইয়া ডালনা রান্না সুরু হইবে এমন সময় দিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "আমি থাকিতে প্রভাত রান্না করিবে, কি-ই বা রান্না, এতো আমি আধ ঘণ্টায়ই রান্নাঘরের উনানে সারিয়া দিতে পারিতাম, আবার ষ্টোভ ধরান কিসের জন্য," ইত্যাদি বলিয়া একেবারে ষ্টোভটির সামনে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু প্রভাতবাবুও নাছোড়বান্দা, ষ্টোভটি ঘরের এক কোণে সরাইয়া নিয়া এমন ভাবে

বসিলেন যে দিদির আর ষ্টোভের নিকটে যাইবার উপায় থাকিল না। আমি জিনিষগুলি আগাইয়া দিলাম এবং প্রভাতবাবু কড়ায় তেল ঢালিয়া দিলেন। দিদির কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, বোধ হয় তাহা দেখিবার জন্যই প্রভাতবাবু ইচ্ছা করিয়াই খানিকটা বেশী পরিমাণে তেল ঢালিয়া দিয়াছিলেন। দিদি একেবারে-হা হা করিয়া উঠিলেন এবং প্রভাতবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: "মুদির দোকান ফেল পড়বে যে।" আমরা কোন কথাই বলিলাম না, রান্না চলিতে লাগিল। ডিম ও মাছ প্রস্তুত হইয়া যাইতেই প্রভাস একটা এ্যালুমিনিয়মের প্যানে করিয়া চাল ধুইয়া লইয়া আসিল। প্রভাতবাবু যে ভাতও আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা আমি জানিতাম না। দিদি অনেক কিছুই বলিলেন, আমরা গ্রাহ্যও করিলাম না। কিন্তু আমাদের ফাঁড়া তখনও কাটে নাই, পরিবেশন করিবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন কিন্তু প্রভাতবাবু কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। অনেক দিন পরে নিজের বাসায় পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিলাম। আমাদের খাওয়া দেখিয়া দিদির মুখের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা পাঠক-পাঠিকারা কল্পনা করিয়া লইবেন। আমি বলিয়া উঠিতে পারিব না।

আহারের পর দিদি প্রভাতবাবুকে বলিলেন: "খাওয়া তো হইল, এইবার একটু ঠাকুরের কথা বল, শুনি।" প্রভাতবাবু সমস্তই জানিতেন, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন: "ঠাকুরের তো ঐ এক কথা, পতিসেবা, পতিব্রতা ধর্ম্ম।" দিদি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, "তোমাদের যেমন ঠাকুর তেমন তোমরা" ইত্যাদি অনেক

কিছু বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। ইহার কয়েক দিন পরে একটা অনিবার্য্য কারণে দিদি আমাদের ঘাড় হইতে নামিলেন, আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দিদি ঢাকা চলিয়া গেলেন।

এই দিদির স্বামী, সংসার, আত্মীয়, পরিজন, সবই ছিল, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হিসাবে অবস্থাও নেহাৎ মন্দ ছিল না। কিন্তু এসব কিছুই তাহার ভাল লাগিল না, হঠাৎ তাহাকে এক অস্বাভাবিক ও উৎকট ধর্ম্মচর্চ্চায় পাইয়া বসিল। ধর্ম্মটর্ম্ম অবশ্য সবই বাজে, আসল মতলব লোকের কাছে একটু বাহাবা পাওয়া, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা। তিনি আহার ছাড়িয়া দিলেন এবং তাহার আচরণের দ্বারা দেখাইতে লাগিলেন যে সংসারে তাহার কোনও আসক্তি নাই। কেহ কেহ যে তাহার আচরণে তাহাকে একজন প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া ভুল না করিলেন এমনও নহে, সুতরাং তাহার একটু খ্যাতিও হইল। কিন্তু ইহার সমস্তটাই কৃত্রিম, শীঘ্রই তিনি চুরি করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। চুরি করিয়া খাওয়া সকল সময়ে জোটে না, ফল দাঁড়াইল এই যে নব্য মনস্তাত্ত্বিকেরা যাহাকে অবদমন (repression) বলে, তাহারও তাহাই হইল, নিজে খাইতে পান না বলিয়া অপরের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারও আর তিনি সহ্য করিতে পারেন না। যা-তা করিয়া ঠাকুরের কাঁচকলা তৈয়ার করার এবং আমাদিগকে নির্ব্বিচারে খাওয়ার কষ্ট দেওয়ার ইহাই অন্তর্নিহিত কারণ। কৃত্রিমতা আশ্রয় করিয়া চলিতে চলিতে এই মানসিক বিকৃতি তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল এবং ইচ্ছা করিলেও তাহার আর ফিরিবার উপায়

ছিল না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবেই কাটাইয়া গিয়াছেন। পাটোয়ারী যে কি ভয়াবহ বিকৃতি এবং একবার আরম্ভ হইলে ইহা যে কি মর্ম্মান্তিক দুরবস্থার মধ্যে লইয়া যাইতে পারে, এই দিদিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আলোচনাটা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে এবং পাঠক-পাঠিকারা হয়তো বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন কিন্তু বিষয়টা এত গুরুতর যে আরও দুই চারিটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। ইষ্টপথের সর্ব্বপ্রধান বাধক এই পাটোয়ারী, সুতরাং ইহাকে যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়া লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বে দুই প্রকারের পাটোয়ারীর উল্লেখ করিয়াছি। তৃতীয়তঃ আমার মনে হয় যে অনুকরণ প্রবৃত্তি হইতেও ধীরে ধীরে পাটোয়ারী গড়িয়া উঠিতে পারে। বিষয়টা জটিল এবং ইহা লইয়া অনায়াসেই একটা বিতর্কের সৃষ্টি হইতে পারে, সুতরাং আমাদিগকে সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় এই অনুকরণ প্রবৃত্তি একটু বিশেষ ভাবে সজাগ হইয়া উঠে। নিজের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় যাঁহারা এই পথে বহুদিন ধরিয়া আছেন, তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিবার এবং কিছুটা তাহাদের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃই আসে। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে যখন কেহ প্রথম ঠাকুরের সম্পর্কে আসিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি যে পুরাতন আশ্রিতবর্গের মধ্যে যাহাদের অধিক পছন্দ হইয়াছে, তাহাদের অনুকরণের একটা চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে। ইহা যে একটা গুরুতর অপরাধ

এমন কথা আমি বলিতেছি না। পক্ষান্তরে, ক্ষেত্রবিশেষে ইহার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। পাঁচজনকে দেখিয়াই শিখিতে হয় এবং নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহাতে বিপদের সম্ভাবনাও বড় অল্প নহে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে প্রাক্তনানুসারে মানুষের দেহ, মন ও প্রকৃতির গঠন বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে এবং এই জন্যই যাহা একের পক্ষে স্বাভাবিক ও মঙ্গলপ্রদ, অপরের পক্ষে ঠিক তাহাই হয়তো অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে। এই জন্যই ঠাকুর বলিয়াছেনঃ "পরের বুদ্ধিতে অধিক চলিলে মলিন হয়। আপন বুদ্ধিই সমাদরের যোগ্য।" আরও বলিয়াছেন: "পরের ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিতে নাই। নিজের যেটুকু ভক্তিশ্রদ্ধা ভগবান দেন সেইটুকু নিয়াই সন্তোষ থাকিতে হয়," (বেদবাণী, প্রথম খণ্ড ২০২ এবং ২৮৮ নং)। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে নিজ নিজ স্বভাবোপযোগী অভিষ্ট পন্থা আপনিই গড়িয়া উঠে। কিন্তু ধৈর্য্য বস্তুটা এ সংসারে নিতান্তই বিরল এবং সেই জন্যই তাড়াতাড়ি ফল পাইতে গিয়া যেমন "কষা আমে গুড় মাখিয়া লই." অন্যের অনুকরণ করিতে গিয়াও সেইরূপ নানাবিধ জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া ফেলি।

এই অনুকরণ দুই প্রকারের হইতে পারে, সজাগ এবং অন্ধ। যেখানে ইহা সজাগ সেখানে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না, কারণ শোধরাইবার পথ উন্মুক্তই থাকে। কিন্তু অন্ধ অনুকরণের পাটোয়ারীতে রূপান্তরিত হইতে বিশেষ-বিলম্ব হয় না। বাহুল্য ভয়ে এই বিষয়ে শুধু একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। আমার বিশিষ্ট বন্ধু হরিদাসবাবুর পিতা ৺রুক্মিনীকান্ত আচার্য্য

মহাশয়ের মত একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ও আদর্শ গৃহী জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যে কিরূপ আত্মস্থ ছিলেন ছোট একটি ঘটনা বিবৃত করিলেই পাঠক-পাঠিকারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতে ঢাকা যাইতেছিলাম, নারায়ণগঞ্জ ষ্টেসনে হরিদাসবাবুর প্রতিবেশী আমাদের অপর একটি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাহার নিকট শুনিলাম যে হরিদাসবাবুর বড় ছেলেটি পূর্ব্বের দিন জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। কথাটা শুনিয়া মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল। ছেলেটিকে শিশুকাল হইতেই দেখিয়াছি এবং তাহার প্রতি স্বভাবতঃই একটা স্নেহা-কর্ষণ ছিল। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম এই ভাবিয়া যে এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের মধ্যে যাইবই বা কি করিয়া, আর বলিবই বা কি? সে দিন বৈকালে আর গেলাম না; রেলে, ষ্টীমারে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছি, আজ না-ই বা গেলাম, এই ভাবে মনকে বুঝাইলাম। পরের দিন প্রাতঃকালে চা খাইতে প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল, ভয়ানক রৌদ্র উঠিয়াছে, ভীষণ গরম, সুতরাং যাওয়া হইল না। আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে আমার মনটা না-যাইবার অজুহাত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বৈকালে কিন্তু আর না যাইয়া পারিলাম না, সন্ধ্যার একটু পরে হরিদাসবাবুর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে যাইয়া কিন্তু আমার সকল সঙ্কোচ ও দুর্ভাবনার অবসান হইয়া গেল। দেখিলাম যে আচার্য্য মহাশয় তাহার ঘরে তক্তা-পোশের উপর বসিয়া রহিয়াছেন, সমস্ত পরিবারটিই সেখানে। আচার্য্য মহাশয় ঠাকুর প্রসঙ্গ করিতেছেন এবং সকলে তন্ময়

হইয়া তাহাই শুনিতেছে। একটা গভীর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের এমন একটি সুস্থ, শান্ত চিত্র জীবনে আমি কখনও দেখি নাই। শুধু আচার্য্য মহাশয়ের প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাধিকবার বলিয়াছেন যে যে-বস্তুর সন্ধানে তুই তুই বার ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, আমাদের ভাগ্যে বৃদ্ধ বয়সে তাহা তিনি ঘরে বসিয়াই পাইয়াছেন। ঠাকুরকে যে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, সামান্য একটা কথাতেই তাহা বুঝা যাইবে। বৈকালে ভাগবতের অন্ততঃ কিছুটা অধ্যয়ন করা আচার্য্য মহাশয়ের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। তিনি নিয়ম মত বৈকালে ভাগবত খুলিয়া বসিয়াছেন এমন সময় ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিলেন: "আপনে ভাগবত পড়েন।" আচার্য্য মহাশয় একবার সম্মুখে বিলম্বিত ভাগবতখানার দিকে এবং একবার ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন: "কোন ভাগবত, এই ভাগবত, না ঐ ভাগবত?"

ঠাকুরকে দেখিলেই প্রথমটায় আচার্য্য মহাশয় কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। একদিন বৈকালে আমি, বীরেনবাবু ও আরও একজন ভদ্রলোক ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে আমি ঢাকাতে ছিলাম। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে বৃদ্ধ আচার্য্য মহাশয় তাহার ঠাকুর ঘরের বারান্দায় একখানা মাদুর পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি

উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না, আবার বসিয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন। চিৎকার করিয়া হরিদাসবাবুকে ডাকিলেন এবং মাদুরখানা তুলিয়া উঠানে পাতিয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। আবার কি ভাবিয়া মাদুরখানা রাখিয়া দিলেন এবং বারান্দার কোণ হইতে একটা বড় পাথরের বাটি তুলিয়া লইলেন, ইচ্ছা যে ঠাকুরের পা ধোয়াইয়া দিবার জন্য জল লইয়া আসিবেন। কিন্তু কূপ হইতে জল তুলিয়া আনা তাহার সাধ্যাতীত, সুতরাং আবার হরিদাসবাবুকে ডাকিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে না পারিয়া অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আচার্য্য মহাশয়ের আচরণের মাধুর্য্য কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলাম না, শুধু ইহাই বলিতে পারি যে এমন মর্ম্মস্পর্শী আত্ম-বিহ্বলতা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ঠাকুরও যে ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং যে অপরূপ দৃষ্টিতে আচার্য্য মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, তাহাও অবর্ণনীয়, কিছুই বলিবার চেষ্টা করিব না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সেখানে বীরেনবাবু ও আরও একজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া সেই ভদ্রলোকের বাসায় যাইতে হইয়াছিল। তিনি তখন তাহার বাহিরের ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবার বসিয়া পড়িলেন, এবং তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে বুঝিতে কোন কষ্টই হইল না যে তিনি আচার্য্য মহাশয়কে অনুকরণ করিবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন। ব্যাপারটা এত বিসদৃশ ও হাস্যকর

মনে হইল যে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। এই ভদ্রলোককে সহজ সরল বলিয়াই জানিতাম। তাহার সহিত আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাহাকে একটু ভালও বাসিতাম। কিন্তু এই ঘটনার পর আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে পাটোয়ারী তাহার এমন মজ্জাগত এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল যে সহজে কিছুই বুঝা যাইত না। চক্ষের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটি না ঘটিলে হয়তো তিনি আরও কিছুকাল আমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া চলিতে পারিতেন। পরে তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে ঠাকুরকেও আর মানিতে চাহিতেন না। এই পোড়া দেশে শিষ্যবর্গের অভাব বড় কাহারও একটা হয় না; ইনিও কয়েকজন সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং নিজেকে ঠাকুরের সমকক্ষ এবং কখন কখন ঠাকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই নিরর্থক অনুকরণ প্রবৃত্তিকে ঠাকুর যে কি চক্ষে দেখিতেন, আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতেই তাহা আমি বলিতে পারি। "ক্ষৌরী হইব, নাপিত ডাকাইয়া আনেন," এরূপ কথা ঠাকুরের মুখে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। প্রয়োজন মত আমরাই নাপিত ডাকাইয়া আনিতাম, ঠাকুরকে বড় একটা জিজ্ঞাসাও করিতাম না। ঠাকুর সেদিন আমার বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় ছিলেন। তাঁহার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ আমার মনে হইল যে গোঁফদাড়ি যেন অনেকটা বড় হইয়া গিয়াছে, একবার কামাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। তখনই নাপিত ডাকাইলাম এবং ঠাকুরও ছোট ছেলেটির মত নাপিতের সম্মুখে গিয়া বসিলেন।

নাপিত তাহার কার্য্য শুরু করিল। ইতিমধ্যে একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। বরদাবাবু একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে যখনই তিনি ঠাকুরের জন্য নাপিত ডাকেন, দাড়িগোঁফের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও মুণ্ডন করাইয়া দেন। কথাটা আমার মনে পড়ায়, দাড়িগোঁফ কামান হইয়া গেলে মাথাটিও কামাইয়া দিতে নাপিতকে নির্দ্দেশ করিলাম। ইহাতে এক বিপর্য্যয় হইয়া গেল। ঠাকুর এমন ভাবে আমার দিকে তাকাইলেন যে আমার হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গেল। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এবং মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হইলাম। নাপিতকে বিদায় করিয়া দিয়া ঠাকুরকে একা ফেলিয়াই তেতলায় চলিয়া গেলাম। সেখানে নিরিবিলি একখানা ঘর ছিল, সেই ঘরে একাকীই কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আমার মন তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, ঠাকুরের প্রতি এক নিদারুণ অভিমানে এলোমেলো নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে অশান্ত মন শান্ত হইয়া আসিল। একবার ভাবিলাম যে ঠাকুর একাকী রহিয়াছেন, নীচেই চলিয়া যাই, কিন্তু অভিমান তখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, সুতরাং বসিয়াই রহিলাম। সুস্থ মনে একটু বিচার করিতেই বুঝিলাম যে ঠাকুর তো অন্যায্য কিছুই করেন নাই, আমার শাসনের প্রয়োজন ছিল, শাসন করিয়াছেন, ইহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই কেন? আমি বরদা-বাবুর অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়াছিলাম, কাজেই ঠাকুর আমাকে শাসন করিয়াছেন। বরদাবাবু কি ভাবিয়া কি করিতেন তাহা তো আমি জানি না। বরদাবাবু হয়তো মুণ্ডিতমস্তক ঠাকুরকে দেখিয়া একটা অপার আনন্দ উপভোগ করেন এবং ভাবগ্রাহী

ঠাকুরও সেই জন্যই তাহার ইচ্ছায় অসম্মতি প্রকাশ করেন না। আমার তো এ রকম কিছুই মনে হয় নাই। বরদাবাবু করেন সুতরাং আমিও করি, এইরূপ ভাবিয়াই তো আমি নাপিতকে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। আমার এই অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তিকে ঠাকুর যে এই কঠোর আঘাত হানিয়াছেন, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন, ক্ষোভের বিন্দুমাত্র কারণও ইহাতে নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন শান্ত হইয়া আসিল এবং আবার নীচে নামিয়া আসিলাম। ঠাকুর তখন উপস্থিত ৩।৪ ভদ্রলোককে কি একটা কথা বুঝাইতেছিলেন, আমি উপরে চলিয়া যাইবার পর ইঁহারা আসিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই ঠাকুর একবার আমার দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে কি ছিল জানি না, কিন্তু আমার হৃদয় জল হইয়া গেল, আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না।

প্রসঙ্গটাকে ইচ্ছামত বিস্তার করিবার আরও অনেক উপকরণ আমার হাতে আছে কিন্তু আমি মনে করি যে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু এই অনুকরণ প্রসঙ্গে একটা জটিল প্রশ্নের অবতারণা হইতে পারে। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অর্থাৎ মহাজনের পথই পথ; ঠাকুরের মুখেও শুনিয়াছি যে পূর্ব্বাপর মহাজনপুঞ্জের পথই পথ। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মহাজনের পথানুসরণ আর মহাজনের অনুকরণ একই হইয়া দাঁড়ায় কিনা, এরূপ একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন: "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহাই করে। মহতেরা যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান সাধারণ লোকেরা

তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনুকরণ বৃত্তিকে একান্ত দোষাবহ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আবার এ কথাও পাওয়া যায় যে মহাজনেরা তোমাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহাই কর, তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করিতে যাইও না, বিপদে পড়িবে। তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি নাই, স্বভাবেই কর্ম্ম উপস্থিত করে, স্বভাবেই নিষ্পন্ন হইয়া যায়, তাঁহারা শুধু সাক্ষীস্বরূপ থাকেন। আর আমরা কর্ম্ম করি কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা মত, সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মে ও আমাদের কর্ম্মে, তাঁহাদের আচরণে ও আমাদের আচরণে একটা মূলগত বৈষম্য রহিয়াছে এবং আমাদের পক্ষে তাঁহাদিগের অনুকরণ বা অনুসরণ সম্ভবও নহে, যুক্তিযুক্তও নহে। ঠাকুরের এমন অনেক আচরণের খবর আমি জানি, যাহার অনুকরণের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। তাহা হইলে মহাজনের দৃষ্টান্ত, মহাজনের পথ, এ সকল কথার অর্থ কি? ঠাকুরের মুখে বিভিন্ন সময়ে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে ভাগবৎকার এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই যুক্তিযুক্ত। রাস পঞ্চাধ্যায়ে ভাগবৎকার বলিয়াছেন :

“ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥”

শ্রীধর স্বামী ‘ঈশ্বর’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন নিরহঙ্কারী পুরুষ, অর্থাৎ যাঁহার অহংবুদ্ধি নাই, সুতরাং কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিও নাই। এইরূপ যে মহাজন, তাঁহারা যাহা বলেন তাহা সত্য এবং তাঁহাদের

আচরণ কখন কখন সত্য, সকল সময়ে সত্য নহে। তাঁহাদের কথার সহিত তাঁহাদের যে যে আচরণের সঙ্গতি থাকে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি শুধু সেইগুলিরই অনুসরণ করেন। এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ভাগবৎকার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদ্র মন্থনে বিষ উঠিয়াছে, সেই বিষানলে সৃষ্টি ছারখার হইয়া যাইবার উপক্রম, কেহই কোন উপায় ভাবিয়া পাইতেছে না, এমন সময় মহাদেব আসিয়া সেই অত্যুগ্র হলাহল নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়া গেল কিন্তু সৃষ্টি রক্ষা পাইল। আমাদের মধ্যে যদি কেহ এই মহাদেবের আচরণের অনুকরণ করিতে যায় তাহার ফল কি দাঁড়াইবে তাহা না বলিয়া দিলেও চলে।

পাটোয়ারীর প্রসঙ্গটা হয়তো একটু অতিমাত্রায় দীর্ঘ হইয়া গেল, কিন্তু আমার কৈফিয়ৎ এই যে ঠাকুরের নিকট অনেককেই আসিতে দেখিয়াছি; মদ্যপ, লম্পট, মামলাবাজ, জুয়াচোর, ইত্যাদি অনেকেই আসিয়াছে গিয়াছে কিন্তু ঠাকুরের ব্যবহারে বিশেষ কোন ইতর বিশেষ দেখি নাই। পাটোয়ারের কিন্তু অনেক লাঞ্ছনাই দেখিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঠাকুর স্পষ্টই বলিতেন যে পাটোয়ারীর মার্জ্জনা নাই। তথাকথিত সভ্য সমাজে চলিতে হইলে একটু আধটু পাটোয়ারী বোধ হয় অপরিহার্য্য এবং বিশেষ করিয়া সেইজন্যই প্রথম হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। পাটোয়ারী বুদ্ধি যে কখন কাহাকে কিভাবে পাইয়া বসে তাহা বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত দুষ্কর। আমরা দেখিয়াছি যে সামান্য একটু প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হইতে ক্রমে মহা অনর্থের সূত্রপাত

হইতে পারে। ধার্ম্মিকে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতে হয় এবং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত প্রতি পদে অগ্রসর হইতে হয়। কথাই আছে যে "যেজন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।" সজাগ না থাকিলে কখন যে কি হইয়া যাইবে কেহই বলিতে পারে না। এইজন্যই ভক্ত কবি অশ্বিনী দত্ত গাহিয়াছেন :

"ঝাঁপ দিয়ে রসের সাগরে, কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে।
নামপ্রেমে মাখা যেমন, কামপ্রেমে মাখা তেমন,
রসিক জানে রসের আস্বাদন।
হংস হ'লে কলে কৌশলে জল ছেড়ে দুধ পান করে,
বেহুঁসিয়ার হ'লে পরে দংশনেতে ঢলে পড়ে।"

৩

যতদূর স্মরণ হয়, ঠাকুরের সঙ্গে যে দিন রেলবাবু সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়, তাহার দুইদিন পরে প্রাতঃকালে ঠাকুর একাকীই আমার সেই বিডন ষ্ট্রীটের মেসে আসিলেন। আসিবার কোন কথা ছিল না, সুতরাং আনন্দটা একটু বেশীই হইল। প্রতাপবাবু তখনও সেখানেই থাকিতেন। পূর্ব্বের ন্যায় তিনিই ঠাকুর সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। ঢাকা নিবাসী এক ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তিনিও তখন ঐ মেসেই ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেও ঠাকুরের কথা শুনিয়াছিলেন কিন্তু চাক্ষুষ কখনও দেখেন নাই। সংবাদ পাইয়া তিনি আমার ঘরে আসিলেন এবং ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি ঠাকুরকে একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, প্রশ্নটা কি, তাহা

স্মরণ নাই, কিন্তু এইটুকু বেশ স্পষ্ট মনে আছে যে কিছুক্ষণ আলোচনার পর ভদ্রলোক সন্ত্রস্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন: "তবে উপায়?" ঠাকুর বলিলেন: "উপায়—নিরুপায়", অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে নিরুপায় না হইলে উপায় হইবে না। ঐ ভদ্রলোক কি বুঝিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু আমি এই কথাটা ঠাকুরের মুখে একাধিকবার শুনিয়াছি এবং ইহার তাৎপর্য্য যে ভাবে বুঝিয়াছি তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করাই সঙ্গত মনে হইতেছে, কারণ কথাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ঠাকুরের মূল শিক্ষার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঠাকুর বলিতেন যে অকর্ত্তাবুদ্ধিই স্বভাব, কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিই অভাব। অকর্ত্তাবুদ্ধি ও নিশ্চেষ্টতা একই কথা. একটা না আসিলে অন্যটা আসিতে পারে না এবং যথাসম্ভব প্রারব্ধবেগ সহ্য করিয়া ক্রমে নিশ্চেষ্টতার পর্য্যায়ে উঠাই জীবের পুরুষার্থ। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের নিশ্চেষ্টতা তাঁহার অনন্য ভগবন্নিষ্ঠা ও তদানুষঙ্গিক অকর্ত্তাবুদ্ধিরই রূপান্তর মাত্র। একদিক হইতে দেখিলে যাহা অনন্যনিষ্ঠা, অপর দিক হইতে দেখিলে তাহাই অকর্ত্তাবুদ্ধি এবং নিশ্চেষ্টতাও এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহে। একটি আসিলে অপর দুইটিকেও আসিতেই হইবে এবং জীবের এই অবস্থাকেই ঠাকুর বলিতেন স্বভাব।

ঠাকুর অনেক সময় আরও দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেন এবং আমরা যে কথাটা লইয়া আলোচনা করিতেছি তাহা বুঝিবার পক্ষে এই দুইটিই যেন অধিকতর উপযোগী। প্রথম দৃষ্টান্ত হনুমান। সমুদ্র লঙ্ঘন উদ্দেশ্যে হনুমান লম্ফপ্রদান করিয়াছেন, হঠাৎ সমুদ্রের

ভিতর হইতে সুরসা সাপিনী মুখব্যাদান করিয়া হনুমানের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল এবং হনুমান কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে মুখের ভিতর পুরিয়া ফেলিল। হনুমানের ভীষণ ক্রোধের উদ্রেক হইল। "কি এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে মুখে পুরিয়া রাখিতে চায়, আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা", এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার দেহের পরিধি বিস্তৃত করিতে লাগিলেন কিন্তু দেখিলেন যে ফল কিছুই হইতেছে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে সুরসা সাপিনীও তাহার মুখবিবর বিস্তৃত করিয়া যাইতেছে। হনুমান ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় দেহ বিস্তার আরম্ভ করিলেন কিন্তু কোন ফলই হইল না, সাপিনীর কবল হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। অহঙ্কারে উন্মত্ত হওয়ায় হনুমানের রাম নামও বিস্মরণ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু যখন নিজশক্তির শেষবিন্দু প্রয়োগ করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না তখনই তাঁহার ইষ্ট-স্মরণ হইল এবং নিশ্চেষ্টতা আশ্রয় করিয়া সুরসা সাপিনীর হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। (রামায়ণে সাপিনীর নাম দেওয়া হইয়াছে সুরমা এবং গল্পাংশেও ঠাকুরের বর্ণনার সহিত কতকটা পার্থক্য আছে।)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দ্রৌপদী। দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া রজস্বলা দ্রৌপদীকে কুরুরাজ সভায় লইয়া আসিয়াছে এবং সভামধ্যে তাহাকে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিরুপায় দ্রৌপদী অসহায় দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও কোন আশ্বাসের সূত্র খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি রাজধর্ম্মের কথা তুলিলেন কিন্তু রাজা নীরব, সভাসদগণ নিস্তব্ধ।

ন্যায়ধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম প্রভৃতি অনেক নীতির কথাই তিনি বলিলেন কিন্তু কোন ফলই হইল না, এমন কি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিও নীরবে অধোবদনে রহিলেন। তাঁহার স্বামীগণ তখন পণবদ্ধ ক্রীতদাস, ইহা জানিয়াও তিনি মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিয়া তাহাদিগকে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জাগ্রত করিতে চাহিলেন কিন্তু কিছুই হইল না, স্বামীগণ নীরব, নিস্পন্দ হইয়াই রহিলেন। একমাত্র বিদুর তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইলেন কিন্তু তাহাতেও দ্রৌপদী কোন সাহায্যই পাইলেন না, বিদুরের তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ উক্তিগুলি অরণ্যে রোদনের মতই শুনাইল। কোন দিকে কোন ভরসার সম্ভাবনা না দেখিয়া দ্রৌপদী এক হস্তে স্বীয় পরিহিত বস্ত্র আঁটিয়া ধরিয়া দুঃশাসনকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন এবং অপর হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া কাতরস্বরে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইলেন না। তখন অনন্যোপায় দ্রৌপদী উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইতেই দুঃশাসন দুর্ব্বল হইয়া গেল, লজ্জানিবারণ তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন।

এই দুইটি দৃষ্টান্তেও নিশ্চেষ্টতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তবে পার্থক্য এই যে প্রহ্লাদের নিশ্চেষ্টতা সহজ এবং স্বাভাবিক, মনে হয় যেন ইহা লইয়াই তিনি জন্মিয়াছিলেন। আর হনুমান ও দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে ইহা আসিয়াছে চেষ্টার পরিসমাপ্তিতে। ঠাকুর বলিতেন : "জীবের কোন শক্তি নাই, ইহাই তাহার পরম শক্তি।" কথাটার তাৎপর্য্য আমি ইহাই বুঝিয়াছি যে জীব যখন বাস্তবিকই বুঝিতে পারে যে সে শক্তিহীন, তখনই সে নিশ্চেষ্টতার আশ্রয় লয়

এবং নিশ্চেষ্ট হইলেই ভগবৎশক্তি আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়। "উপায়—নিরুপায়" কথাটিকেও আমি এই ভাবেই বুঝিয়াছি। কিন্তু এই নিশ্চেষ্টতাকে জড়তা মনে করিলে অত্যন্ত ভুল বুঝা হইবে। কোন প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং কোন ইচ্ছাও থাকে না। কর্ম্ম উপস্থিত হয় এবং আপনিই সমাধা হইয়া যায়। এই জন্যই বলা হয় যে এই অবস্থায় কর্ম্মই কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়।

সে যাহাই হউক, কিছুক্ষণ এইরূপ আলোচনা চলিবার পর সেই ভদ্রলোকটি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে প্রতাপ-বাবুর সহিত তাহার কি কথাবার্ত্তা হইল। পরে প্রতাপবাবুর মুখে শুনিলাম যে এক মজার ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। সেই ভদ্রলোক বড়বাজার হইতে অতি উৎকৃষ্ট কয়েকটি ফজলী আম আনাইয়া-ছিলেন। ঠাকুর এখানে উপস্থিত, তাঁহাকে এই আমের কিছুটা না দেওয়া ভাল দেখায় না, এইরূপ ভাবিয়া প্রথমে তিনি প্রতাপ-বাবুকে তিনটি আম তুলিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। একটু পরে আবার বলিলেন যে তিনটির প্রয়োজন নাই, তুইটি রাখিলেই চলিবে। এই বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন: "উনি তো কিছুই খান না শুনিয়াছি, তুইটির দরকার নাই, একটাতেই হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি প্রতাপবাবুকে বলিলাম: "এই আম ঠাকুরের ভোগে লাগিবে না।" তিনি একটু জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিলেন। আমি তাহাকে জানাইলাম যে আম কাটিয়া দিতে আমি নিষেধ করিতেছি না কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ঠাকুর ইহা গ্রহণ করিবেন না। ইহার কিছুক্ষণ পরে ঘি, চিনি,

কলা এবং কয়েকটি বিভিন্ন ফলের টুকরা ঠাকুরকে দেওয়া হইল। ঐ আমটিও প্রতাপবাবু সযত্নে কাটিয়া থালায় সাজাইয়া দিলেন। ঠাকুর ঘি, চিনি ও কলা একত্রে মাখিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ফলও সামান্য কিছু খাইলেন। পরিশেষে ঐ আমের একটি টুকরা মুখে দিয়া বলিলেন যে আমটা তেতো এবং টুকরাটি থালার এক পাশে রাখিয়া দিলেন। আমরা সকলেই সেই আম প্রসাদ পাইয়াছিলাম ; অতি উৎকৃষ্ট গাছপাকা ফজলী, মিছরির মতন মিষ্টি কিন্তু ঠাকুর বলিলেন যে আমটা তেতো। এই জাতীয় ঘটনা আমি জীবনে আরও অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়াছে যে ঠাকুরের খাওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত যে খাওয়াইত তাহার মন ও নিষ্ঠার উপর।

সেদিনের আর কোনও কথা স্মরণ হইতেছে না। দ্বিতীয় দিন ঠাকুরকে একা রাখিয়াই আমাকে কলেজে চলিয়া যাইতে হইল। এক তলায় শক্তি-ঔষধালয়ের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অনূপবাবুকে ঠাকুরকে একটু দেখাশুনা করার কথা বলিয়া গিয়াছিলাম। ৪টা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম যে ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে ঠাকুরকে অনূপবাবু অনেক অনুনয় করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। ঠাকুরের কথার ভাবে বুঝিয়াছিলাম যে আরও ২।৩ দিন তিনি আমার এখানেই থাকিবেন, হঠাৎ কেন চলিয়া গেলেন কিছুই বুঝিলাম না। বৈকালে অনেকে ঠাকুর দর্শনে আসিলেন এবং ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যার কিছু পরে প্রভাতবাবু আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তিনি রাত্রিতে ঠাকুরের কাছেই থাকিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে আর ফিরিতে দিলাম না এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঠাকুর প্রসঙ্গ করিয়া কাটাইলাম। কি কথা হইয়াছিল কিছুই মনে নাই কিন্তু একটা কথা মোটেই ভুলি নাই। সেই আম দেওয়ার ব্যাপারটা শুনিয়া প্রভাতবাবু গোড়ায় বেশ আমোদ অনুভব করিলেন কিন্তু পরে মনে হইল তিনি চটিয়াছেন। প্রাতঃকালে ঐ ভদ্রলোকের সহিত একটা বোঝাপড়া করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। আমি প্রমাদ গণিলাম এবং অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলাম। ভোর হইতে না হইতেই নিজে সঙ্গে যাইয়া তাহাকে ট্রামে তুলিয়া দিয়া আসিলাম।

সেদিন কলেজ ছিল না, চা খাইয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। সম্ভাব্য সকল স্থানেই ঠাকুরের অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোন সংবাদই পাইলাম না। অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ঘরে ঢুকিয়াই কিন্তু সে ভাব কাটিয়া গেল, দেখিলাম যে খাটের উপর ঠাকুর একাকীই বসিয়া রহিয়াছেন। জামা ছাড়িয়া, হাতমুখ ধুইয়া ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে হঠাৎ তিনি কোথায় গিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন যে সে সময়ের প্রায় ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন উত্তরপাড়ায় ছিলেন, সেখানে নিকটস্থ কোন এক গ্রাম হইতে এক ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। ধর্ম্ম কি, এবং ধর্ম্ম লাভের উপায় কি, এই বিষয় লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে তাহার কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। আলোচনান্তে তিনি ঠাকুরের

কৃপালাভ করেন এবং "নাম" পাইয়া গৃহে ফিরিয়া যান। সেই ভদ্রলোকের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার মৃত্যু-শয্যায় উপস্থিত থাকিবার জন্য ঠাকুর সেদিন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠাকুরের সেই একবার বৈ আর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টাও কখন করেন নাই এবং ঠাকুরের কথা কাহারও কাছে প্রকাশও করেন নাই। "বেদবাণী"র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমি এইরূপ একজন ভক্তের উল্লেখ করিয়াছি এবং ঠাকুরের মুখে আরও ২।৩ জনের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু ইঁহাদের জাতই আলাদা, কদাচিৎ এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইঁহারা সম্যকরূপে বুঝিয়াছিলেন যে গুরুর বাক্যই গুরু, ঐ বাক্য লইয়াই পড়িয়াছিলেন, আর কোন কিছুরই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আর আমরা তো সারাজীবন ভরিয়া ঠাকুরের কত কথা শুনিলাম, কতবার তাঁহাকে দেখিলাম, আমাদের শোনাও ফুরাইল না, দেখাও ফুরাইল না। কখন কখন ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি যে সংসারে তিন প্রকারের লোক আছে, করিমুল্লা, শোনাউল্লা, আর বকাউল্লা। যাহারা মনোযোগ দিয়া কথাগুলি শুনিয়া লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়া যায়, তাহারা করিমুল্লা। এইমাত্র যাহাদের কথা বলিতেছিলাম তাহাদিগকে করিমুল্লা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সংখ্যায় ইহারা নিতান্তই বিরল। যাহারা কিছু করুক বা না করুক অন্ততঃ কথাগুলি শোনে, তাহারা শোনাউল্লা। ইহারাও সংখ্যায় খুব বেশী নয়, নিবিষ্ট মনে কোন কিছু শুনিবার ধৈর্য্য

অধিকাংশেরই নাই। আমি নিজে যে সকল ক্ষেত্রেই ঠাকুরের উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছি, এমন কথা কখনই বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ ঠাকুরের কথা শুনিয়াই সিগারেট টানিবার অছিলায় বাহিরে চলিয়া গিয়াছি এবং বন্ধুদের লইয়া আড্ডা জমাইয়া বসিয়াছি, ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া যাইতে কখনও কখন হয়তো এক ঘণ্টার উপর বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পাঁচ সাত জনে মিলিয়া ঠাকুর প্রসঙ্গ হইতেছে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি যে যিনি বলিতেছেন তাহার কথা বড় কেহ একটা লক্ষ্য করিতেছে না, কিন্তু তাহার থামিবার প্রতীক্ষায় নিজে কিছু বলিবার জন্য সকলেই মুখ উচাইয়া রহিয়াছে। ইহার ব্যতিক্রমও যে কখন কখন দেখি নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না, কিন্তু আমরা যে বেশীর ভাগই বকাউল্লা তাহা নিঃসন্দেহ।

আরও একটা কথা এইখানে বলা প্রয়োজন মনে হইতেছে। ঠাকুরের নিকটে থাকিলেই ঠাকুর সঙ্গ হয়, দূরে থাকিলে হয় না, এরূপ কথা নিশ্চয়ই কেহই বলিবেন না। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে দূরে থাকিয়াই বোধ হয় ঠাকুরের সঙ্গ অধিকতর সুষ্ঠুভাবে উপভোগ করা যায়। উপরে যে দুইটি ভক্তের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্তও এ বিষয়ে নির্ভুল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তৎসত্ত্বেও আমি বলিতে বাধ্য যে আমাদের অনেকের মনে এই বিষয়েও একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। প্রায় ১০ বৎসর পরের কথা। ঠাকুর তখন গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোডে প্রতাপবাবুর বাড়ীতে ছিলেন, সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে

দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কয়েকজন ভদ্র মহিলা ঠাকুরের নিকটে ছিলেন এবং ছোট ঘরখানিতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অন্যান্য সকলে বাহিরের বারান্দায় একখানি সতরঞ্চির উপর বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিলেন। আমিও যাইয়া তাহাদের সঙ্গে বসিলাম। শুনিলাম উপস্থিত এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অপর একজন বলিতেছেন : "দাদা, আপনি যে ঠাকুরের তল্পিবাহক হইয়া দাঁড়াইলেন, যেখানে ঠাকুর সেখানেই আপনি ; আপনি মহাভাগ্যবান।" দাদা সস্মিত মুখে একটু হাসিলেন, বুঝিলাম যে তিনি অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। আমার মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্টবুদ্ধি আসিল, ঐ ভদ্রলোককে লইয়া একটু কৌতুক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম : "ঠাকুরের তল্পি-বাহক হওয়াটাই যে ভাগ্যবানের লক্ষণ, তাহা আমার মনে হয় না। ঠাকুরের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়াও দূরে থাকা যায় এবং দূরে থাকিয়াও সর্ব্বদা নিকটে থাকা সম্ভবপর।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই উত্তরপাড়ার ভদ্রলোকের উল্লেখ করিলাম। একটু থামিয়া আবার বলিলাম যে আমার দিদিশাশুড়ী কাশীবাস করিতেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে পূজার ছুটির সঙ্গে আরও কিছুদিন ছুটি লইয়া আমি প্রায় তিন মাস সপরিবারে কাশীতে ছিলাম। ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার সেই দিদিমা বলিলেন যে তিনিও আমার সঙ্গে যাইবেন। আমি প্রথমটা যেন আকাশ হইতে পড়িলাম, পরক্ষণেই মনে হইল যে তিনি তামাসা করিতেছেন। কিন্তু না, কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়াই বুঝিলাম যে বৃদ্ধা বাড়ী ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প। আমি তাহাকে বলিলাম

যে এত কষ্ট করিয়া ছেলে ও মেয়েদের মত করাইয়া কাশী আসিয়াছেন; বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ বলিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন আবার সেই বিশ্বনাথকে ছাড়িয়া দেশে ফিরিতে চাহিতেছেন কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন: "যখন দেশে ছিলাম তখন কবে বিশ্বনাথ কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার কাছে টানিবেন, কবে তাঁহার পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিতে পারিব, দিবানিশি এই চিন্তাই করিতাম। আর এখানে আসিয়া ঠিক ইহার উল্টা হইয়াছে, বিশ্বনাথের কথা বড় একটা মনেও হয় না, দিবারাত্রি কেবল দেশের কথাই ভাবি। এই ধান পাকিবার সময় হইয়াছে, নিশ্চয়ই কিষাণরা উহাদিগকে ঠকাইবে, কোন্ ক্ষেতে কিরূপ ধান হইবার সম্ভাবনা উহারা তাহার কি জানে? আম পাকিলে পড়শীরাই সব চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, উহারা নিশ্চয়ই আটকাইতে পারিবে না, এরূপ কত চিন্তাই যে করি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এখন তুমিই বল, দেশে থাকিয়া বিশ্বনাথের চিন্তা করাই ভাল, না কাশী থাকিয়া দেশের চিন্তা করাই ভাল।" আমি সহসা এই কথার কোন সদুত্তর দিতে না পারিলেও তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলাম না। কিন্তু তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ছয় মাসের মধ্যেই দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানেই দুই বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হয়। আমার কথা শুনিয়া সেই "তল্পিবাহক" ভদ্রলোক "হ্যা, হ্যা" করিয়া একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন, বুঝিলাম যে তিনি অত্যন্ত চটিয়াছেন। পরে জানিতে পারিয়াছি যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি আমার প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, বৈকালে অনেকেই আসিয়া জুটিলেন এবং কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিল। একটা কথাই শুধু মনে আছে। কথাবার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। ইহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, পরে হয়তো আরও দু'একবার দেখিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তথাপি তাহার চেহারাটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে, কারণ ভদ্রলোকের এমন একটা আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়াছিলাম যাহা আর কখনও চোখে পড়ে নাই। ভদ্রলোকের বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা, মাথাটি ন্যাড়া, শুধু পিছন দিকে একটি পুরুষ্ট টিকি, গোঁফদাড়ি কামান, শুধু গা, পৈতাটি জ্বলজ্বল করিতেছে, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি এবং হাতে একখানা মোটা বেতের লাঠি। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলাম এই ভদ্রলোকের ট্যাঁকটি। ভিন্ন ভিন্ন খোপ করিয়া এই ট্যাঁকের মধ্যে তিনি রাখিয়াছিলেন একটি পকেট ঘড়ি, রাহা খরচের কিছু পয়সা, একটি নস্যির কৌটা, একটি ম্যাচবাক্স, একটি বিড়ির বাণ্ডিল, আরও জানি একটা কি, ঠিক মনে নাই। যাহা যখন প্রয়োজন হইতেছে, ক্ষিপ্রহস্তে বাহির করিতেছেন, আবার রাখিয়া দিতেছেন, অন্যান্য খোপগুলি ঠিক যেমন তেমনই থাকিতেছে, অদ্ভুত হাতের কৌশল। এই জন্যই তাহাকে একটুও ভুলি নাই।

এই ভদ্রলোক বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্মের উৎকর্ষ-অপকর্ষতা লইয়া এক প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাহার আলোচনা খানিকদূর অগ্রসর হইতেই বুঝিলাম যে তিনি বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি চাহিতেছিলেন

আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণবধর্ম্ম ও আনুষ্ঠানিক শাক্তধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা আলোচনা কিন্তু ঠাকুর সে ধার দিয়াও গেলেন না। কৃষ্ণ—কর্ষণ, আনন্দ; শিব—স্বভাব, আনন্দ; এই আনন্দকেই সূত্র ধরিয়া তিনি একটা একার্থমূলক ব্যাখ্যা করিয়া চলিলেন। ঠাকুরের কথাগুলি ঐ ভদ্রলোকের মোটেই পছন্দ হইতেছিল না, খানিক পরেই তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিছুক্ষণ পরে সভাও সে রাত্রির মত ভাঙ্গিয়া গেল।

৪

একটা জরুরি কাজ থাকায় ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রভাতবাবু আমার বাসায় রাত্রিযাপন করিতে পারিলেন না। প্রতাপবাবু, সুখলালবাবু প্রভৃতিও রাত্রি ১১টার মধ্যেই নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন, সুতরাং ঠাকুরকে একাকীই পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি দুইবার নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় কোথায় কি করিয়াছেন তাহা জানিবার একটা কৌতূহল স্বভাবতঃই মনে ছিল। আজ সুযোগ পাইয়া কথাটা ঠাকুরের নিকট উত্থাপন করিলাম। বরদাবাবুর নিকট আমি কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ঠাকুরের নিজ মুখে কথাগুলি না শোনা পর্য্যন্ত সুস্থির হইতে পারিতেছিলাম না। ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরবেই রহিলেন, পরে শুরু করিলেন কৌশিকাশ্রমের কথা। গুরু, ঠাকুর ও তাঁহার দুইজন গুরুভ্রাতা একত্রে হিমালয় ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঠাকুরের মুখে তাঁহার চারজন গুরুভ্রাতার কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তিনজনের নাম ছিল, যথাক্রমে বৃন্দারণ্য,

চৈতন্যভুক্ ও শঙ্করানন্দ ; চতুর্থ নামটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন হিমালয় ভ্রমণকালে কখন কখন ঠাকুরের সঙ্গী হইতেন, কোন দুইজন তাহা সঠিক বলিতে পারিব না। যাহাই হউক, গুরু তাঁহাদের লইয়া কৌশিকাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুর বলিলেন যে এই পথ অত্যন্ত দুর্গম, সাধারণ মানুষ সেখানে চলিতে পারে না। তুষারময় দেশ, কোন দিকেই আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। কয়েকটি যৌগিক বিভূতি আয়ত্ত করিতে না পারিলে, বিশেষতঃ দীর্ঘ সময়ব্যাপী কুম্ভক (নিশ্বাস-রোধ) অবলম্বন না করিলে সেই পথে চলা একেবারেই সম্ভবপর নহে। একস্থানে প্রায় ২৭ ঘণ্টাকাল তাঁহাদিগকে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কয়েক মাস চলিয়া তাঁহারা সেই আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন, তাঁহাদের তিনজনকে সেখানে রাখিয়া গুরু অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিলেন যে তাঁহারা সেখানে প্রায় ছয় মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। আশ্রমটি অতি মনোরম, তুষার মরুর মধ্যে যেন একটি অতি ক্ষুদ্র মরূদ্যান। আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা দেখিলেন যে সেখানে পাঁচটি আসন রহিয়াছে, দুইখানা খালি, আর তিনখানাতে তিনজন মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, মাংস একপ্রকার নাই বলিলেই চলে, চামড়া মুচড়াইয়া বুকের পাঁজরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাংস শুকাইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের চক্ষুগুলি কোটর প্রবিষ্ট কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল। প্রথম সাধুটির সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন যে তাঁহার অবয়ব এত দীর্ঘ ছিল যে ঠাকুর

যখন তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন তখন দেখিলেন যে উপবিষ্ট অবস্থায়ই তাঁহার উচ্চতা দণ্ডায়মান ঠাকুরের প্রায় সমান। ঠাকুর হাত তুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইলেন, তিনি সেই ভাবেই প্রত্যভিবাদন করিলেন, কোন কথা বার্ত্তাই হইল না। তাঁহারা তিনজনে এই তিনটি সাধুর সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনজনে মিলিয়া সারাদিন আশ্রমটি ঝাঁড়িয়া পুঁছিয়া রাখিতেন। আশ্রমের ধারেই পদ্মজাতীয় কয়েকটি ফুলের গাছ ছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রত্যেকে ঐ গাছগুলি হইতে একটি ফুল ও একটি পাতা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং সুদীর্ঘ বোঁটাটি ছিঁড়িয়া লইয়া ঐ পাতার উপরে সাধুদের সম্মুখে রাখিয়া একটু দূরে সরিয়া থাকিতেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেন যে পাতাগুলি ঠিকই আছে কিন্তু বোঁটা কয়টি নাই, সহজেই বুঝিতেন যে সাধুরা ঐ বোঁটাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে ৫।৬ মাস কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ একদিন গুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া ভিন্ন এক পথে যাত্রা সুরু করিলেন। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে গুরু তাঁহাদের হঠাৎ সেই আশ্রমে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন কেন? ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে দীর্ঘকাল অনাহারে থাকায় ঐ সাধু তিনটির শরীর পতনের উপক্রম হইয়াছিল। আসন ছাড়িয়া উঠিবার নিয়ম না থাকায় তাঁহাদের পক্ষে আহার্য্য সংগ্রহ করাও সম্ভবপর ছিল না। তখনও তাঁহাদের দেহত্যাগের সময় হয় নাই, ঐ দেহের আরও কিছু কাজ অসমাপ্ত রহিয়াছে, সেই জন্যই গুরু এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাঁচটি আসনের মধ্যে দুইটি খালি ছিল কেন,

এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে ঐ দুইজন কোনও বিশেষ প্রয়োজনে সংসারে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কার্য্য শেষ হইয়া গেলেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবেন।

গুরুর নেতৃত্বে আবার তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন যে যাইতে যাইতে একস্থানে তাঁহারা দেখিলেন যে সারি সারি বেদানার গাছ এবং তাহাতে অসংখ্য বেদানা ফলিয়া রহিয়াছে। কাঁচা, পাকা, সব রকমই আছে, কোন কোনটা বা এমন ভাবে ফাটিয়া রহিয়াছে যে ভেতরের রসাল দানাগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর গাছের তলায় যে কত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায় ৮।১০ মাইল রাস্তা এই বেদানা রাজ্যের ধার দিয়াই তাঁহাদের যাইতে হইয়াছিল। তাঁহারা কিছু বেদানা খাইয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে প্রয়োজন হয় নাই। আমি রহস্য করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলাম যে একবার যদি সেখানে যাইবার ও ফিরিবার রাস্তাটা ভাল করিয়া বাৎলাইয়া দিতেন তবে বোধ হয় দু'চার বৎসরের মধ্যেই বেদানার কারবার করিয়া একেবারে লাল হইয়া যাইতে পারিতাম। আমার কথায় ঠাকুর হাসিয়া উঠিলেন, কিছু বলিয়াছিলেন কিনা ঠিক স্মরণ নাই। যাহাই হউক, ইহার পর কিছুদূর চলিয়া তাঁহারা অপর একটি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই আশ্রমের নিশ্চিন্ত, শান্তিময় পরিবেশের কথা ঠাকুর বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। বাঘ, ভালুক, হরিণ, নীলগাই এখানে একত্রে বাস করিত, কেহ কাহাকেও হিংসা করিত না। আমরা নিজেরা হিংস্র, সুতরাং আমাদের পক্ষে

এরূপ একটা উদ্ভট কথা বিশ্বাস করিয়া উঠা সহজসাধ্য নহে। ঠাকুর কিন্তু বলিলেন যে নিজের ভিতরে হিংসা না থাকিলে মনুষ্যেতর জীবজন্তুরা হিংসা তো করেই না, বরং অনেক সময়ে আনুকূল্যই করে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার গত যাত্রায় বৃন্দাবন থাকাকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন।

বৃন্দাবনে তিনি বাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, হাঁটু দুইটি ফুলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়াছিল। এই বাতের আক্রমণে তিনি প্রায়ই ভুগিতেন এবং কি করিয়া যে এই রোগ তাঁহার দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল "বেদবাণী"র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তাহা সবিস্তারে বলিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। এ যাত্রায় আক্রমণ একটু বেশীই হইয়াছিল এবং শুশ্রূষা করিবারও কেহ সেখানে ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যখনই যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়া উঠিত তখনই কোথা হইতে এক বৃহদাকার হনুমান ঠাকুরের ঘরে ঢুকিয়া খানিকক্ষণ তাঁহার পদসেবা করিয়া যাইত এবং ঠাকুরের যন্ত্রণারও অনেকটা উপশম হইত। এমন কি কুঁজা হইতে গ্লাসে জল গড়াইয়াও ঠাকুরকে খাইতে দিত। ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিনই হনুমানটি ৩।৪ বার এই ভাবে আসা-যাওয়া করিত। কিন্তু ঠাকুর যেদিন রোগমুক্ত হইলেন সেদিন হইতে আর ইহাকে দেখা যায় নাই। যতদূর স্মরণ হয়, এই প্রসঙ্গেই ঠাকুর আমাকে দামিনী মা'র গল্পটি বলিয়াছিলেন। ভবানীপুর বকুলবাগানে কোনও এক মুখুয্যে পরিবারের একটি বাগান-বাড়ী ছিল, সেখানেই বাগানের এক

কোণে একখানা মাটির ঘরে এক ভদ্রমহিলা বাস করিতেন। ইনি ছিলেন ঠাকুরের একজন একনিষ্ঠ সেবিকা এবং ঠাকুর ইহাকে 'দামিনী মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দামিনী মা সপ্তাহে একদিন কি দুইদিন প্রাতঃকালে দুটি ভাতেভাত সিদ্ধ করিয়া খাইতেন, আর বাকি কয়দিন শুধু জল খাইয়াই কাটাইয়া দিতেন। ঠাকুর কখন কখন এই দামিনী মা'র নিকটে আসিয়া থাকিতেন। দামিনী মা'র দুইটি বিষধর কালসর্প ছিল, তাহারা এই ঘরেই থাকিত, এবং তিনি তাহাদের নামকরণ করিয়াছিলেন 'কানাই, নিতাই'। ঠাকুর বলিলেন যে যে-দিন দ্বিপ্রহরে রৌদ্র একেবারে ঝাঁঝাঁ করিয়া উঠিত এবং অসহ্য গরমে সকলকে অস্থির করিয়া ফেলিত, তখন এই কানাই নিতাই ধীরে ধীরে আসিয়া ঠাকুরের গায়ের উপর শুইয়া থাকিত। ঠাকুরকে এই গ্রীষ্মাতপের মধ্যে খানিকটা আরামে রাখাই যে তাহাদের উদ্দেশ্য, ইহা সহজেই বোঝা যাইত।

যাঁহারা ঠাকুরকে জানেন না, তাহাদের অনেকের নিকটেই হয়তো কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু মনুষ্যেতর জীবজন্তুদের সহিত ঠাকুরের যে একটা অন্তরঙ্গতা ছিল, তিনিও তাহাদের বুঝিতেন এবং তাহারাও তাঁহাকে বুঝিত, এ বিষয়ে আমার নিজের মনে কোন সন্দেহই নাই। কবিবর নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন : "সর্প দংশন করিতে, গরু মহিষ মারিতে আসিতেছে, আর রামঠাকুর বারণ করা মাত্র চলিয়া গিয়াছে।" আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতেই কবিবরের এই কথাটার সাক্ষ্য দিতে পারি। "বেদবাণী"র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমি

একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলাম, নিতান্ত প্রয়োজনবোধে আবার এইখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব। আমার দর্জ্জিপাড়ার বাসায় "মেজের উপর পাতা বিছানায় ঠাকুর বসিয়া আছেন, আমি ও আর একজন ভদ্রলোক পাশেই একখানা মাদুরের উপর বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি যে এক ভীষণ-দর্শন বিচ্ছু (কাঁকড়া-বিছা) বিছানার উপর উঠিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কোণে রক্ষিত একখানা লাঠি হাতে তুলিয়া লইলাম। ঠাকুর বলিলেন : 'মারিবেন না, ও কোন অনিষ্ট করিবে না।' মনে হইল যেন অঙ্গুলী সঙ্কেতে উহার নিষ্ক্রমণের পথ দেখাইয়া দিলেন এবং আমরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে ঠাকুরের অভিভাবিত পথেই বিচ্ছুটি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।" এই ঘটনার আনুমানিক এক বৎসর পরে ঠাকুর আমার সেই বীডন ষ্ট্রীটের মেসে আসিয়াছিলেন। বৈকালে আমাকে বলিলেন : "চলেন, একটু বেড়াইয়া আসি।" তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম এবং বিডন ষ্ট্রীট ধরিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া সেন্ট্রাল এভেনিউর মোড়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই রাস্তাটা তখনও ভালভাবে চালু হয় নাই, তথাপি ঠাকুর এই পথেই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন এবং খানিক দূর যাইয়া বাঁ হাতের একটা গলিতে ঢুকিয়া আবার পূর্ব্ব দিকে চলিতে লাগিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কিছুদূর আসিতেই "পালান, পালান, মোষ ক্ষেপেছে, মোষ ক্ষেপেছে", একাধিক ব্যক্তির এইরূপ মিলিত চিৎকার কানে আসিল। নিকটেই একটা সঙ্কীর্ণ গলি ছিল, আমি ঠাকুরকে

বলিলাম: "চলুন, এই গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়ি।" ঠাকুর বলিলেন: "কোন ভয় নাই, এখানেই দাঁড়াইয়া থাকেন।" আমি ঠাকুরের পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলাম, ভয় যে ছিল না এমন কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। আধ মিনিটের মধ্যেই দেখিলাম যে একটা প্রকাণ্ড মোষ শিং উচাইয়া ক্ষিপ্রবেগে ধাইয়া আসিতেছে। ঠাকুর একদৃষ্টে মোষটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই উহার গতি মন্থর হইয়া গেল। আমাদের নিকটে আসিয়া মোষটা একটু দাঁড়াইল, ঠাকুর উহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া গেল, ক্ষিপ্ততার আর কোন লক্ষণই তাহার মধ্যে দেখা গেল না।

এই দুইটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে ঠাকুরের সঙ্গে এই জন্তু জানোয়ারদের যে একটা বোঝাপড়া ছিল তাহা আমি অকপটে বিশ্বাস করি। ঠাকুরের মুখে শোনা যে দুইটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছি তাহাও আমার নিকট প্রত্যক্ষেরই সমতুল্য, সুতরাং এই বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। তথাপি পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে জানা আরও চারিটি ঘটনার উল্লেখ করিব। শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমানে পাহাড়তলী কৈবল্যধাম ও অন্যান্য তিনটি ধামের মোহান্ত মহারাজ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাহাকে পূর্ব্বাপর শ্যাম দা' বলিয়াই ডাকিয়া আসিয়াছি, সুতরাং এই নামেই তাহার উল্লেখ করিব। শ্যাম দা' একবার কাশীতে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে ঠাকুর

কাশী সহরের বাহিরে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন, অনেক কষ্টে খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্যাম দা' সেই বাড়ীটি বাহির করিলেন। শ্যাম দা' দেখিলেন যে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই স্ত্রীলোকটি সরিয়া গেলেন, শ্যাম দা' আর কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া একটা ভাঙ্গা সিঁড়ি ধরিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। সম্মুখেই একখানা ঘর, খোলা দরজার নিকট যাইতেই দেখিলেন যে ঠাকুর বসিয়া রহিয়াছেন এবং প্রকাণ্ড একটা সাপ ঠাকুরের সারা অঙ্গ জড়াইয়া তাঁহার ঘাড়ের উপর মাথাটি রাখিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। শ্যাম দা'কে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন: "আপনে এখানে কেন? শীগ্‌গির চলিয়া যান।" উত্তরে শ্যাম দা' বলিলেন যে ঠাকুরের খোঁজেই তিনি আসিয়াছেন এবং তখনই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একবার ঐ সাপের কথাটা জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলেন না। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন যে তাঁহার জ্বর হইয়াছে এবং নিকটে কেহই নাই দেখিয়া এই সাপটি আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। এই কথার পর শ্যাম দা' আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, দরজা হইতেই ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আরও একটি ঘটনার কথা শ্যাম দা'র মুখে শুনিয়াছিলাম। তিনি এবং আর একজন ভদ্রলোক ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া বিক্রমপুরে কোথায় যেন যাইতে-ছিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পর তাঁহারা দেখিলেন যে কিছু দূরে প্রকাণ্ড একটা বানর সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি আটকাইয়া দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে। এই অঞ্চলের বানরগুলি অত্যন্ত হিংস্র, কখন কখন মানুষ ধরিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, এরূপ খবরও শোনা যাইত, সুতরাং শ্যাম দা' এবং তাহার সঙ্গী সেই ভদ্রলোকটি স্বভাবতঃই একটু ভীত হইলেন। ঠাকুর কিন্তু বলিলেন যে কোন ভয়ের কারণ নাই, বানরটা কিছুই করিবে না এবং আগাইয়াই চলিলেন। ঠাকুর ঐ বানরটির নিকটে আসিতেই শ্যাম দা' ও তাহার সঙ্গী সেই ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং পরে ধীরে ধীরে একদিকে চলিয়া গেল। তৃতীয় দৃষ্টান্তটি পাইয়াছি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে। ঠাকুর তখন ডিঙ্গামাণিকে তাঁহাদের বাড়ীতে ছিলেন। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজার ব্যবস্থা ছিল, তিনি আসিয়া ঠাকুরকে ধরিলেন যে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহাকেও একবার ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতে হইবে। ঠাকুর স্বীকৃত হইলেন এবং সেই দিন সন্ধ্যার সময় দুইজন ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া সেই ভদ্রলোকের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। সেখানে যাইতে হইলে একটি ছোট মাঠ পার হইয়া যাইতে হইত। এই মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ ঠাকুরের পা এক সাপের গায়ে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক ভীষণ গোক্ষুর ফণা তুলিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল। সমভিব্যাহারী ভদ্রলোক দুইটি ভয়ে দূরে সরিয়া গেলেন, ঠাকুর কিন্তু দাঁড়াইয়াই রহিলেন এবং মৃদুস্বরে সেই সাপকে বলিলেন: "আমি না জানিয়া তোমাকে ব্যথা দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর।" এই কথার পর সাপটা

ফণা নামাইয়া ধীরে ধীরে একদিকে চলিয়া গেল। চতুর্থ ঘটনাটি আমি স্নেহভাজন কেশবের (বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীকেশবচন্দ্র গুহ, ইনি রেলবিভাগে চাকুরী করেন) মুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর চৌমুহনি থাকাকালীন কেশব একবার তিন দিনের ছুটি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। সে যেদিন সেখানে পেঁছায় তার পরের দিন বিকাল বেলা হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ রবে ভীষণভাবে চিৎকার সুরু করিয়া দিল। কুকুরটি ঠাকুরের নিকট ঐ বাড়ীতেই থাকিত। নিতান্ত শান্তশিষ্ট কুকুর, হঠাৎ তাহার এই চিৎকারের কারণ কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কুকুরের এই কর্ণভেদী ঘেউ ঘেউ আর্ত্তনাদ প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া চলিল এবং উপস্থিত সকলেই অস্থির হইয়া উঠিলেন। ঠাকুর তখন তাঁহার ঘরে খাটে চিৎ হইয়া বুকের উপর হাত ছুটি রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। মেজেতে সতরঞ্চির উপর কয়েক জন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, কেশবও সেইখানেই ছিল। হঠাৎ দেখা গেল যে কুকুরটি দরজার নিকটে আসিয়া এক লাফে ভদ্রলোকদের ডিঙ্গাইয়া ঠাকুরের খাটের কাছে আসিল এবং সম্মুখের পা ছুটি খাটের উপর তুলিয়া ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কেশব আমাকে বলিয়াছে যে তাহার স্পষ্টই মনে হইয়াছিল যে কুকুরটি যেন ঠাকুরের কাছে কোন একটা নালিশ জানাইতেছে। ২।৩ মিনিট এই ভাবে থাকিয়া কুকুরটি আবার ভদ্রলোকদের ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরও উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন: "এখানে পশুর ডাক্তার পাওয়া

যায় না?" উপস্থিত একজন ভদ্রলোক বলিলেন: "না বাবা, এখানে পাওয়া যায় না, নোয়াখালীতে পাওয়া যায়।" ইহার পর ঠাকুর সেখানকার তত্ত্বাবধায়কদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: "আপনারা কিছুই দেখেন না, ওকে একটু যত্ন করবেন, যা-তা খাইতে দিবেন না। শজনা ডাঁটা খাইতে দিয়াছিলেন, সেই ডাঁটা ওর গলায় আটকাইয়া গিয়াছিল।" ঠাকুরের এই কথার পরেই ধীরে ধীরে কুকুরের সেই চিৎকার থামিয়া গেল। এতগুলি লোকের মধ্যে একমাত্র ঠাকুরই যে একটা উপায় করিয়া দিতে পারেন, কুকুর তাহা বুঝিল এবং তাহার আবেদনের মর্ম্ম বুঝিয়া লইতে ঠাকুরেরও বিলম্ব হইল না।

এই জাতীয় আরও কয়েকটি ঘটনা আমার জানা আছে কিন্তু তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে না পারায় এখানে সেগুলির কোন উল্লেখ করিলাম না। যাহাই হউক, যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ঠাকুরের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীব জন্তুদের একটা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল কিন্তু বিষয়টা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ঠাকুরের সঙ্গে এই কথাটা লইয়া আলোচনা করিবার সুযোগ আমি একাধিকবার পাইয়াছি এবং তাঁহার কথার ভাবে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে এইখানে বলিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঠাকুর বলিতেন যে নিজের মধ্যে হিংসা না থাকিলে অপরেও হিংসা করে না। একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিয়াছিলেন যে "প্রাণে"র সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া লইতে পারিলে সকল "প্রাণী"ই আত্মীয় হইয়া যায়, কাহারও সহিত আর কোন বাদ-বিসম্বাদ থাকে না। প্রাণ

মূলতঃ এক, আধার-ভেদে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। যেমন ইলেকট্রিক বাল্‌ব নানা প্রকারেরই হইতে পারে, ৫, ১০, ৫০, ৬০, ১০০, ৫০০, ১০০০ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির হইতে পারে, রঙও সাদা, লাল, হলুদ প্রভৃতি নানা রকমের হইতে পারে, কিন্তু যে-বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে ইহারা জ্বলে তাহা একই, প্রাণও ঠিক তদ্রূপই। বিভিন্ন জীবে আবরণ-ভেদে পৃথক বলিয়া মনে হইলেও বস্তুটি এক এবং এই প্রাণকে স্বরূপতঃ বুঝিতে পারিলে যাবতীয় প্রাণীকেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাই মিত্রভাবের ভিত্তি। একখানি পত্রে ঠাকুর লিখিয়াছিলেন: "মিত্রভাব সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব দর্শন, ঈশ্বরকে ভালবাসা, সকলের মধ্যেই আত্মার মত অর্থাৎ আপন শরীরে যেমন সুখদুঃখ অনুভূতি হয়, তদ্রূপ পরদেহে আপন দেহের মতন সুখদুঃখ বোধ করিতে পারিলে মিত্রভাব হয়। ইহাই প্রেম বলে, পরহিতে রত ইহাই মিত্রভাব। ইহাই যদি স্থায়ী হয় তাতেই সর্ব্বদা মিত্রভাবে ভগবানকে পায়।" (বেদবাণী দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬নং) প্রকৃত অহিংসারও ইহাই বনিয়াদ; বলা বাহুল্য যে অধুনা প্রচলিত অহিংসার সঙ্গে ইহার কোনও সম্পর্ক নাই।

সে যাহাই হউক, পরের দিন প্রাতঃকালে আবার অনেকে আসিয়া জুটিলেন। এক জনের কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ইনি একজন পাঠক, ভাগবত পাঠ এবং কথকতাই ইহার উপ-জীবিকা ছিল। আমি ইহাকে চিনিতাম এবং ইতিপূর্ব্বে দু'তিন জায়গায় আমি ইহার ব্যাখ্যাও শুনিয়াছিলাম। এই ভদ্রলোক সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং পরে অত্যন্ত বিনীতভাবে

বলিলেন : "পেটের দায়ে ভাগবত শুনাই, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে ইহাই আমার পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি, বাপ দাদাও করিয়া গিয়াছেন, আমিও করিতেছি। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এই যে অপরাধ করিতেছি, ইহার কি মার্জ্জনা নাই?" ঠাকুর বলিলেন : "বৃত্তি হিসাবে ভাগবত পাঠে অপরাধ হয় না, অপরাধ হয় পাটোয়ারীতে।" আর কোনও কথা হইল না। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক উঠিলেন এবং আমিও তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিলাম। তিনি তামাক খাইতেন জানিতাম, সুতরাং তামাকের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিলাম। পাঠক মহাশয় বলিতে লাগিলেন যে ঠাকুরের কথায় আজ তাহার ঘাড় হইতে মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গিয়াছে। তাহার ভাগবত পাঠে যে নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, ইহা তাহার অবিদিত নাই এবং এজন্য নিজেকে সর্ব্বদাই নিতান্ত অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতেন। কিন্তু আজ ঠাকুরের কথায় তিনি আশ্বস্ত হইয়াছেন এবং তাহার মন হালকা হইয়া গিয়াছে। একটু পরে আমাকে বলিলেন : "কিন্তু পাটোয়ারীর কথা ঠাকুর কি বলিলেন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।" আমি তাহাকে বলিলাম যে মিথ্যা আচরণকেই ঠাকুর বলেন পাটোয়ারী। তাহাদের অর্থাৎ পাঠকশ্রেণীর ব্যক্তিদের পক্ষে পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে সজাগ থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ব্যবসার খাতিরে এবং পরিস্থিতির চাপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খানিকটা পাটোয়ারী তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বেড়ান এবং লোকে স্বভাবতঃই

মনে করে যে যে-উপদেশ তাঁহারা বিতরণ করিতেছেন, তাহার অন্ততঃ কিছুটা নিশ্চয়ই তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছেন। ব্যাসাসনে যাঁহারা বসেন তাহাদের প্রতি লোকের মনে স্বভাবতঃই একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠে এবং এই শ্রদ্ধা কার্য্যের দ্বারা অভিব্যক্ত করিতেও তাহারা কার্পণ্য করে না, প্রণামের ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়, উপঢৌকনের ভিড় জমিয়া উঠে। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে পাটোয়ারী বর্জ্জন করিয়া চলা অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়ে এবং এই বিষয়ে সাবধান হইতেই ঠাকুর তাহাকে বলিয়াছেন। পাঠক মহাশয় আমার কথার সারবত্তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন এবং একটু পরেই বিদায় লইলেন। ইহার ঘণ্টাখানেক পরে ঠাকুরও অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

১

আমার অগ্রজ ৺ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে আমতায় মুনসেফ্ ছিলেন। আমার নিকট ঠাকুরের কথা শুনিয়া তিনি কিছুদিন যাবৎ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন যে একবার যেন সুযোগ মত তাঁহাকে আমতায় লইয়া যাই। বৌদিও ঠাকুরকে একবার দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে এবার ঠাকুর কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে একবার আমতায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিব। যতদূর স্মরণ হয়, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে ঠাকুর কলিকাতায় আসিলেন এবং মতিবাবুর ডিক্সন লেনের বাসায় উঠিলেন। সংবাদ পাইয়া সেই দিন বৈকালেই ঠাকুর দর্শনে আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে আসর বেশ গুলজার, মতিবাবু, প্রভাতবাবু, বরদাবাবু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন কিন্তু বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। তিনি যুক্তাসনে মেরুদণ্ড টান করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। কথাবার্ত্তা যাহা কিছু তিনিই বলিতেছেন, ঠাকুর মাঝে মাঝে শুধু এক আধবার "হাঁ, না," করিতেছেন মাত্র। অনুসন্ধানে জানিলাম যে তিনি বহুদিন হইতেই ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত, ছুটি লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন, কর্ম্মস্থলে ফিরিবার পথে ২।৪ দিনের জন্য কলিকাতায় আছেন এবং ঠাকুরের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে

দেখা করিতে আসিয়াছেন। ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তার ধরণটা কিন্তু আমার মোটেই পছন্দ হইল না। তিনি বলিতেছিলেন যে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইয়া তাহার একজন সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, অতি উঁচু দরের লোক, এবং তাহার উপদেশাবলীও তেমনই সারগর্ভ। এই উপদেশের কিছু কিছু তিনি উদ্ধৃত করিতেছিলেন এবং চারিদিকে তাকাইতেছিলেন, ভাবটা যেন এই যে এ সকল অতি উচ্চস্তরের কথা, তোমাদের জন্য নয়, একমাত্র ঠাকুরই যদি কিছুটা বুঝিয়া উঠিতে পারেন। শীঘ্রই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম এবং এক সুযোগে বাহিরে চলিয়া গেলাম। বরদাবাবুও আমার সঙ্গে আসিলেন, সিগারেট ধরাইয়া ছাদের এক কোণে যাইয়া বসিলাম। বরদাবাবু বলিলেন: "দেখলেন লোকটার অবস্থা, অহঙ্কারে এত ফুলিয়াছে যে এখন ফাটিলেই হয়।" কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম অন্য কথা। এই ভদ্রলোক ঠাকুর ও আমাদের সম্মুখে তাহার সেই নব পরিচিত সাধুটির এবং তৎসঙ্গে আরও দু'চার জনের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছিলেন কেন? আমার সেই উকীলবাবুর কথা মনে পড়িয়া গেল; তবে তফাত এই যে উকীলবাবু আমার সহিত আলাপ আলোচনায় অন্যান্য সাধুদের কথা তুলিয়া প্রকারান্তরে ঠাকুরকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন, আর ইনি ঠাকুরের সম্মুখেই অনুরূপ প্রয়াস পাইলেন। কথাটা অত্যন্ত রূঢ় শুনাইতেছে এবং কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে আমি মনগড়া একটা কিছু ধরিয়া লইয়া তিলকে তাল করিয়া অযথা ভদ্রলোকের উপর দোষারোপ করিতেছি। কিন্তু কথাটা আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য এবং

সেই জন্যই ইহা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিলাম না। পরে এই ভদ্রলোকের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং তিনি ঠাকুরের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একবার বলিয়াছি, আবারও বলি যে অহঙ্কারাত্মিকা বুদ্ধি লইয়া ঠাকুরকে যাচাই করিতে আসিয়া কাহারও কোন লাভ হইতে দেখি নাই, বরং কেহ কেহ ঠাকুরের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন কাঁচের আয়নার মত, যেরূপ ভাব লইয়া তাঁহার নিকট যাওয়া যাইত, সেরূপ ভাবই তাঁহাতে প্রকাশ পাইত।

সেদিন আর ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ হইল না। পরের দিন ছুটি ছিল, প্রাতঃকালেই আসিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। বরদাবাবু পূর্ব্বেই আসিয়া জুটিয়াছিলেন। একবার আমতায় আমার দাদার বাসায় যাইবার কথা বলিতে ঠাকুর অতি সহজেই সম্মত হইয়া গেলেন এবং তখনই স্থির হইল যে পরের দিন প্রাতঃকালে ৭টার ট্রেণে মতিবাবু, বরদাবাবু ও আমি ঠাকুরকে লইয়া আমতা রওনা হইব। নির্দ্দিষ্ট সময়ে উটরাম ঘাট হইতে খেয়ায় গঙ্গা পার হইয়া তেলকলঘাট ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ীতে চাপিলাম। বর্ত্তমানে হাওড়া-আমতা লাইনে তেলকলঘাট ও হাওড়া ময়দান, এই দুইটি ষ্টেসন উঠিয়া গিয়াছে, কদমতলা যাইয়া ট্রেণে উঠিতে হয়। এই লাইনে কোন দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল না, মধ্যম শ্রেণীতে অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া আমরা প্রথম শ্রেণীর কামরা খানাই অধিকার করিয়া বসিলাম। ছোট লাইন এবং তদুপযোগী ছোট্ট একখানা প্রথম শ্রেণীর কামরা, কিন্তু

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আর কোন যাত্রী না থাকায় আমরা আরামেই বসিলাম। দাদা আমতা থাকাকালীন এই গাড়ীতে আমি বহুবার যাতায়াত করিয়াছি এবং সেই ছোট লাইনের অভিনবত্ব এখনও মনে দাগ কাটিয়া রহিয়াছে। গতি ৫ হইতে ১০ মাইলের মধ্যে, হেলিয়া দুলিয়া গাড়ীখানা চলিয়াছে, মাঝে মাঝে অসম্ভব ঝাঁকানি, সকালে-বিকালে ডেলী প্যাসেঞ্জারের ভিড় এবং তাহাদের সেই মামুলী কথাবার্ত্তা, সকল কথাই মনে পড়িতেছে। রেলের রাস্তাটিও অভিনব, কাহারও বৈঠকখানার ধার দিয়া, কাহারও রান্নাঘরের পিছন দিয়া, কখনও বা কাহারও বাহিরের উঠানের মধ্য দিয়াই আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটা জায়গার কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। রাস্তাটা সেখানে দুইটি ময়রার দোকানের একেবারে কোল ঘেঁষিয়া গিয়াছে, যখনই গাড়ীটা সেই জায়গাটা অতিক্রম করিয়া যাইত, তখনই মনে হইত যে হাত বাড়াইলেই বোধ হয় একটা রসগোল্লা বা দুইখানা জিলিপি তুলিয়া লওয়া যায়। আর একটা কথাও স্পষ্ট মনে আছে। মুন্সীরহাট ষ্টেসনে আসিলেই ফেরিওয়ালার ডাক শুনিতাম "রম্ভা, চাই রম্ভা"; এখানে আসিলেই চলতি "কলা" কথাটা হঠাৎ কি করিয়া বিশুদ্ধ "রম্ভায়" পরিণত হইয়া যাইত, তাহা বলিতে পারিব না।

যাহা হউক, গাড়ী চলিতে লাগিল এবং আমি ও মতিবাবু প্রায় প্রতি ষ্টেসনেই প্ল্যাটফরমে নামিতে লাগিলাম। কিন্তু অধিকাংশ ষ্টেসনেই গাড়ী দু'এক মিনিটের বেশী না থামায় আরাম করিয়া সিগারেট খাওয়া হইল না। দু'চারটি টান দেই, আবার

নিভাইয়া ফেলি, এইরূপই চলিতে লাগিল। হঠাৎ ঠাকুর বলিয়া বসিলেন: "বার বার উঠা নামা করার দরকার কি, ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া গাড়ীতেই সিগারেট খান।" আমরা উভয়েই অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম এবং ঠাকুর আরও দু'এক বার বলা সত্ত্বেও দাদার বাসায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে আর সিগারেট খাইলাম না। ব্যাপারটা সামান্য মনে হইতে পারে কিন্তু ঠাকুর যে আমাদের সঙ্গে কি ভাবে চলিতে চাহিতেন তাহার কতকটা আভাস এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কচিৎ কখন ইহার ব্যতিক্রম হইলেও সাধারণতঃ ঠাকুরের সঙ্গে নিজের একটা উল্লেখযোগ্য দূরত্ব কখনও অনুভব করি নাই। গুরু-শিষ্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাঁহার সহিত সেরূপ একটা সম্বন্ধ অন্ততঃ আমার কোন দিনই গড়িয়া উঠে নাই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িতেছে। তখন ঠাকুর আমার ৫৬ সি, বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় ছিলেন। একদিন সকালবেলা আমি ও ঠাকুর আমার বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিয়াছি এমন সময় আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঠাকুরকে চিনিতেন না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "ইনি কে?" আমি হঠাৎ কিছুই বলিতে না পারিয়া কি করিব ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে ঠাকুর নিজেই বলিলেন: "ইন্দুবাবু আমার আত্মীয়।" এই কথার উপর ভদ্রলোক আর কিছু বলিলেন না, আমার নিকট যে কাজে আসিয়াছিলেন তাহা সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। আমাদের সম্পর্কে ঠাকুরের মুখে শিষ্য কথাটা কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি আমাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচিত

করিলেন, ইহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে আমি জানিনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার সহিত আমার যে-সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার মূলে ছিল প্রীতি এবং এই প্রীতিকে ভিত্তি করিয়া তিনি কখন পিতা, কখন সখা এবং কখন বা পুত্রের মত ব্যবহার করিতেন; আমার বিশ্বাস যে নিতান্ত বন্ধুভাবেই তিনি আমাদিগকে গাড়ীর মধ্যেই সিগারেট খাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের নিজেদের দুর্ব্বলতার দরুণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারি নাই। জীবনে এমন দু'চার বার হইয়াছে যে স্থানাভাবে ঠাকুরের সঙ্গেই এক বিছানায় শুইয়াছি। তাঁহার গায়ে পা লাগিয়া যাইবে—এই আপত্তি তুলিয়া অন্যত্র শুইতে চাহিয়াছি, "ওতে কোন দোষ হয় না" বলিয়া ঠাকুর আমাকে নিরস্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভাল ঘুমাইতে পারি নাই, মনে মনে একটা শঙ্কা থাকিয়াই গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কত কথাই না মনে পড়িতেছে। একদিন ঠাকুরের সঙ্গে হেদোতে একখানি বেঞ্চে বসিয়া আছি, এক চিনেবাদাম-ওয়ালা যাইতেছে দেখিয়া ঠাকুর আমাকে দুই পয়সার চিনেবাদাম কিনিতে বলিলেন, পরে ঠোঙ্গাটি আমাদের দুইজনের মাঝখানে রাখিয়া নিজেও দুটি একটি খোসা ছাড়াইয়া খাইতে লাগিলেন এবং আমাকেও খাইতে বলিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত আমিও খাইতে লাগিলাম, তবু কেন জানি না, ঠাকুরের সঙ্গে এক পাত্র হইতে খাইতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। ঠাকুরের যে চিনাবাদাম খাওয়ার কোন প্রয়োজন হইয়াছিল এমন কথা উঠিতেই পারে না, শুধু আমাকে একটু নিকটে টানিবার

জন্যই ঠাকুর এই অভিনয় করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বলিতে-ছিলাম যে ঠাকুর যেরূপ ব্যবহার করিতেন এবং যেরূপ ব্যবহার চাহিতেন, নিজের দুর্ব্বলতা ও সংশয়ের জন্য সেরূপ ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারিতাম না। একটা কাহিনী মনে পড়িতেছে। একদিন ভাগবত পাঠ শুনিতে গিয়াছিলাম, পাঠক মহাশয় বলিতেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরায় রুক্মিণী, সত্যভামা ইত্যাদিকে লইয়া রাজত্ব করিতেছেন। একদিন সত্যভামা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন : "শুনিয়াছি যে তুমি বৃন্দাবনে ব্রজগোপীদিগকে লইয়া রাসনৃত্য করিয়াছিলে। আমাদেরও নিতান্ত ইচ্ছা যে আমাদের লইয়া এখানেও তুমি সেই রাসনৃত্য কর।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন : "বেশ, তাহাই হইবে", এবং একটি রাত্রি স্থির করিয়া নৃত্যোপযোগী ব্যবস্থা করিবার আদেশ জারি করিলেন। নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে নৃত্য আরম্ভ হইল কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। একটু পরেই মহিষীরা বলিতে লাগিলেন : "এ কেমন নৃত্য! তোমার গায়ে পা লাগে যে!" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন : "তাহাতো লাগিবেই, এই নৃত্যের উহাই বিধি।" এই কথা শুনিয়া মহিষীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং "তাহা হইলে এই হতচ্ছাড়া নৃত্যে আমাদের প্রয়োজন নাই" এই কথা বলিয়া নৃত্য থামাইয়া দিলেন। ঠাকুরও আমাকে নানাভাবে তাঁহার অতি নিকটে টানিয়া লইতে চাহিয়াছেন কিন্তু কৃষ্ণমহিষীদিগের যেমন হইয়াছিল সেইরূপ সংস্কার ও সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিয়াছে, আমি ঠাকুরের অভিপ্রেত পথে অগ্রসর হইতে পারি নাই।

এই বিষয়টিকে আরও সবিস্তারে আলোচনা করিবার যথেষ্ট

উপকরণ আমার কাছে আছে কিন্তু আপাততঃ শুধু আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াই ইহার উপসংহার করিব। এই সময়ের সম্ভবতঃ প্রায় বৎসরাধিক পরের ঘটনা, একদিন বৈকালে পঞ্চুবাবু ঠাকুরকে লইয়া আমার সেই বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় আসিয়া উপস্থিত। পঞ্চুবাবুর বাড়ী ছিল হুগলী জেলার জিরাট নামক গ্রামে কিন্তু তিনি মানুষ হইয়াছিলেন ধুবড়ীতে। সেখানে তাহার পিতা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্ত্তমানের নবম শ্রেণী) পড়িতেন তখন সন্ত্রাসবাদীদিগের সহিত তাহার সংযোগ আছে সন্দেহে পুলিশ তাহার পিছনে লাগে। তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেইখানেই তাহার লেখাপড়ার ইতি হইয়া যায়। ইতিমধ্যে তাহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনিও অনেকটা স্বাধীন ভাবে বিচরণ আরম্ভ করেন। কালক্রমে তিনি এক তান্ত্রিক সাধুর সহিত সংশ্লিষ্ট হ'ন এবং তাহার উপদেশ মত যোগাদি অভ্যাস করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইয়া তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হ'ন। খুব সম্ভব ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের কোনও এক সময়ে পঞ্চুবাবু তাহার মাকে লইয়া কাশী গিয়াছিলেন, সেইখানেই ঘটনাচক্রে ঠাকুরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া যায়। ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত কিছুকাল চলিবার পরই তাহার রোগ সারিয়া যায় এবং তিনিও ঠাকুরের একজন ঐকান্তিক সেবক হইয়া পড়েন। আমার ঠাকুরের সহিত পরিচয়ের প্রথমাবস্থায় পঞ্চুবাবুকে কিছুদিন ঠাকুরের তল্পিবাহকরূপে দেখিয়াছিলাম। ঠাকুর যেখানেই যাইতেন পঞ্চুবাবুও পিছনে পিছনে ঠাকুরের গাঁটরিটি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন।

আমি জানিতাম যে পঞ্চুবাবু ঠাকুরকে লইয়া নৈনিতাল গিয়াছেন, এখন বলিলেন যে বৃন্দাবন হইতে ফিরিতেছেন। এই দুরন্ত গরমে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে পঞ্চুবাবু বলিলেন যে প্রথমে তিনি ঠাকুরকে লইয়া নৈনিতালই গিয়াছিলেন, সোহং স্বামীর আশ্রমে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ২।৩ দিন পরেই ঠাকুর আর সেখানে থাকিতে সম্মত না হওয়ায় অন্য একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে চলিয়া যান। মধ্য ভারতের কোনও এক করদরাজ্যের রাজা এই সময়ে সস্ত্রীক নৈনিতালে অবস্থান করিতেছিলেন, ইহারা স্বামী স্ত্রী, কি জানি কেন, ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাণী নিয়মিত দুইবার এবং রাজা অন্ততঃ একবার ঠাকুর দর্শনে আসিতে লাগিলেন। ফলমূলাদির উপঢৌকনও নিয়মিতই আসিত, ঠাকুর তাহা স্পর্শও করিতেন না, পঞ্চুবাবু সারাদিন বারে বারে আকণ্ঠ খাইতেন কিন্তু তথাপি বেশীর ভাগই পড়িয়া থাকিত এবং সেগুলি বিলাইয়া দেওয়া হইত। কিছুদিন এইভাবে কাটিবার পর রাণী একদিন ঠাকুরকে বলিলেন: "আভি আপ বুড্‌ঢা হো গয়া, ইধার উধার ঢুঁড়নেকা বক্‌ত ই নেহি হ্যায়। মেরা রাজ্যমে চলিয়ে, একঠো বঢ়িয়া আশ্রম বনা দুঙ্গি, মজেমে রহ্‌ যায়েঙ্গে।" উত্তরে ঠাকুর নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন: "আশ্রম তো হিয়েই হ্যায়।" সেই দিনই ঠাকুর পঞ্চুবাবুকে বলিলেন: "রাণী কাণী দিয়া আমাগো কাম নাই, কালই চলেন অন্যখানে যাই।" ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত ইহার পরের দিনই পঞ্চুবাবু তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবন রওয়ানা হইয়া আসিলেন।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি, বৃন্দাবনে দুরন্ত গরম। নৈনিতালের ঠাণ্ডা আবহাওয়া হইতে আসিয়া পঞ্চুবাবুর পক্ষে এই গরম অসহনীয় হইয়া উঠিল। ঠাকুর কিন্তু যেমন তেমনই আছেন, নৈনিতালেও যা, আর বৈশাখ মাসের বৃন্দাবনেও তা। একতলায় একখানি ঘর ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, সঙ্গেই একটি ছোট রান্নাঘর ছিল। রান্নাঘরের পাশেই কূয়া, জল তুলিবার জন্য একটি লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। পঞ্চুবাবু বলিলেন যে ভোরবেলা শৌচাদি সমাপন হইয়া গেলেই ঠাকুর তাহাকে যমুনায় স্নান করিতে পাঠাইয়া দিতেন। পঞ্চুবাবুরও ইহাতে আপত্তি করিবার উপায় ছিল না; কারণ একটু বেলা হইলেই বালু এমন তাতিয়া যাইত যে ঘরের বাহির হওয়া সম্ভব হইত না, মনে হইত যেন আগুনের ঝলকা বহিয়া যাইতেছে। যমুনা হইতে ফিরিয়া পঞ্চুবাবু দেখিতেন যে ঠাকুর ইতিমধ্যে উনান ধরাইয়া তরকারী রাঁধিয়াছেন, শাক ভাজিয়াছেন, এবং হাড়িতে ভাত চড়াইয়া দিয়াছেন। চালের সঙ্গে কিছু ডালও পুঁটুলি বাঁধিয়া হাড়িতে ফেলিয়া দিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যহই হইত, ঠাকুর পঞ্চুবাবুর কোন আপত্তি আমলেই আনিতেন না। পাছে তাহার কোন অসুবিধা হয় এই জন্যই ঠাকুর তাঁহার নিজের আহারটি অত্যন্ত সরল করিয়া লইয়াছিলেন, ৪টি খেজুর, ৪টি মনক্কা ও তিন চার গ্লাস জল খাইয়াই কাটাইয়া দিতেন। গরমের দরুণ ৮টা ৮-৩০টার ভিতরেই স্নানাহার শেষ করিয়া ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ভিতরে বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে হইত, রাত্রি ৮টার পূর্ব্বে বাহিরে যাওয়া সম্ভব হইত না। পঞ্চুবাবু কখন বা বসিয়া,

কখন বা শুইয়া, কখন বা ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলিয়া সময়টা কাটাইয়া দিতেন। ঘুম বড় একটা হইত না, মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসিত। কিন্তু যখনই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত তখনই দেখিতেন যে ঠাকুর পাখা লইয়া তাহাকে হাওয়া করিতেছেন, অথবা ভিজা গামছা দিয়া সযত্নে তাহার গা মুছাইয়া দিতেছেন। পঞ্চুবাবু উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, ঠাকুরের এই সেবাও তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন না, অথচ ঠাকুরকে ফেলিয়া চলিয়াও যাইতে পারেন না, নিতান্ত অস্বস্তিতে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। পঞ্চুবাবু আমাকে বলিয়াছেন যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেন। ঠাকুরকে এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী অনেক সুকৃতিবলেই তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার ভাগ্যদোষে কিছুই হইল না। একদিন কিন্তু ঠাকুরের আচরণ পঞ্চুবাবুর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। যে ভৃত্যটিকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল সে সকালে তিন বালতি ও সন্ধ্যার পর তিন বালতি জল তুলিয়া দিয়া যাইত। ইহাতেই সব কাজ সমাধা করিতে হইত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ীওয়ালার পুত্র আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল যে ভৃত্যটি অসুস্থ, সে আসিতে পারিবে না, সুতরাং জল তোলার ব্যবস্থা নিজেদেরই করিয়া লইতে হইবে। রাত্রিতে রান্নার হাঙ্গামা ছিল না, বাজার হইতে পুরী তরকারী ও কিছু মিষ্টি আনিয়াই পঞ্চুবাবু চালাইয়া দিতেন। অনুসন্ধানে দেখিলেন যে তখনও কলসীতে ও একটা বালতিতে যে পরিমাণ জল আছে তাহাতে রাত্রিটা অনায়াসেই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে, সুতরাং স্থির করিলেন যে রাত্রে আর জল তুলিবেন না, প্রাতঃকালে ভৃত্য

আসে ভাল, নতুবা নিজেই যাহা হয় করিবেন। ঠাকুরকেও এই কথা জানাইলেন। ইহার খানিক পরে পঞ্চুবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং যমুনার তীরে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া, রাত্রির খাবার কিনিয়া ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন। একটু পরেই হঠাৎ তাহার বালতিগুলির দিকে নজর পড়িল, তিনি দেখিলেন যে তিনটি বালতিই জলে ভর্ত্তি হইয়া আছে। কর্ম্মটি যে ঠাকুরের তাহা বুঝিতে পঞ্চুবাবুর কোন কষ্টই হইল না। ঠাকুরের দিকে তাকাইতেই তিনি যেন কাঁচুমাচু হইয়া গেলেন। পঞ্চুবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে কোনও বালক দুষ্কর্ম্ম করিয়া ধরা পড়িয়া গেলে শাস্তির ভয়ে যে ভাবে তাকাইয়া থাকে ঠাকুরও যেন ঠিক সেই ভাবেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু পঞ্চুবাবুর তখন মাথা গরম, এই মধুর ভাবটি তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না। ঠাকুরকে বলিলেন: "এই জল কোন কাজে লাগবে, আমার শ্রাদ্ধে, না আপনার শ্রাদ্ধে?" এই বলিয়া বালতির জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নিজে জল তুলিয়া রাখিলেন। পরের দিনই ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতা রওয়ানা হইলেন এবং হাওড়া পৌঁছিয়া আমার বাসায় আসিয়া উঠিলেন।

রাত্রে খাইতে বসিয়া পঞ্চুবাবু এই ঘটনাটি আমাকে জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে প্রথমে তিনি ঠাকুরের হাতের রান্না খাইতে কিছুতেই সম্মত হ'ন নাই কিন্তু ঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে তিনি স্নান সারিয়া আসিয়া রান্না করিতে বসিলে সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে উহা সমাধা করিয়া উঠা সম্ভব হইবে না। ঠাকুর নিজে তো বসিয়াই থাকেন, সুতরাং

রান্নার কাজটা তিনি যদি খানিকটা আগাইয়া রাখেন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুব্যবস্থা হয়। পঞ্চুবাবু মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে শীঘ্রই পাচক নিযুক্ত করিবেন। কোনও ফল হইবে না বুঝিয়া প্রকাশ্যে আর বিশেষ কোনও প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু জল তোলাটা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। বৈশাখ মাসের শেষে বৃন্দাবনের কূয়া হইতে জল তোলা যে কি ভয়াবহ ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে সহজে বুঝিবেন না। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও ঠাকুরের নিজের হাতের তোলা জলে হাত পা ধোয়া, বা শৌচাদি কর্ম্ম করার কথা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে। এইজন্যই পঞ্চুবাবু ঠাকুরকে লইয়া আর বৃন্দাবনে থাকিতে পারিলেন না।

খাওয়া দাওয়ার পর ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলাম। সেখানে তখন আর কেহই ছিলেন না, পঞ্চুবাবুর ইঙ্গিতে আমি কথাটা ঠাকুরের সম্মুখে উত্থাপন করিলাম। ঠাকুরের সেই এক কথা, শুধু বলিলেন : "এতে কোন দোষ হয় না", অর্থাৎ ঠাকুরের অভিমত হইল এই যে তাঁহার হাতের তোলা জলে পা ধুইলে বা শৌচাদি কর্ম্ম করিলে কোন দোষ হয় না। কথাটা মানিয়া লওয়া সহজ নহে, এ বিষয়ে আমাদের সংস্কার এত বদ্ধমূল যে তাহা কাটাইয়া উঠা একপ্রকার অসাধ্য বলিলেও চলে। কিন্তু ঠাকুরের কথাটাও ছাড়িয়া দেওয়া চলে না, যত্ন সহকারে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি পাঠক-পাঠিকাদিগকে তাহা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে ঠাকুর নানাভাবে

আমাকে আপনার করিয়া লইতে চাহিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সেই আহ্বানে আমি সাড়া দিতে পারি নাই। পঞ্চুবাবুর ব্যাপারটাও যে ঠিক ঐ জাতীয় সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এখানে একটা অবান্তর কথার অবতারণা করিব। ইহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না যে প্রভাতবাবু আমার আবাল্য সুহৃদ্ ছিলেন। আমরা স্কুলে ও কলেজে একত্রে পড়াশুনা করিয়াছিলাম, এবং পরে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, একই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। দুই জনেই ঠাকুরের সংস্পর্শে আসায় এই সম্বন্ধ আরও দৃঢ় এবং মধুর হইয়াছিল। আমাদের একটা অভ্যাস ছিল এই যে আমরা দুইজনে সুযোগমত কখন অন্যত্র চলিয়া যাইতাম এবং সেখানে দু'চার দিন নিরিবিলি থাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম। সাধারণ একটু বিছানা, কাপড়, গামছা এবং সামান্য কিছু তৈজসপত্র সঙ্গে থাকিত। হঠাৎ খেয়াল হইল যে নবদ্বীপ যাইব, সুযোগমত চলিয়া গেলাম, ছোট একটি ঘর ভাড়া করিলাম, নিজেদের সামান্য কাজকর্ম্ম নিজেরাই চালাইয়া লইলাম। হয়তো আমি বাজারে গেলাম, ইত্যবসরে প্রভাতবাবু চা'য়ের জল চাপাইয়া দিলেন, আমি বাজার হইতে ফিরিয়া চা তৈয়ার করিলাম, প্রভাতবাবু ভাত চাপাইয়া দিলেন, আমি তরকারী কাটিয়া ফেলিলাম, এই ভাবে দুইজনে মিলিয়া কাজগুলি করিয়া ফেলিতাম। অবশ্য কাজ প্রভাতবাবু অনেক বেশী করিতেন, তাহার মত একজন সুদক্ষ কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড অতি অল্পই দেখিয়াছি। কিন্তু প্রভাতবাবু কাজ বেশী করিতেছেন, দু'বেলা একটানা রান্না করিতেছেন, আমারও এক আধ বেলা করা উচিত, রোজ রোজ

আমিই বা বাজারে যাইব কেন, প্রভাতবাবুও তো গেলে পারেন, এই জাতীয় কোন চিন্তা ঘুণাক্ষরেও আমাদের দু'জনের কাহারও মনে উদয় হইত না। কাজগুলি হইয়া গেলেই হইল, কে কি করিল, না করিল, এমন কোন প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না। ঠাকুরও বৃন্দাবনে পঞ্চুবাবুর সহিত ঠিক এই ভাবেই কাটাইতে চাহিয়াছিলেন। দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু একত্রে রহিয়াছেন, হাসিয়া খেলিয়া দিন যাইতেছে, কোন সঙ্কোচ নাই, কোন দ্বিধা নাই, দু'য়ে মিলিয়া যেন একই হইয়া গিয়াছেন। ঠাকুর আমাদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধই পাতাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমরা বুঝিয়াও তাহা বুঝি নাই। সংস্কারজাত সঙ্কোচ আসিয়া মাঝখানে মহীরুহের মত দাঁড়াইয়াছে, ঠাকুরের নিকটে যাইতে পারি নাই।

কোনমতেই ধারাবাহিক ভাবে কিছু বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এক কথা বলিতে অন্য কথা আসিয়া পড়িতেছে, পাঠকপাঠিকাদের বিরাগভাজন হইতেছি কিনা জানি না। যাহাই হউক, বেলা ১১টার সময় দাদার বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। দাদা ও বৌদি ঠাকুরকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং দিনটি অতি সুন্দরভাবে কাটিয়া গেল। আমার বৌদি রন্ধন কার্য্যে অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন এবং লোকজন খাওয়াইতে তাহার আনন্দের সীমা ছিল না, সুতরাং আহারাদির ব্যবস্থা যে বেশ সুখপ্রদই হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বৈকালে বৌদির সঙ্গে ঠাকুরের কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কিন্তু আমি সেখানে অতি অল্পক্ষণই উপস্থিত ছিলাম, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্থানীয় একজন

ভদ্রলোক ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইহাকে পূর্ব্বেও কয়েকবার দাদার বাসায় দেখিয়াছিলাম এবং ইনি হয়তো সংবাদ পাইয়াই ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন। কথাবার্ত্তা কি হইয়াছিল স্মরণ নাই কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে ভদ্রলোকের যেন কেমন একটা আত্মম্ভরি ভাব এবং তিনি যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত ঠাকুরের কথাগুলি শুনিতেছেন। যাইবার সময় তিনি একান্তে দাদাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাহার বিবেচনায় ঠাকুর অতি সাধারণ লোক, তাঁহার মধ্যে কোন বিশেষত্বই নাই এবং তিনি যে নামমাত্র আহার করেন, কি একটা রোগ থাকিলে নাকি এই রকম অতি সামান্য আহার করিয়াও বাঁচিয়া থাকা যায়। দাদার নিকটেই তাহার এই মন্তব্যের কথা শুনিলাম। শুনিয়াই মাথাটা গরম হইয়া উঠিল এবং ভাবিলাম যে তখনই যাইয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া আসিব। কিন্তু মতিবাবু ও বরদাবাবুকে কথাটা বলিতে তাঁহারা এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে ব্যাপারটা নিতান্ত লঘু হইয়া উড়িয়া গেল, আমি মনে মনে একটু লজ্জিতই হইলাম।

এখন ভাবি যে অযথাই ভদ্রলোকের উপর বিরক্ত হইয়াছিলাম। ঠাকুরের নিকট কত লোক আসিল, কত লোক গেল, কেহ আকৃষ্ট হইল, কেহ হইল না, ইহা তো দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরিয়াই দেখিলাম। যে আকৃষ্ট হইল না তাহার অপরাধ কি? তাহার চোখে ঠাকুরের কোন মাধুর্য্যই ধরা পড়িল না, না পড়িল নাই, তাহাতে আমার কি? এমনও অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে ঠাকুরের প্রতি খানিকটা আকৃষ্ট হইয়া পাই পাই করিয়াও শেষ

পর্য্যন্ত ঠাকুরকে পায় নাই। একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। আমার এক বন্ধু আমার বিডন ষ্ট্রীটের মেসে ঠাকুরের কাছে কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাহার কথাবার্ত্তায় এবং হাবভাবে আমার মনে হইয়াছিল যে তিনি ঠাকুরকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বোধ হয় শীঘ্রই ঠাকুরের কৃপালাভে সমর্থ হইবেন। কিন্তু একটা গোলযোগ হইয়া গেল। ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী তখন এক মারাত্মক অসুখে ভুগিতেছিলেন, ঠাকুরের নিকট একদিন ঐ রোগের কথাটা উত্থাপন করিলাম। প্রশ্নটা ঠিক কি ভাবে হইয়াছিল মনে নাই কিন্তু ঠাকুরের উত্তরটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "অষুধ তো খুঁইজা পাইলাম না।" আমি ও ঐ ভদ্রলোক, দুজনেই ঠাকুরের কথাতে ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে রোগিণীর জীবনের আর কোন আশা নাই। পরে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগিণী ভাল হইয়া যাওয়ায় ঐ ভদ্রলোকের মনে একটা খটকা বাঁধিয়া গেল এবং তিনি ঠাকুরের নিকট যাতায়াত ছাড়িয়া দিলেন। পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি যে ঠাকুরের কথাটার যে অর্থ আমরা করিয়াছিলাম তাহা হয়তো সমীচীন না-ও হইতে পারে। ঠাকুরের নিকট কেহ রোগোপশমের উপায়ের জন্য আসিলে তিনি সাধারণতঃ গাছ-গাছড়ার এবং কচিৎ কখন ধাতু ঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন এবং তাঁহার জানিত এই সকল ঔষধের মধ্যে ঐ রোগিণীর উপযুক্ত কোন ঔষধ নাই শুধু এই কথাটাই হয়তো তিনি বলিয়াছিলেন। ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল, এখনও যে নাই এমন কথা বলি না, তবে দেখা সাক্ষাৎ আর বড় একটা হয় না।

আমি বহুবার ভাবিয়াছি যে ভদ্রলোকের কি দুর্ভাগ্য, এমন একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইয়াও পাইলেন না! পরে অবশ্য ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি যে কে আসিবে না আসিবে তাহা নির্দিষ্ট আছে, কোন ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই।

যাহাই হউক, পরের দিন প্রাতঃকালে আমি দামোদর নদীর দিকে রওয়ানা হইলাম। মতিবাবু ও বরদাবাবুর তখনও চা-পর্ব্ব সম্পূর্ণ সমাধা হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা বাসাতেই রহিলেন। ঠাকুর মতিবাবুর স্ত্রীর জন্য লাটার ডগা সহযোগে একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গাড়ীতে মতিবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে কলিকাতায় টাটকা ডগা দুর্ঘট, সুতরাং আমতায় একবার খোঁজ করিয়া দেখিতে হইবে। দাদার আরদালী আমাকে বলিয়াছিল যে দামোদর নদীর তীরে অনেক লাটাগাছ আছে। এই অনুসন্ধানেই আমি বাহির হইয়াছিলাম, কিছুদূর যাইয়া লক্ষ্য করিলাম যে ঠাকুরও আমার পিছনে পিছনে আসিতেছেন। "আপনি আবার কেন আসিলেন" জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর আমাকে বলিলেন: "আপনে কি লাটাগাছ চিনেন?" ঠাকুরের কথায় আমার চৈতন্য হইল, বাস্তবিকই তো, আমি তো লাটাগাছ চিনি না, অথচ একাকী সেই গাছের সন্ধানেই বাহির হইয়াছি। একটু যাইতেই লাটাগাছের সন্ধান মিলিল, ঠাকুর কয়েকটি গাছ আমাকে চিনাইয়া দিলেন এবং আমিও পছন্দমত অনেকগুলি ডগা সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু একটা গাছের উপরের দিকে কয়েকটি অত্যন্ত হাউসনাগী ডগা ছিল, সেগুলি আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও পাড়িতে পারিলাম না। ডগাগুলি এত মনোরম যে এই কয়টিকে

ছাড়িয়া যাইতে মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না, বাসায় ফিরিয়া আকশি গোছের একটা কিছু লইয়া আসিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় ঠাকুর আমাকে বলিলেন : "এই ডগাগুলি নেন।" গাছের দিকে চাহিয়া দেখি যে সেই ডগাগুলি নাই। ঠাকুর আমার চেয়েও খাটো ছিলেন, কি করিয়া যে চক্ষের নিমেষে ডগাগুলি পাড়িয়া ফেলিলেন, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি নাই।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুর বলিলেন যে ৯'টার গাড়ীতেই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। দাদা ও বৌদির ভরসা ছিল যে ঠাকুর সেই দিনটাও আমতাতেই থাকিবেন, সুতরাং তাহারা একটু মনঃক্ষুন্ন হইলেন। কিন্তু আমি জানিতাম যে একবার 'যাইব' বলিলে ঠাকুরকে ফেরানো অসম্ভব, কাজেই সেরূপ কোন চেষ্টাই করিলাম না। বরদাবাবু ও মতিবাবু ঠাকুরকে লইয়া চলিয়া গেলেন, আমি সেই দিনের জন্য আমতাতেই থাকিয়া গেলাম।

২

সন্ধ্যার পরে ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার দাদার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। দাদা ঠাকুরকে এই প্রথম দেখিলেন, বিশেষ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং মনে হইল যে আমতার সেই ভদ্রলোকের সরাসরি মন্তব্যটাও তাহাকে যেন একটু বিচলিত করিয়াছে। ঠাকুরের কি কি বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া তাহাই তিনি জানিতে চাহিলেন। তখন ঠাকুরের

সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নিতান্তই অল্প, কি বলিয়াছিলাম ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু মনে হয় যে সামান্য যাহা কিছু বলিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতেই কিছুটা কাজ হইয়াছিল। দাদা ও বৌদি ক্রমেই ঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন এবং পরে তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িয়াছে তখন এইখানেই বিষয়টার একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য যে কি এবং কোথায়, তাহা সম্যকরূপে বুঝিবার শক্তি আমার নাই, তবে যেটুকু কতকটা বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে, শুধু তাহাই এখানে বলিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি নামমাত্র আহার করিতেন। আহার্য্যের কোন ধরা বাঁধা নিয়ম ছিল না, এক এক সময় এক এক রকম আহার করিতেন কিন্তু পরিমাপ সমানই থাকিত। কখন কখন যে ইহার ব্যতিক্রম হইত না তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঠাকুরের খাওয়া অনেকাংশে নির্ভর করিত যে খাওয়াইত তাহার মন ও নিষ্ঠার উপর। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এইখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। আমি তখন ৫৬ সি, বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় বামুন চাকর লইয়া একাকীই আছি। হঠাৎ একদিন ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈকালে প্রভাতবাবু আসিলেন এবং আমাকে জানাইলেন যে রাত্রিতে তিনি এখানেই থাকিবেন, সুতরাং একবার বাজারে যাইতে হইল। অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি, সবে নূতন আলু, ফুলকপি, কড়াই শুঁটি বাহির হইয়াছে, বাজারে গিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। থরে থরে কপি সাজান রহিয়াছে,

দেখিয়াই আমার মনে হইল যে ঠাকুর যদি একটু আলু কপির ডালনা গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে কি আনন্দই না হইত! তৎক্ষণাৎ ২।৩টি বাছা বাছা কপি ও তৎসঙ্গে কিছু নূতন আলু ও কড়াই শুঁটি কিনিয়া ফেলিলাম এবং প্রভাতবাবুর জন্য কয়েকটা হাঁসের ডিম লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। আমার মনের কথাটা শুনিয়া প্রভাতবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং আমার চাকর দামুকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তোলা উনানটা ধরাইতে বলিলেন। ইতিমধ্যে তিনি আবার স্নান করিয়া লইলেন এবং সযত্নে আলু কপি কুটিয়া ও কড়াই শুঁটি ছাড়াইয়া উনানে কড়াই বসাইয়া দিলেন। ঠাকুরকে কিছুই বলা হইল না। রান্না শেষ হইতে আমি ঠাকুরের বিছানার উপরেই তাঁহার সম্মুখে একখানা কাগজ পাতিয়া দিলাম এবং প্রভাতবাবু একটা বড় জামবাটি ভর্ত্তি করিয়া সেই ডালনা আনিয়া কাগজের উপরে রাখিলেন, সঙ্গে একখানা চামচও দিলেন। ঠাকুর কিছুই বলিলেন না, সঙ্গে সঙ্গেই খাইতে সুরু করিলেন এবং যখন তাঁহার খাওয়া শেষ হইয়া গেল তখন দেখিলাম যে কোথাও একটু ঝোলও লাগিয়া নাই, বাটিতে জল ঢালিয়া আমাদের প্রসাদ পাইতে হইল। এই জাতীয় অভিজ্ঞতা আমার আরও কয়েকবার হইয়াছে এবং যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করিব, কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রম, স্বভাবতঃই ঠাকুর অত্যন্ত স্বল্পাহারী ছিলেন। এই আহারের ব্যাপার লইয়া একবার আমি তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে কিছু কিছু সুদ দিলেই মহাজন সন্তুষ্ট থাকে, অধিক প্রয়োজন হয় না।

ইহাও বলা হইয়াছে যে ঠাকুর কখন স্নান করিতেন না এবং ছাড়াইয়া না দিলে কাপড়ও ছাড়িতেন না। সহজেই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সহজ নহে। দু'চার দিন স্নান করিতে না পাইলে আমাদের যে কি অবস্থা হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। আমার নিজের কথা বলিতে পারি, ২।৩ দিন স্নান না করিলে শুধু যে গা ঘিন ঘিন করে এবং বিছানা পর্য্যন্ত দুর্গন্ধে ভরিয়া যায়, তাহাই নহে, মেজাজও বিগড়াইয়া যায় এবং আহার্য্য বস্তুও বিস্বাদ হইয়া উঠে। কিন্তু ঠাকুর মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর স্নান না করিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন, অথচ ক্লেদের লেশও তাঁহাতে কখন প্রকাশ পায় নাই, তাঁহার সেই সৌম্য, প্রশান্ত, স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তি অটুটই রহিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার গায়ের সেই অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম রঙটি সকল সময়ে এক প্রকার থাকিত না। একটা স্থায়ী রঙ অবশ্যই ছিল কিন্তু কখন কখন দুই তিন ঘণ্টার জন্য, কখন বা দু'এক দিনের জন্য, উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করিত। আমি স্বচক্ষে ইহা কয়েকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গায়ের রঙটি কখন একটু হরিদ্রাভ, কখন একটু রক্তাভ, কখন বা কতকটা দুধের মত হইয়া যাইত এবং কিছুক্ষণ থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইত। ইহাও দেখিয়াছি যে কখন কখন তাঁহার ললাটে আপনা হইতেই একটি ত্রিপুণ্ড্র ফুটিয়া উঠিত, দু'তিন ঘণ্টা থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত। কেন এরূপ হইত বলিতে পারি না, ঠাকুরকে কখনও সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। তিনি স্নান কেন করেন না, একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,

তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন : "স্নান করার দরকার হয় না, স্নান হয়।" এই স্নান নিশ্চয়ই কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিন্তু ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নাই। বৈষ্ণবেরা 'লাবণ্যামৃতে স্নান, তারুণ্যামৃতে স্নান,' ইত্যাদির কথা বলিয়া থাকেন। ঠাকুরের এই স্বতঃসম্পাদিত স্নানও হয়তো সেই রকমই একটা কিছু হইবে।

আমি জানি যে ঠাকুরের নিদ্রাও ছিল না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন : "ঘুম তো আসে না, ঘুম আসিলেই তো মোহ আসিয়া গেল।" কিন্তু কথাটা অন্যকে বোঝান সহজ হইবে না এবং এ সম্বন্ধে মত বিরোধেরও সম্ভাবনা আছে। আমরা যেমন রাত্রে আহারাদির পর বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়ি এবং ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়ি, ঠাকুরও সেইরূপ মশারির ভিতরে বিছানায় যাইয়া শুইতেন এবং চক্ষু মুদিয়া এমন ভাবে থাকিতেন যে মনে হইত যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ইহা যে নিদ্রা নহে, অন্য কিছু, তাহা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নহে। এ সম্বন্ধে আমার নিজের যাহা বক্তব্য আছে তাহাই শুধু বলিতে পারি, গ্রহণ করা না করা, পাঠক-পাঠিকার ইচ্ছা। আমার জীবনে ঠাকুরের সহিত একাকী রাত্রি কাটাইবার সুযোগ কয়েকবারই হইয়াছে। একদিন আমার বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় ভিতরের একখানা ঘরে আমার ও ঠাকুরের শোয়ার ব্যবস্থা করা হইল। খাটের উপর ঠাকুরের বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল এবং আমার বিছানা হইল মেজের উপর। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মশারি টানাইয়া আলো নিভাইয়া দুইজনেই শুইয়া পড়িলাম। আমার

কিন্তু ঘুম আসিল না, বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলাম। ঘড়িতে ১২টা বাজিতে শুনিয়া বুঝিলাম যে এক ঘণ্টার উপর এই ভাবে কাটাইয়াছি। রাস্তার আলোতে ঘরেও খানিকটা আলো ছিল, ঠাকুরের খাটের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। দেখাদেখি আমিও উঠিয়া বসিলাম এবং একটু পরে ঠাকুর বলিলেন: "উঠিয়া বসিলেন যে?" আমি বলিলাম যে ঘুম আসিতেছে না, তাই। তখন ঠাকুর বলিলেন: "তা হইলে এক কাজ করেন, মশারি তুইলা রাইখা আলো জ্বালাইয়া দেন।" আমি তৎক্ষণাৎ মহানন্দে ঠাকুরের আদেশ তামিল করিলাম। তিনি নানা বিষয়ে কথা বলিয়া চলিলেন, বেশ মনে আছে যে সে রাত্রে তিনি তাঁহার জীবনের অনেক গুহ্য কথা আমাকে জানাইয়াছিলেন। কিভাবে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ চাহিয়া দেখি যে ভোর হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে এই প্রকার সারারাত্রি জাগরণ আমার অন্ততঃ দশবার ঘটিয়াছে কিন্তু প্রতিবারেই লক্ষ্য করিয়াছি যে রাত্রি জাগরণের যে একটা স্বাভাবিক গ্লানি ও ক্লান্তি আছে, তাহার বিন্দুমাত্রও ঠাকুরকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যহ যেমন থাকেন তেমনই রহিয়াছেন, কোন ব্যতিক্রমই হয় নাই। আমরা হয়তো দিনে ৩।৪ ঘণ্টা ঘুমাইয়া রাত্রি জাগরণের অবসাদ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ঠাকুরের সে রকম কোন প্রয়োজনই হয় নাই। অন্যান্য দিন যেমন সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া এবং কখন হয়তো বা সামান্য একটু বিশ্রাম করিয়া

কাটাইয়া দেন, রাত্রি জাগরণের পরের দিনগুলিও হুবহু সেইভাবেই কাটাইয়াছেন। এমনও অনেকবার হইয়াছে যে ঠাকুরকে আনিতে হাওড়া বা শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়াছি, ঠাকুর একখানা প্যাসেঞ্জারে ঠাসা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে নামিয়াছেন, সারারাত্রি বসিয়াই আসিয়াছেন কিন্তু কোন ক্লান্তি বা গ্লানির চিহ্নমাত্রও তাঁহাতে দেখি নাই। স্বভাবতঃই মনে হইয়াছে যে নিদ্রার কোন প্রয়োজনই তাঁহার নাই, নতুবা জাগরণের অবসাদ অন্ততঃ কিছু না কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িতই।

কিন্তু শুধু ইহার উপর নির্ভর করিয়াই ঠাকুর জিতনিদ্র ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইতে পারে না। মহাজনদের অনেক মজুতি শক্তি থাকে, তাহার প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, সুতরাং কাহারও অনিদ্রায় কোন প্রকারের গ্লানি না হইলেই যে তিনি জিতনিন্দ্র, এমন কথা বলা চলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে আমার বক্তব্যের মূল কথা ইহা নহে, এবং ইহার সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্বন্ধও নাই। আমার প্রধান কথা হইল এই যে দীর্ঘকাল ঠাকুরের সাহচর্য্যে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে কিন্তু কখনও তাঁহার মুখে নিজের সম্বন্ধে এই ঘুম, এমন কি বিশ্রাম কথাটাও শুনি নাই। তিনি অনেক সময়েই অসুস্থ হইয়া পড়িতেন, বাত তো প্রায় নিত্যসঙ্গীই ছিল, আরও নানা প্রকারের ব্যাধি বিভিন্ন লোকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কুড়াইয়া আনিতেন এবং সময় সময় নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেন। "পেট জ্বলিয়া গেল, পায়ের যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল," ইত্যাদি নানা প্রকারের কাতরোক্তি করিতেন, কিন্তু ঘুম হইতেছে না,

একটু ঘুমাইতে পারিলে বোধ হয় অনেকটা সুস্থ হইতাম, এরূপ কথা শুধু আমি কেন, কেহই কোন দিন তাঁহার মুখে শোনে নাই। কথাটা একটু বিশেষ যত্ন সহকারে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আমরা সকলেই জানি যে রোগীর পক্ষে সাধারণতঃ ঘুম একটা অতি সুখকর অবস্থা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডাক্তার বৈদ্যেরাও চিকিৎসার সময় রোগীর ঘুম হইতেছে কিনা, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে ঘুমের জন্য ঔষধাদিরও ব্যবস্থা করেন। কোন কঠিন রোগী খানিকক্ষণ ঘুমাইয়াছে শুনিলেই চিকিৎসকেরা আনন্দিত হ'ন। কিন্তু নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও ঠাকুর ঘুমের কথা কখনও বলেন নাই। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর সন্দেহ নাই এবং আমার বিশ্বাস যে আমাদের সমস্যার মীমাসাংও ইহার মধ্যেই আছে। ঠাকুরের ঘুম ছিলই না এবং সেই জন্যই যখন ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজন তখনও ঘুমের কথাটা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। শুধু একবারই তিনি কথাটা বলিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম শয্যার পাশে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের নিকট শুনিয়াছি যে দেহত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে উপস্থিত আশ্রিতবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "আপনেরা ঐ ঘরে যান, আমি একটু ঘুমাই।" যাঁহারা পূর্ব্বাপর ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই একটি কথা শুনিয়াই নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে ঠাকুর আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই। কথাটা বুঝাইয়া বলিতে পারিলাম কিনা জানি না কিন্তু আমার নিজের মনে কোন সন্দেহই নাই।

সুস্থ শরীরে ঠাকুর প্রায় সর্ব্বদাই চিৎ হইয়া শুইতেন এবং একখানা চাদর দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া লইতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যে একটি শব পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণের কোন স্পন্দনই যেন ইহাতে নাই। যোগীদিগের সম্পর্কে "শবাসন" বলিয়া একটা কথা শুনা যায়। আমার মনে হয় যে যখন ঠাকুর ঘুমাইয়া আছেন বলিয়া বাহ্যতঃ দেখা যাইত, বাস্তবিক তখন তিনি শবাসনে কোনও একটা অবস্থায় থাকিতেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিয়াছি যে ঠাকুরের কখনও কোন ক্লান্তি বা অবসাদ দেখি নাই। শুধু কতকগুলি কথা বলিয়া ইহা বুঝান যাইবে না, সুতরাং কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। আমার বিডন ষ্ট্রীটের মেসে একদিন সকালবেলা ঠাকুর আমাকে বলিলেন: "চলেন, কালীঘাটের দিকে একবার বেড়াইয়া আসি।" আমি সানন্দে সম্মত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ জামা জুতা পরিয়া ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় নামিয়াই আমি বাঁ দিকে মোড় ফিরিলাম, ইচ্ছা যে হেদুয়ার নিকট আসিয়া ট্রামে চাপিব। ঠাকুর আমাকে থামাইলেন এবং একটু হাসিয়া বলিলেন: "ট্রামে উঠিলেই তো ট্রামের অধীন হইলেন, স্বাধীন ভাবেই চলেন।" অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে ঠাকুরের পিছু পিছু চলিলাম। সেণ্ট্রাল এভেনিউ রাস্তাটা তখনও সমাপ্ত হয় নাই, কিন্তু পায়ে হাঁটিয়া কোন মতে যাওয়া চলিত। ঠাকুর এই রাস্তাই ধরিলেন এবং ক্রমে আমরা আসিয়া এসপ্লানেডে পৌঁছিলাম। আমার একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে এইবার বোধ হয় ঠাকুর ট্রামে উঠিতে

বলিবেন, কিন্তু তিনি সটান কার্জ্জন পার্কে ঢুকিলেন এবং ঐ পার্ক পার হইয়া রেড রোডে আসিয়া পড়িলেন। তারপর আরম্ভ হইল একটানা হাঁটা। শ্রাবণ মাস, আকাশে মেঘ থাকিবার কথা, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে একটুও নাই, রৌদ্র ক্রমশঃই ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিতেছে, আর আমরা হাঁটিয়াই চলিয়াছি। ট্রামে যাইব মনে করিয়া এবং আকাশে মেঘ না দেখিয়া ছাতাটিও সঙ্গে আনি নাই। যাহাই হউক, ময়দান পার হইয়া হরিশ মুখার্জ্জী রোড ধরিয়া হাজরা রোডে আসিয়া পড়িলাম। পরে কালীঘাট রোড হইয়া আরও দুই তিনটি গলি ঘুরিয়া এক খোলার চালওয়ালা বাড়ীতে ঠাকুর আমাকে আনিয়া উঠাইলেন। আমার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়; ঘামে জামা কাপড় ভিজিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে, পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকাইয়া যাইবার উপক্রম। কিন্তু ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া গেলাম। গায়ে এক বিন্দু ঘাম নাই, কোন গ্লানি নাই, কোন ক্লান্তি নাই, আমার বাসা হইতে বাহির হইবার সময় যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনই রহিয়াছেন। বস্তুতঃ, ঠাকুরের গায়ে ঘাম কোন দিনই দেখি নাই। দারুণ গ্রীষ্মে বদ্ধ ঘরের মধ্যে আমরা গলদঘর্ম্ম হইয়া গিয়াছি কিন্তু ঠাকুরের দেহের বা ভাবের কোন প্রকারের কোন বৈলক্ষণ্য দেখি নাই।

আর একটি কথাও এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে হইতেছে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ঠাকুর জুতা ব্যবহার করিতেন না, পূর্ব্বেও কখন করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। ইহার প্রায় ১৫।২০ বৎসর পরে আমরাই বলিয়া কহিয়া

তাঁহাকে জুতা ব্যবহার করিতে সম্মত করাইয়াছিলাম। তখন একখানি ধুতি ও একখানি চাদর, ইহাই ছিল তাঁহার সজ্জা। শুধু পায়ে তিনি সর্ব্বদাই হাঁটাহাঁটি করিতেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঠাকুরের পায়ের তলায় এই হাঁটাচলার কোন নিদর্শনই ছিল না। পায়ের তলা দুটি ছিল নির্ম্মল, মসৃণ এবং পাখীর পালকের মত কোমল। ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আর একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি যখন হাঁটিয়া যাইতেন তখন কোন প্রকারের কোন শব্দই হইত না। সাধারণতঃ লোকে যখন চলাফেরা করে, চোখে না দেখিলেও বুঝা যায় যে কেহ হাঁটিয়া যাইতেছে। কিন্তু ঠাকুরের বেলায় এরূপ বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। এমন বহুবার দেখিয়াছি যে ঠাকুর সিঁড়ি ধরিয়া উপরে চলিয়া আসিয়াছেন, সিঁড়ির পাশের ঘরে এবং বারান্দায় অনেকেই রহিয়াছেন, কিন্তু একজন লোক যে নীচ হইতে উপরে চলিয়া আসিল তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। আমার মনে হইত যে ঠাকুর যখন হাঁটিয়া যাইতেন তাঁহার দেহের ভার মাটির উপর পড়িত না এবং সেই জন্যই হাঁটিবার সময় কোন শব্দ হইত না এবং এত হাঁটাহাঁটি করা সত্ত্বেও তাঁহার পায়ের তলা এমন অবিকৃত অবস্থায় ছিল। একদিন আমি ঠাকুরকে এই কথাটা লইয়া চাপিয়া ধরিয়াছিলাম, তিনি স্পষ্ট কিছু না বলিলেও প্রকারান্তরে আমার অনুমানের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

এই জন্যই তাঁহার সহিত কেহই হাঁটিয়া পারিত না। আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীসুধীর চন্দ্র সরখেল (ইনি কটকে কণ্ট্রাক্টারী করিতেন, এখন সপরিবারে সেখানেই বসবাস করেন) একদিন

কোন কার্য্যোপলক্ষে উত্তর কলিকাতায় গিয়াছিলেন, হঠাৎ বেথুন কলেজের সম্মুখে তাহার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। আমরা সকলেই জানিতাম যে ঠাকুর তখন ১০নং যত্ন মল্লিক ষ্ট্রীটে শ্রীউপেন্দ্র কুমার সাহার গদীবাড়ীতে অসুস্থ অবস্থায় আছেন এবং একথাও প্রচার ছিল যে তিনি কিছুদিন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, সুতরাং ঠাকুরকে সেখানে দেখিয়া সুধীরবাবু একটু আশ্চর্য্যই হইলেন। ঠাকুরের চেহারা দেখিয়াই সুধীরবাবু বুঝিলেন যে তিনি বাস্তবিকই অসুস্থ এবং যত্নমল্লিক ষ্ট্রীট হইতে এতটা দূরে একাকী কি করিয়া আসিলেন, স্বভাবতঃই ঠাকুরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন: "দুপুর বেলা ওরা সবাই বিশ্রাম করিতেছে, এই ফাঁকে একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, চল এই পার্কে একটু ঘুরি।" এই বলিয়া ঠাকুর পার্কে ঢুকিলেন এবং সুধীরবাবুও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তারপর আরম্ভ হইল ঘোরা। সুধীরবাবুর মুখে এই ঘোরার বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ঠাকুর কত পাক যে ঘুরিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই কিন্তু তথাপি তাঁহার ঘোরা আর থামে না। সুধীরবাবু স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ পুরুষ, ৬৫ বৎসর বয়সেও তিনি ৭।৮ মাইল হাঁটিতে এবং ১৫ মাইল সাইকেল চালাইতে অনায়াসেই পারেন, কিন্তু নিতান্ত অসুস্থ ঠাকুরের সহিত হাঁটিতে গিয়া তিনিই ঘায়েল হইয়া গেলেন। শেষে সুধীরবাবুকেই বলিতে হইল: "চলেন, একটা বেঞ্চে একটু বসি।" ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে একটা অফুরন্ত মজুতি শক্তি ঠাকুরের ভিতরে ছিল এবং তিনি যখন খুসী তখনই তাহা কাজে লাগাইতে পারিতেন।

কথাটা পরিস্ফুট করিবার জন্য আমি এখানে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ঠাকুর তখন মতিবাবুর ডিক্সন লেনের বাসায় আছেন, অত্যন্ত অসুস্থ; দুটি পা-ই বাতে আক্রান্ত হইয়াছে। সেক, মালিশ প্রভৃতি যথারীতি চলিতেছে কিন্তু কিছুতেই যন্ত্রণার উপশম হইতেছে না। একদিন প্রাতঃকালে সেখানে যাইয়া দেখি যে ঠাকুর পা দুটি সম্মুখের দিকে ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, গুটাইয়া বসিবার সামর্থ্য আর তাঁহার নাই। দুটি পা-ই আগাগোড়া ফ্ল্যানেলে জড়ান, মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কাতরাইয়া উঠিতেছেন। ঠাকুরের কাছে প্রভাতবাবু, মতিবাবু, জীতেন বক্সী (মতিবাবুর শ্যালক) আরও কে কে যেন বসিয়াছিলেন ঠিক স্মরণ নাই। বরদাবাবুও বোধ হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন ঠাকুরের পায়ের বেদনা এমন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে আস্তে আস্তে একটু টিপিয়া বা হাত বুলাইয়া যে তাঁহার পরিচর্য্যা করিব, তাহারও কোন উপায় ছিল না, কোন কিছুর সামান্য স্পর্শও তিনি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। আমরা প্রায় নিঃশব্দেই কিছুক্ষণ বসিয়া আছি এমন সময় ৺কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় ঠাকুর দর্শনে আসিলেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া আমাদিগকে বলিলেন: "জীবনে তিনজন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম, আজ গণ্ডা পূর্ণ হইল।" যতদূর স্মরণ হয় কুঞ্জবাবু এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুঞ্জবাবু বলিলেন যে তাহার বাড়ী বারদীগ্রামে এবং শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গ তিনি শৈশব হইতেই পাইয়াছিলেন। পরে

তাহার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। প্রভাত-বাবু কুঞ্জবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "আপনি তো বাল্যকাল হইতেই লোকনাথ বাবার সঙ্গ পাইয়াছেন এবং তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাও করেন দেখিতেছি, তবে তাঁহার নিকট দীক্ষা না লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লইলেন কেন?" কুঞ্জবাবু বলিলেন যে তাঁহারা যখন কলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে অধিকাংশ ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেরাই ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইত, তিনিও সে প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পরে যখন গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবমুক্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কুঞ্জবাবু আরও অনেক কিছু বলিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই স্মরণ হইতেছে না।

হঠাৎ দেখি যে কুঞ্জবাবু ঠাকুরের একখানা পা কোলে তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে টিপিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাকে নিষেধ করিব ভাবিতেছি কিন্তু ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। সেই দারুণ রোগ যন্ত্রণার আর কোন চিহ্নই তাঁহাতে নাই, যেন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি স্থির চিত্তে সমাহিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা কেহই কিছু বলিলাম না, কুঞ্জবাবু ঠাকুরের পা টিপিয়াই চলিলেন। ইতিমধ্যে আরও একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। এক বাবাজী ঠাকুরকে একখানা গান শুনাইবার জন্য ২।৩ দিন ধরিয়া মতিবাবুর বাসায় আসিতেছিল, ঠাকুর অসুস্থ বলিয়া আমরা তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু

ঠাকুরের ঘরে কদাচিৎ যাইতাম, কারণ সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই রোগের চিকিৎসার জন্য কলিকাতাতে যাহা কিছু করা সম্ভব ডাক্তার দা' তাহার সকল ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ সুচিকিৎসা ও পরিচর্য্যার এমন সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও ঠাকুরের অসুখের আশানুরূপ উপশম হইতেছিল না। ঠাকুরকে কলিকাতা লইয়া আসিবার আনুমানিক ৮।১০ দিন পরে ডাক্তার দা' আমাদের অনেককেই বৈকালে একবার তাহার বাড়ীতে যাইবার জন্য খবর পাঠাইলেন। যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল তাহার নিকট শুনিলাম যে ঠাকুরের চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের সকলের সঙ্গে একটা পরামর্শ করিবার জন্যই তিনি আমাদের ডাকিয়াছেন। কিন্তু সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে নিজের চক্ষুকেই সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যাঁহার বালিসের উপর হইতে মাথা তুলিতে কষ্ট হয়, অস্থির হইয়া পড়েন, আবার কখন বা যন্ত্রণায় খাটের উপরে বেহুঁসের মত গড়াগড়ি দিতে থাকেন, সেই ঠাকুর দোতলার হলঘরে একখানা জলচৌকির উপর আসিয়া বসিয়াছেন এবং রাগতভাবে অনেক কিছুই বলিয়া যাইতেছেন। তিনি এত দুর্ব্বল যে বসিয়া থাকিতে তাঁহার যেন কষ্ট বোধ হইতেছে এবং মনে হইল যেন তিনি কাঁপিতেছেন। আমরা সকলেই নির্ব্বাক, কাহারও কোন কথা বলিতে সাহসে কুলাইতেছিল না। ঠাকুর বলিতেছিলেন যে তিনি তখনই অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিবেন না। ডাক্তার দা' ভাল ভাবেই জানিতেন যে একবার যখন ঠাকুর যাইবেন বলিয়া গোঁ ধরিয়াছেন, তখন আর তাঁহাকে কিছুতেই

ফিরান যাইবে না, সুতরাং তিনিও প্রায় নীরবেই ছিলেন, শুধু তাহার একটা কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ডাক্তার দা' ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন : "আমি বোকা হইলেও এত বোকা নই ; আমার এই ইটকাঠ দিয়া যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব না, তাহা আমি জানি।" যোগেশ বাবু (ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত অবসর প্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযোগেশ চন্দ্র গুহ) নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি গাড়ী আনিয়াছেন কিনা। যোগেশবাবু হাঁ বলিতেই ঠাকুর তাহাকে বলিলেন যে এখনই তাঁহাকে প্রতাপ বাবুর বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে যোগেশ বাবুর বলিবার কিছুই ছিল না, সুতরাং ধরাধরি করিয়া ঠাকুরকে কোনও ক্রমে গাড়ীতে আনিয়া উঠান হইল এবং তিনি প্রতাপ বাবুর বাসায় চলিয়া গেলেন। সেখানে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের একবার বাহ্যের বেগ আসিল। প্রতাপবাবু দুইখানা ইট এবং তাহার মধ্যে একটি মাটির মালসা পাতিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং ঠাকুরও অনায়াসেই সেখানে মলত্যাগ করিয়া পুনরায় ঘরে আসিয়া বসিলেন। এই সময়টায় আমি সেখানে ছিলাম না, কিন্তু যাঁহারা ছিলেন তাহাদের কাছে শুনিয়াছি যে প্রতাপ বাবুর বাসায় পৌঁছাইবার পরই ঠাকুরের অসুখ যেন আপনা হইতেই অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। কোথায় বা গেল বেডপ্যান, কোথায় বা গেল তুলার প্যাড, আর কোথায় বা গেল ঔষধ আর পত্র। পরের দিন প্রাতঃকালে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া দেখিলাম যে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, শুধু দেহের

শীর্ণতা ছাড়া রোগের আর বিশেষ কোন লক্ষণ তাঁহাতে নাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এরূপ একটা অবস্থান্তর চিকিৎসা-বিজ্ঞান ধারণাও করিতে পারে না। পূর্ব্বে যে ঠাকুরের একটা অফুরন্ত মজুতি শক্তির কথা বলিয়াছি, তাহার সাহায্যেই ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু ঠাকুর সেদিন রাগারাগি করিয়া ডাক্তার দা'র বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলেন কেন? বিষয়টা লইয়া আমি নানাভাবে ভাবিয়াছি এবং আমার যাহা মনে হইয়াছে তাহাই এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে আমার এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল না-ও হইতে পারে। ঠাকুরের অসুখ এবং আমাদের অসুখ যে এক পর্য্যায়ের নহে, মূলগত একটা বৈষম্য আছে, ইহা ডাক্তার দা' বিশেষ ভাবেই জানিতেন, কিন্তু ঠাকুরের কোন কঠিন অসুখ দেখিলেই কথাটা তাহার ভুল হইয়া যাইত। ঠাকুরের প্রতি আত্যন্তিক মমতা বশে তাহার চিকিৎসক-বুদ্ধিই প্রবল হইয়া উঠিত এবং ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এই ব্যাপার লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে তাহার প্রায়ই খটাখটি বাধিত এবং কখন কখন তিনি ঠাকুরের নিকট গালাগালিও খাইতেন। তাহার বাড়ীর অতি নিপুণ সুব্যবস্থিত চিকিৎসার মধ্য হইতে প্রতাপবাবুর বাসাতে এক প্রকার অচিকিৎসার মধ্যে আসিয়া এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্ত হইয়া ঠাকুর ডাক্তার দা'কে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন যে তাহাদের চিকিৎসা-বিদ্যার আইন কানুন তাঁহার বেলায় খাটিবে না।

ঠাকুরের এই অসুখের সঙ্গে আরও একটা গুরুতর ব্যাপার জড়িত আছে। তিনি কলিকাতা আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলাম যে এই মারাত্মক ব্যাধিটি ঠাকুর কুড়াইয়া আনিয়াছেন। চাঁদপুরে এক ব্যক্তি এই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার আত্মীয় স্বজনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ঠাকুর এই ব্যাধিটি নিজ দেহে তুলিয়া লইয়াছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক যুগে কথাটা বিশ্বাস করা সহজসাধ্য নহে, এবং ইহা যে কি করিয়া সম্ভব, তাহাও আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু কথাটা অবিসংবাদিত সত্য। ব্যাধিটা গোড়া হইতেই এমন মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছিল যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে এবং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে আরোগ্যের পথে চলিলেও ১৫।২০ দিনের পূর্ব্বে রোগীর নিরাময় হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু যিনি এই রোগে আক্রান্ত হইলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন, আর এই দুরন্ত ব্যাধির সমস্ত লক্ষণ গুলিই সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের দেহে আসিয়া প্রকাশ পাইল। এখনও এমন অনেকেই বিদ্যমান আছেন যাহারা এই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং এবিষয়ে নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেন। ঠাকুর যে এইভাবে অন্যের ব্যাধি তুলিয়া আনিতেন, তাহার ২।৩টি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আমি "বেদবাণী"র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় করিয়াছি এবং আরও কয়েকটি আমার জানা আছে। যাঁহারা একটু দীর্ঘকাল ঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই হয়তো এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে পারিবেন, সুতরাং ঠাকুর যে মাঝে মাঝে অপরের দেহের দুরারোগ্য ব্যাধি নিজের দেহে

টানিয়া আনিতেন, এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। ঠাকুর নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং উল্লিখিত "বেদবাণীর" ভূমিকায় ঠাকুরের স্বীকারোক্তির তুইটি দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা যে কি করিয়া সম্ভব হইত এবং ঠাকুর যে কি কৌশলে ইহা করিতেন, তাহা আমি জানি না এবং সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেও পারিব না। কথাটা ঠাকুরকে কখন জিজ্ঞাসা করি নাই কিন্তু সে জন্য আমার বিশেষ কোন আপসোস নাই, কারণ তিনি ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলেই যে আমি বুঝিতে পারিতাম, তাহা আমি সম্ভব বলিয়া মনে করি না। একদিন আমি ঠাকুরকে বলিয়াছিলাম যে অযথা তিনি এই রোগ যন্ত্রণাগুলি সহ্য করেন কেন, ইচ্ছা করিলেই তো এগুলিকে এড়াইয়া নির্ব্বিবাদে বসিয়া থাকিতে পারেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন : "তা' হইলে যে রোগ-ঋণ শোধ হয় না।"

কিন্তু ঠাকুর যে শুধু অন্যের ব্যাধিই নিজের শরীরে টানিয়া লইতেন তাহাই নহে, কখন কখন অপরকে ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের ঘাড়ে বিপদ টানিয়া আনিতেন। এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। ঘটনাটি আমি শ্রীরোহিণী কুমার মজুমদার (ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত, পূর্ব্বে 'জর্জ্জ টেলিগ্রাফ' অপিসে চাকুরী করিতেন, বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়া বজবজে বসবাস করিতেছেন) মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম এবং পরে শ্রীশুভময় দত্ত (ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত রায় বাহাতুর শ্রীশুভময় দত্ত, নোয়াখালীর ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীল, বর্ত্তমানে মাজদিয়ায় ওকালতি করেন) মহাশয়ও ইহা আমার নিকট বিবৃত

করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল মজঃফরপুরে রোহিণী বাবুর বাসাতে, শুভময়বাবুও ঠাকুরের সঙ্গে পূজার ছুটি উপলক্ষে সেখানেই ছিলেন। সে দিন মাংস রান্না হইতেছিল, রান্না শেষ হইতে রোহিণীবাবু সকলকে লইয়া খাইতে বসিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিয়া বসিলেন: "আমিও মাংস খাইব, আমাকেও দেন।" রোহিণীবাবুর স্ত্রী সানন্দে একবাটি মাংস আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন, ঠাকুর তাড়াতাড়ি বাটিটি নিঃশেষ করিয়া আবার মাংস চাহিলেন। আর এক বাটি আসিল, তাহাও নিঃশেষ হইতে বিলম্ব হইল না, এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে ঠাকুর সমস্ত মাংসটাই খাইয়া ফেলিলেন, একটু ঝোলও অবশিষ্ট রহিল না। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই ঠাকুরের পেটে দারুণ যন্ত্রণা সুরু হইল এবং ঘন ঘন দাস্ত হইতে লাগিল। প্রায় তিন দিন দুঃসহ যন্ত্রণায় ভুগিয়া ঠাকুর সুস্থ হইয়া উঠিলেন। রোহিণীবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে মাংসটা বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং উহা খাইলে তাহাদের সকলেরই জীবন নাশের আশঙ্কা হইত। রোহিণীবাবুর কাছে এই কথাটা শুনিবার কিছুদিন পরে ঠাকুরের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার একটু আলোচনা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে রোহিণীবাবুকে বলিলেই তো মাংসটা তিনি ফেলিয়া দিতে পারিতেন, অযথা এতটা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ঠাকুর সহ্য করিতে গেলেন কেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন: "ফেলিয়া দিলেই কাক, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদিতে উহা খাইত, এবং তাহাদের জীবন শঙ্কটাপন্ন হইত।" কথা কয়টি যখন

বলিলেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যে করুণার একটি বাস্তব মূর্ত্তি আমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। ইহারই নাম মৈত্রী—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি। শুধু মিছিল বাহির করিয়া কর্ণভেদী ঢক্কানিনাদে “মৈত্রী, মৈত্রী” বলিয়া জিগির তুলিলে এই বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না।

কত কথাই না মনে পড়িতেছে কিন্তু আপাতত আর বেশী কিছু বলিব না, ঠাকুরের আর দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াই এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ঠাকুর যখন কথাবার্ত্তা বলিতেন, তাঁহার গলার সেই সুমধুর স্বরটি সর্ব্বদা এক সুরেই বাঁধা থাকিত, কখন উঠিতও না, কখন নামিতও না। সাধারণতঃ আমাদের প্রত্যেকের গলারই একটি বিশিষ্ট সুর থাকে এবং সেই সুরেই আমরা কথাবার্ত্তা বলি। কিন্তু এই সুরের স্থিতিত্ব নির্ভর করে আমাদের মনের অবস্থার উপর। মনে কোন প্রকারের চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা আসিলেই সুরটিও বিকৃত হইয়া যায়, রাগ হইলে চিৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইবার উপক্রম করি, শোকে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠি, কখনও বা এমন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি যে গলা দিয়া কোন স্বর বাহির হইতে চাহে না। ঠাকুরের কিন্তু এসকল কোন বালাই ছিল না। তিনি রাগারাগিও করিতেন, গালাগালিও করিতেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন সময়েই তাঁহাতে কোন প্রকারের কোন উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইত না এবং গলার সুরটিও অবিকৃতই থাকিত। এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। আমার বিডন ষ্ট্রীটের বাসার বাহিরের ঘরে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরখেল মহাশয়ের

সহিত কোন একটা বিষয় লইয়া ঠাকুরের প্রায় এক ঘণ্টার উপর বাদানুবাদ চলিয়াছিল, আমি নিকটেই বসিয়াছিলাম। গোড়ার দিকে সুধীরবাবু বেশ ধীরেসুস্থেই কথাটা ঠাকুরের নিকট পাড়িয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের কথাবার্ত্তার ধরণে তিনি ক্রমেই উত্তেজিত হইতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাহার গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়া গেল, পঞ্চমের নীচে আর নামিতেই চাহিল না। ঠাকুরও বেশ জোরের সহিতই তর্ক চালাইতেছিলেন এবং সুধীরবাবুর একটা কথাও তিনি মানিয়া লইতে চাহিতেছিলেন না, কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে ঠাকুরের মধ্যে কোন প্রকারের কোন চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার লেশমাত্রও নাই, তিনি তাঁহার সেই স্বাভাবিক একটানা সুরেই কথা বলিয়া যাইতেছেন। গালিবর্ষণ হইতেছে অথচ কোন চিত্তবিক্ষোভ নাই, যিনি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহাকে সহজে বুঝান যাইবে না। কত বিভিন্ন লোককেই না কত বিভিন্ন কথা লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিতে দেখিলাম—কেহ আসিলেন কন্যার শুভ বিবাহের খবর লইয়া, কেহ বা কন্যার বৈধব্যের সংবাদ লইয়া আসিলেন; কেহ আসিলেন নূতন চাকুরীতে বাহাল হইয়া, কেহ বা পদচ্যুত হইয়া আসিলেন; কেহ আসিলেন কোন নিকট আত্মীয়ের মরণাপন্ন অসুখের সংবাদ লইয়া, কেহ বা সরকারী খেতাব পাইয়া আহ্লাদে ডগমগ হইয়া ঠাকুরকে সেই খবর নিবেদন করিতে আসিলেন—সর্ব্বদাই দেখিয়াছি যে ঠাকুর এই বিভিন্ন সংবাদগুলি ঠিক এক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, কোন ইতর বিশেষ কখনও দেখি নাই। কোন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গের মৃত্যু সংবাদ শুনিলে কেহ যে সম্পূর্ণ অবিচলিত

থাকিতে পারেন, ইহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না। অন্ততঃ একটু আধটু "আহা, উহু" অথবা "কবে মারা গেলেন, কি হইয়াছিল" এই জাতীয় কিছু না কিছু বলিতেই হয়। ঠাকুরের নিকটে বসিয়া তাঁহার নিতান্ত অনুগত কতিপয় ব্যক্তির মৃত্যু-সংবাদ পাইতে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি কিন্তু ঠাকুর যেমন ছিলেন ঠিক তেমনই রহিয়াছেন, এই মর্ম্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদগুলি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। আমার মনে হইয়াছে যে "অমুকে মারা গিয়াছে" আর "ইলিশ মাছ আসিয়াছিল" এরূপ দুইটি কথাও যেন ঠাকুরের দৃষ্টিতে পার্থক্যশূন্য। আমার এক কন্যার মৃত্যুর কয়েক দিন পরে ঠাকুর আমার বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় আসিয়াছিলেন। সান্ত্বনাচ্ছলে আমাকে বলিয়াছিলেন: "কেহ তো মরে না, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসে, এতো দেখতেই পাওয়া যায়।" সুতরাং মৃত্যুকে যে তিনি আমাদের দৃষ্টিতে না দেখিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বহুদিন যাবৎ ঠাকুরের নানাবিধ আচরণ অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করিয়া এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়াছে যে প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করিয়া যাইত, ঠাকুর সর্ব্বদা আত্মস্থ হইয়াই থাকিতেন। কথাটা ভবিষ্যতে আবার উঠিবে এবং আমি ভরসা করি যে ঠাকুরের কয়েকটি অত্যদ্ভুত আচরণের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাকে আরও পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইব। যাহাই হউক, আর একটি সামান্য ব্যাপারের উল্লেখ করিলেই আপাততঃ আমার বক্তব্য শেষ হইয়া যায়। ঠাকুর তখন আমার বিডন

ষ্ট্রীটের বাসায় ছিলেন। সকাল বেলা বাহিরের ঘরে ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল যে কলেজে যাইতে হইবে সুতরাং সময়টা একবার দেখা দরকার। আমার নির্দ্দেশ ক্রমে আমার ভৃত্য দামু ভিতর হইতে আমার হাতঘড়িটি আমাকে আনিয়া দিল, দেখিলাম যে ঘড়িটা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, আগের দিন দম দিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল। আমি দামুকে সময়টা নীচের দোকান হইতে দেখিয়া আসিতে বলিতেই ঠাকুর বলিলেন যে ৯।১৮ মিনিট হইয়াছে। আমি ঠাকুরের কথাটা তেমন গ্রাহ্য না করিয়া দামুকে নীচে পাঠাইয়া দিলাম, সে আসিয়া বলিল যে ৯।২০ মিনিট হইয়াছে। ঠাকুর এমনভাবে আমার দিকে তাকাইলেন যে আমি একটু লজ্জিতই হইলাম। ব্যাপারটা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আরও কয়েকবার ঠাকুরের নিকট সময়টা জানিয়া লইয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়াছি যে প্রতিবারেই ঠাকুর নির্ভুল সময়টি বলিয়া দিয়াছেন। পরে আমার এমন একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে ঠাকুর আমার বাসায় উপস্থিত থাকোকালীন ঘড়ি মিলাইবার প্রয়োজন হইলে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াই ঘড়ি মিলাইতাম। তাহাতে কখনও কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। দু'এক মিনিটের গরমিল যে কখনও হয় নাই এমন নহে, কিন্তু অনুসন্ধানে বুঝিয়াছি যে সেজন্য আমার ঘড়িই দায়ী, ঠাকুর দায়ী নহেন।

আমি ভরসা করি যে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষাংশে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই পাঠক-পাঠিকারা ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন

ষষ্ঠ অধ্যায়

১

৺কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় যে দিন ঠাকুর দর্শনে আসিয়াছিলেন, তাহার ৩।৪ দিন পরের কথা। ঠাকুরের অসুখ ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল, প্রত্যহই একবার, কোন দিন বা দুইবার, তাঁহাকে দেখিয়া আসিতাম। সেদিন প্রাতঃকালে ঠাকুর দর্শনে আসিলাম। আমি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিতেই প্রভাতবাবু বলিলেন: "তোমাকে একটা শুভ সংবাদ দেই, কাল হইতে মাছ ছাড়িয়া দিয়াছি, দু'চার দিনের মধ্যে আতপও ধরিব। ভাবিয়া দেখিলাম যে আতপ-নিরামিষ না খাইলে ইষ্টকর্ম্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় না।" এই কথা বলিয়া মনের উপর খাদ্যের প্রভাব, আমিষ ও নিরামিষের গুরুতর পার্থক্য, ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি বচন উদ্ধার করিয়া একটি অতি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। ঠাকুর নীরবেই রহিলেন, ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। প্রভাতবাবুর বক্তৃতা আমার উপরে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সুতরাং মনে মনে স্থির করিলাম যে ঠাকুরকে নিরিবিলি কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কিন্তু সে দিন আর সুযোগ হইল না।

পরের দিন বেলা প্রায় ৮'টার সময় আবার ঠাকুর দর্শনে আসিলাম। একতলায় মতিবাবুর সঙ্গে দেখা হইল, তিনি বলিলেন: "প্রভাতবাবুর খুব দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এদিকে নিরামিষ ধরিয়াছেন, আবার গতকাল হইতে সঙ্কল্প

করিয়াছেন যে প্রত্যহ এক অনুধ্যায় করিয়া ভাগবত পাঠ করিবেন। ঠাকুর যখন উপস্থিত থাকিবেন তখন তাঁহাকে শুনাইয়াই ভাগবত পাঠ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। এখন উপরে ঠাকুরের ঘরে পাঠই চলিতেছে।" আমি আগ্রহ সহকারে উপরে যাইয়া দেখিলাম যে বাস্তবিকই প্রভাতবাবু নিবিষ্টমনে ভাগবত পড়িতেছেন এবং ৩।৪ জন ভদ্রলোক বসিয়া শুনিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সেই ঘরের বাহিরে ছোট্ট একটি ছাদ ছিল, সেই ছাদে দাঁড়াইয়া এক ভদ্রলোক সিগারেট টানিতেছিলেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া দাঁড় করাইলেন এবং বলিলেন যে কাল রাত্রে তাহার বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। কিছু গয়নাগাটি ও তিন শত টাকা নগদ লইয়া গিয়াছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "ঠাকুর থাকিতে আমার এই সর্ব্বনাশ হইল কেন?" ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্যবশতঃ কথাটা প্রভাতবাবুর কানে গিয়াছিল। আর যায় কোথায়? প্রভাতবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন: "ঠাকুরালি ছাড়িয়া এইবার চৌকিদারী ধরুন, নতুবা ভক্তমণ্ডলীর হাতে আপনার নিস্তার নাই।" তারপর আরম্ভ হইল সেই ভদ্রলোকের পালা, প্রভাতবাবু তাহাকে একেবারে যাচ্ছেতাই করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কি দরওয়ান, না চৌকিদার যে তাহার বাড়ীর খবরদারী করিবেন, তিনি কি এই সব মতলব লইয়াই ঠাকুরের কাছে আসিয়াছেন, তবে যেন আর ভবিষ্যতে না আসেন, নতুবা খুনাখুনি হইয়া যাইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কতক্ষণ এরূপ চলিত বলিতে পারিব না, কারণ প্রভাতবাবু অত্যন্ত চটিয়াছিলেন এবং তাহার

মুখ একবার ছুটিলে সহজে বন্ধ হইতে চাহিত না। কিন্তু হঠাৎ ঠাকুর প্রভাতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "এইটা পড়তে আছেন কোন অধ্যায়?" আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম, প্রভাতবাবুরও চমক ভাঙ্গিল এবং মনে হইল যে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছেন। হাত হইতে ভাগবতখানা ঠাকুরের বিছানার উপর ফেলিয়া রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঐ ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া নীচে চলিয়া গেলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

নীচে যাইয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা ঐ ভদ্রলোককে শান্ত করিতে সমর্থ হইলাম। তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী লোক ছিলেন এবং কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতে চাহিতেন না। প্রভাতবাবুর গালাগালিতে তিনিও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ঐ ভদ্রলোকও স্বীকার করিলেন যে এভাবে কথাটা বলা তাহার সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু এখন ভাবি যে ভদ্রলোক এমন কি অন্যায় করিয়াছিলেন। তাহার একমাত্র অপরাধ যে তিনি কথাটা সোজা এবং সরলভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরমার্থ আমাদের অনেকের কাছেই শুধু কথার কথা মাত্র, বৈষয়িক স্বার্থের সঙ্গে ঠাকুরকে যে কতকটা জড়াইয়া লই না, একথা বোধ হয় হলফ করিয়া কেহই বলিতে পারি না। এই প্রসঙ্গে অনেক কথাই মনে হইতেছে। শুনিয়াছি যে এক ভদ্রলোকের কন্যা আত্মহত্যা করিয়াছিল এবং পরের দিনই তিনি ঠাকুরের ফটোখানা আসন হইতে তুলিয়া পুকুরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কোন গুরুতর বিপদে পড়িলে অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি: "তাহা

হইলে ঠাকুর আছেন কি জন্য ?” অর্থাৎ ঠাকুরের কাজ হইল চৌকিদারী, খবরদারী, সর্ব্বপ্রকারে আমাদের সেবা। সে যাহাই হউক, প্রভাতবাবু বাড়ী চলিয়া গেলেন, ভবিষ্যতে আর কখনও তিনি নিয়মিতভাবে ভাগবত পাঠের চেষ্টা করেন নাই। আমি আবার ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিলাম, কিন্তু সে দিনও আমার সেই “মাছ ছাড়িবার” কথাটা উত্থাপন করিবার সুযোগ হইল না।

পরের দিন কলেজ ছিল না, একটু দেরী করিয়াই ঠাকুরের কাছে আসিলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল, দেখিলাম যে তিনি একাই বসিয়া রহিয়াছেন, নিকটে কেহই নাই। আমি যাইয়া প্রণাম করিতেই তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার বিছানার উপর একটি নস্যির কৌটা ছিল, তিনি কৌটাটি হাতে তুলিয়া লইলেন এবং একান্ত মনে উহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। আমি বসিয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলাম। ঠাকুর কৌটাটি একবার খুলিলেন, আবার বন্ধ করিলেন, তারপর কাপড়ের খুঁট দিয়া অতি যত্নসহকারে কৌটাটি ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। একবার কৌটাটি ঘষেন, একটু থামিয়া চোখের সম্মুখে আনিয়া নিবিষ্ট মনে দেখেন, আবার ঘষেন, আবার দেখেন, এইরূপ প্রায় ২০ মিনিট ধরিয়া চলিল। আমি যে সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছি সে খেয়ালই যেন ঠাকুরের নাই। চাহিয়া দেখিলাম যে ঠাকুরের মুখখানা আনন্দে যেন একেবারে ডগমগ হইয়া উঠিয়াছে, আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঠাকুরের এই ভাব যে সেদিনই প্রথম দেখিলাম তাহা নহে, পূর্ব্বেও বহুবার দেখিয়াছি, পরেও দেখিয়াছি, কিন্তু যখনই দেখিয়াছি তখনই মুগ্ধ

হইয়াছি। "অহৈতুকী আনন্দ" বলিয়া একটা কথা শোনা যায়, বোধ হয় ইহাই সেই আনন্দ। হেতুটা নগণ্য, নাই বলিলেও চলে, শুধু একটা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু আনন্দের যেন তুফান বহিয়া যাইতেছে। হেতু ভিন্ন কোন কিছুর একটা কল্পনাও আমরা করিতে পারি না, সুতরাং প্রকৃত আনন্দ যে কি তাহার কোন ধারণাই আমাদের নাই। সামান্য একটা অকিঞ্চিৎকর কথা বা ব্যাপার লইয়া বহুক্ষণ অনাবিল আনন্দে মাতিয়া থাকিতে পারে এরূপ লোক যে দেখি নাই এমন নহে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। লাভ লোকসানের খতিয়ান অন্ততঃ কিছুটা না ছাড়িতে পারিলে আনন্দের কাছেও ঘেঁষা যায় না। ছেলে বয়সে দেখিয়াছি যে শেষরাত্রে কবিগান আরম্ভ হইয়াছে, সরঞ্জামের মধ্যে একটি ঢোল ও একটি কাঁসি, উপরে সামিয়ানার পরিবর্ত্তে ২।১ খানা নৌকার পাল টানান, আর বসিবার জন্য হোগলা এবং চাটাই। কিন্তু এই সামান্য আয়োজনের মাধ্যমে যে আনন্দের তুফান বহিতে দেখিয়াছি, তাপ-নিয়ন্ত্রিত হলঘরে গদি আঁটা চেয়ারে বসিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত সবাক-চিত্র দেখিয়া বাবুরা যে সে আনন্দের সামান্য একটু অংশও উপভোগ করিতে পারেন না তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। এমন কত লোক দেখিয়াছি যে মাছের ডুলা ও দুধের ঘটি লইয়া বাজারে যাইবার পথে কবির আসর দেখিয়া তাহাতে বসিয়া গিয়াছে, বৈকালে আসর ভাঙ্গিলে খেয়াল হইয়াছে যে বাজারও হয় নাই, খাওয়াও হয় নাই। বাবুরা হয়তো বলিবেন যে ইহাদের সময়ের মূল্যজ্ঞান নাই, দায়িত্ব বোধ নাই, ইহাদের

কথা না তোলাই ভাল। কিন্তু আমি বলিব যে সময়ের মূল্যজ্ঞান ও দায়িত্ব বোধ টনটনে রকমের থাকিলে, অর্থাৎ অন্ততঃ কিছুটা আত্মভোলা হইতে না পারিলে আনন্দের নাগাল পাওয়া যায় না। কি করিলে কি হইবে, এটা করিলে ওটা হইবে, এই জাতীয় চিন্তা আমাদিকে এমন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলিতেছে যে আমাদের জীবনে আনন্দ ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। আমার এক সময়ে ফুটবল খেলা দেখিবার বাতিক ছিল। গোড়ার দিকে দেখিয়াছি যে দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই খেলা দেখিতেই যাইতেন এবং খেলা উপভোগ করিতেও জানিতেন। কোন বিশেষ দলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, অথবা সাধারণভাবে কোন দলের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে মর্য্যাদা দিবার এবং তাহাদের ক্রীড়ানৈপুণ্যকে তারিফ করিবার মত উদারতা অনেকেরই ছিল। সুতরাং তাঁহারা খেলার মাঠ হইতে কিছুটা আনন্দ লইয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু শেষের দিকে দেখিয়াছি যে বাস্তবিক খেলা দেখিতে কেহ আসে না, অধিকাংশই আসে "গোল" দেখিতে, এবং সেই "গোল" স্বপক্ষের না হইয়া বিপক্ষের হইলেই রেফারী বেচারার বিপদ ঘনাইয়া উঠে। আরো অনেক কিছুই বলিতে পারি, কিন্তু আমার মনে হয় যে তাহা নিষ্প্রয়োজন। বলিতেছিলাম অহৈতুকী আনন্দের কথা। এ বিষয়ে আমার নিজের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই কথাটা তুলিতে সাহসী হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহা এমন বস্তু যে একে অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারে না, নিজে নিজেই বুঝিয়া লইতে হয়।

আবার ঠাকুরের কথায় ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। প্রায় ২০ মিনিট পরে ঠাকুর নস্যির কৌটাটা রাখিয়া দিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া মৃদু একটু হাসিলেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমি কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই টেবিলের উপর হইতে দোয়াত ও কলমটি লইয়া পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। কথাটা বুঝাইবার জন্য এইখানে ঘরটির একটা বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। উত্তর দক্ষিণে লম্বা ছোট্ট একখানি ঘর, দৈর্ঘ্য ১০ ফুট এবং প্রস্থে ৮ ফুটের বেশী হইবে না। দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁসিয়া ঠাকুরের বিছানা, তাহার উত্তরে আমাদের জন্য একখানা সতরঞ্চি, পূর্ব্বদিকে একটি দরজা ও একটি জানালা, পশ্চিম উত্তর কোণে অতি ছোট একখানা টেবিল। এই টেবিল-খানার উপরেই দোয়াত ও কলমটি ছিল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া অনায়াসে জিনিষ দুটি তুলিয়া লইয়া ঠাকুরকে দিতে পারিতাম, আমার উঠিবারও প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ঠাকুর আমাকে কিছু বলিলেন না, নিজেই উঠিয়া দোয়াত ও কলমটি লইয়া আসিলেন। বরাবরই দেখিয়াছি যে যে-কাজ নিজে করা সম্ভব, তাহার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে ঠাকুর সহজে চাহিতেন না। এই জন্য তাঁহার সহিত অনেক সময়ে ছোটখাট কলহ বাধিয়া যাইত। শৌচ হইতে ফিরিয়া নিজেই ঘটি মাজিতে বসিয়া গেলেন, জোর করিয়া ঘটি কাড়িয়া লইলাম, নিজের বিছানাখানা নিজেই ঝাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলেন, বলপূর্ব্বক বাধা দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম, এরূপ ব্যাপার হামেশাই ঘটিত। এই ছোটখাট ব্যাপারগুলি

অনেক সময়েই আমাকে ভাবাইয়া তোলে। আমি অতিমাত্রায় তামাকপ্রিয়, কলকি এক প্রকার জুড়ায় না বলিলেও চলে, সুতরাং এই তামাক সাজার ব্যাপার লইয়া একটা খিটিমিটি লাগিয়াই থাকে। এত তামাক সাজা সহজ ব্যাপার নহে, সুতরাং চাকরেরাও বিরক্ত হয়, ছেলে মেয়েরাও এড়াইয়া চলিতে চায়। আবার এদিকে এই তামাকের ব্যাপারে সামান্য একটু অব্যবস্থা হইলেই আমার মেজাজ তিরিক্ষি হইয়া উঠে, হাঁকডাক করিয়া একটা অনর্থ বাধাইয়া তুলি। অনেকবার ভাবিয়াছি যে সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই তো এই গোলযোগের মীমাংসা হইয়া যায়। অতি সহজ মীমাংসা তামাক ছাড়িয়া দেওয়া কিন্তু আমি সে মীমাংসার কথা বলিতেছি না। হাঁকডাক করিয়া এবং মেজাজ খারাপ করিয়া যে-শক্তির অপচয় করি তাহার সিকি খরচেই বোধ হয় তামাকটা নিজেই সাজিয়া লওয়া যায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এতদিন ধরিয়া ঠাকুরের সঙ্গ করিলাম, কত দেখিলাম, কত শুনিলাম, কিন্তু শিখিলাম না কিছুই। সে যাহাই হউক, আমার যে ঠাকুরকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, হঠাৎ মনে হওয়ায় তাঁহাকে বলিলাম : "প্রভাত মাছ ছাড়িয়া দিল, আমিও তা'হলে মাছ ছাড়িয়া দেই।" ঠাকুর বলিলেন : "আপনি মাছ ছাড়তে যান কেন, যখন ছাড়িবার মাছই আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে।" প্রভাতবাবুর বক্তৃতার প্রভাবটা এই তিন দিনেই অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল, ঠাকুরের কথায় আর তাহার চিহ্নও রহিল না।

২

এখানে আমাকে আবার একটা বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সেইজন্য গোড়াতেই পাঠক-পাঠিকাদের মার্জ্জনা চাহিয়া লইতেছি। সংযম ও নিয়ম মনুষ্য জীবনে অপরিহার্য্য। ইহার অন্ততঃ কিছুটা না থাকিলে কি সমাজ-জীবন, কি রাষ্ট্র-জীবন, কিছুই অব্যাহত রাখা যায় না। কোন ক্ষেত্রে, কোন অবস্থাতেই উচ্ছৃঙ্খলতাকে কেহই সমর্থন করেন নাই। ধর্ম্ম-জীবনেও এই সংযম ও নিয়মের স্থান সুনির্দ্দিষ্টই আছে এবং প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই নানাবিধ বিধি-নিষেধ প্রচলন করিয়া এই সমস্যার সমাধানে যত্নবান হইয়াছেন। আবার ইহাও দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ যৌক্তিকতার গণ্ডী ছাড়াইয়া উৎকট আকার ধারণ করে। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ইতিহাসেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। কোনও এক মঠে আমাকে একটা দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সকাল বেলা আন্দাজ ৭।৩০ টার সময় এক মঠবাসী আসিয়া আমাকে বলিলেন : "বালক-ভোগ প্রস্তুত, আপনি স্নান করিয়া আসুন, প্রসাদ পাইবেন।" শীতের সকাল, তখন স্নান করিবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু মঠবাসীর আগ্রহাতিশয্যে যাইতে হইল, কোন প্রকারে স্নান করিয়া আসিলাম। মঠবাসী আমাকে একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসিবার জন্য একখানি কুশাসন পাতিয়া দিলেন এবং এক গ্লাস জল আনিয়া দিলেন। পরে একখানি ছোট পাথরের থালায় চারখানা লুচি, কিছু হালুয়া, কয়েক টুকরা ফল

এবং একটা লাড্ডু আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিলেন। আমি "প্রাপ্তিমাত্রেণ" নীতির অনুসরণ করিয়া কেবল হাত বাড়াইয়াছি, অমনি ঐ মঠবাসী একেবারে 'হা হা' করিয়া উঠিলেন। তারপর আরম্ভ হইল এক নির্য্যাতনের পালা। এমন বিপদে আমি জীবনে অল্পই পড়িয়াছি। বাঁ হাত কোথায় রাখিব, ডান হাতে কি ভাবে লুচিখানা লইতে হইবে, চিবাইবার সময় ঠোঁট ফাঁক হইতে পারিবে না, আবার হাত না ধুইয়া অন্য কিছু তুলিয়া লওয়া চলিবে না, এক কথায় মঠবাসীর অত্যাচারে আমার প্রসাদ পাওয়া তালুতে উঠিয়া গেল। এক সপ্তাহ থাকিব বলিয়া গিয়াছিলাম, সেইদিন বৈকালেই পলাইয়া আসিলাম।

বিধি-নিষেধের এই জাতীয় বিকৃতি আরও বহু দেখিয়াছি এবং কোন কোন তথাকথিত প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগের মধ্যেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রম, সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে প্রয়োজন মতই বিধি-নিষেধের প্রচলন হইয়া থাকে এবং ইহারা একেবারে অসহনীয় হয় না। আমাদের ঠাকুরের কিন্তু বিধি-নিষেধের বালাই ছিল না। তবে কি তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন? আমি মাছ ছাড়িতে চাহিলাম, তিনি বলিলেন যে যখন ছাড়িবার মাছই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে। এ কথার তাৎপর্য্য কি? আমি কি ইহাই বুঝিব যে আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া যাই, ভালমন্দ দেখিবার প্রয়োজন নাই, যখন যেটা ছাড়িবার আপনিই ছাড়িয়া যাইবে। উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া ইহাকে তো অন্য কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু কথাটা এত সহজ নহে। ঠাকুর আমাকে

মাছ ছাড়িতে নিষেধ করার কারণ এও হইতে পারে যে বাহ্যতঃ মাছ ছাড়িলেও আমি হয়তো (হয়তো কেন নিশ্চয়ই) মনে মনে মাছ খাইতাম এবং আমাকে এই পাটোয়ারী হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ঐরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। আমি এক ভদ্রলোকের কথা জানি যিনি কিছু দিনের জন্য মাছ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন কিন্তু প্রত্যহ বাজার আসিলেই কি মাছ আসিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতেন এবং কি ভাবে কি রান্না হইবে তাহার ব্যবস্থাও করিয়া দিতেন। একদিন আমি সেই ভদ্রলোকের বাহিরের ঘরে বসিয়া তাহার সহিত গল্পগুজব করিতেছিলাম, এমন সময় বাজার আসিয়াছে দেখিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। পোনা মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের ভাপা, আর চুনো মাছের টকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আমি বলিলাম : "আপনি তো মাছ ছাড়িয়াই দিয়াছেন, তবে এই মাথাব্যথা কিসের জন্য ?" তিনি বলিলেন : "তোমার বৌদির একটা মস্ত দোষ কি জান, এই মাছের ব্যবস্থাটা তিনি মোটেই করিতে পারেন না, তাই ব্যবস্থাটা ক'রে দিয়ে এলুম। ওরাই খাবে ভাল, আমার আর কি ?" ভদ্রলোকের স্ত্রী আমার সম্মুখে বাহির হইতেন না কিন্তু আজ তিনি সে কথা ভুলিয়া গেলেন, তিনি নিকটেই কোথাও ছিলেন এবং কথাগুলি তাহার কানে গিয়াছিল। তিনি সটান ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং স্বামীকে মিথ্যাবাদী ভণ্ড ইত্যাদি বলিয়া খুব এক হাত লইলেন। হঠাৎ বোধ হয় তাহার হুঁস হইল যে আমি সেখানে বসিয়া আছি, তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

এই ভদ্রলোক সামান্য কয়েক দিন পরেহ মাছ ধারয়াছিলেন। গীতায় যে মিথ্যাচারের কথা আছে, ইহাও তাহাই। বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া মনে মনে বিষয়ানুসরণই এই মিথ্যাচার, পাটোয়ারীরই নামান্তর। মাছ ছাড়িতে নিষেধ করিয়া ঠাকুর আমাকে এই পাটোয়ারীর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাতেও কথাটার সুমীমাংসা হইল না। প্রশ্নটা উঠিয়াছিল এই যে কোন প্রকারের বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা না করিলে প্রকারান্তরে উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় কিনা। ঠাকুর বলিতেন যে মন বুদ্ধির ছটফটানি ও ইন্দ্রিয়গ্রামের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ করিতে হইলে নিজেরই শক্তি ক্ষয় হয় মাত্র, লাভ কিছুই হয় না। সুতরাং সেরূপ কোন চেষ্টা না করিয়া নিজের ইষ্টকর্ম্মে যথাসম্ভব লিপ্ত হইয়া থাকার চেষ্টাই প্রকৃত পথ। মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সহিত যতই যুদ্ধ করিবে ততই তাহাদের অত্যাচার বাড়িবে বৈ কমিবে না এবং নিজেকেই ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে। অতএব ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিতে নাই, লক্ষ্য রাখিতে হইবে নিজের ইষ্টনিষ্ঠার দিকে। এক দিক স্থির হইয়া আসিলে অপর দিক আপনিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তাহার জন্য আর পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না। একখানি পত্রে ঠাকুর লিখিয়াছিলেন: "বাসনাদি যাহা রজগুণের তরঙ্গ তাহারা সকলই উদয় হইয়া অস্ত হইবে। তাহাদের তাড়না জালের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আপন ইষ্টসেবায় লক্ষ্য রাখিয়া যাইবেন। অচিরেই ভগবান এই মায়াক্ষেত্রের বিকার হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন সন্দেহ নাই। সাধ্যমতই ভগবানের সেবা

পরিচর্য্যা করিয়া যাইবেন। মনের চঞ্চলতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল সেবার আশ্রয়ে থাকিবেন। মনের ধর্ম্মই হইয়াছে চঞ্চল।” (বেদবাণী, প্রথম খণ্ড, ৪৪নং)। একদিন ঠাকুর আমার নিকট হইতে একখানা কাগজ ও একটি পেন্সিল চাহিয়া লইলেন। কাগজখানাতে একটি গোলাকার বৃত্ত আঁকিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি বিন্দু বসাইলেন। পরে কাগজখানা আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন : “এই যে বৃত্তটি দেখিতেছেন ইহাই হইল সীমাবদ্ধ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির অধিকারের পরিধি, আর আপনাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল এই বিন্দুটি। এই বিন্দুটির আয়তন যতই বাড়িবে, উহাদের অধিকারের পরিধি আপনিই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। আপনি এই বিন্দুটির সেবা পরিচর্য্যা লইয়াই থাকেন, উহাদের সহিত মিত্রতাও করিবেন না, উহাদের বিরোধিতাও করিবেন না।” সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঠাকুরের ব্যবস্থায় উচ্ছৃঙ্খলতার কোন কথাই উঠিতে পারে না। আমার সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে আমি নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছি যে এই পথই সহজ এবং স্বাভাবিক।

কিন্তু কথাটাকে আরও একটু তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। স্বভাবতঃ অতিচঞ্চল, প্রমাথী ও বলবান মনের নিগ্রহ বায়ুর নিগ্রহের ন্যায় কঠিন, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান বলিলেন যে অর্জ্জুন যাহা বলিলেন তাহা নিতান্তই সত্য, তথাপি “অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।” (গীতা ৬-৩৪) অর্থাৎ মন দুর্নিগ্রহ হইলেও অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া থাকে। পতঞ্জলিও তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন : “অভ্যাস

বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ”, অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই মনকে নিরোধ করিতে হয়। কিন্তু কথা হইল এই যে অভ্যাসকে হয়তো কিছুটা বুঝিতে পারি এবং প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিলে হয়তো ইহার মাধ্যমে কিছু ফলও পাইতে পারি, কিন্তু বৈরাগ্যকে আমি কোথায় খুজিয়া পাইব? “বিরাগী হইব” মনে করিলেই কেহ বিরাগী হইতে পারে না এবং বৈরাগ্য যে চেষ্টাসাপেক্ষ আমাদের অভিজ্ঞতাও তাহা বলে না। কেহ কেহ বলেন যে বিচারের সাহায্যে ধৈর্য্য সহকারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে বিষয়ের অনিত্যতা ও দুঃখস্বরূপতা উপলব্ধি হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যেরও উদয় হইতে পারে কিন্তু এরূপ যুক্তিও কতটা বিচারসহ, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বিষয়ের অনিত্যতা বুঝিতে বা বুঝাইতে বিশেষ কোন বেগই পাইতে হয় না। মরিতে যে হইবেই এবং মরিলে যে স্ত্রী, পুত্রকন্যা, বিষয়-আশয়, কিছুই সঙ্গে যাইবে না, এইটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি সকলেরই আছে, কিন্তু কৈ বৈরাগ্য তো আসে না। বিষয়ী লোকেরাও যে বিষয়ের দুঃখস্বরূপতা মোটেই বুঝিতে পারে না, তাহাও বলা যায় না। কখন কখন “দূর ছাই, এ সব আর ভাল লাগে না”, এমন কথা যে তাহারাও না বলে এমন নহে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, ফলে কিছুই হয় না। যে বিষয়ী সে বিষয় লইয়াই থাকে, বৈরাগ্য তাহার কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। সুতরাং সংসার যে অনিত্য এবং বিষয় যে শুধু সুখেরই কারণ নহে, দুঃখেরও আকর, ইহা বুঝিয়া লইতে বিশেষ কোন দুর্ব্বোধ্য যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শুধু বুঝিলে হইবে কি,

বৈরাগ্যের সন্ধান তাহাতে মিলে না। ঠাকুরের কোন কোন কথায় আমি বুঝিয়াছি যে প্রত্যেক মানুষই একটা বিশিষ্ট সত্ত্বা লইয়া জন্মায় এবং এই সত্ত্বায় যে-বস্তুর অধিষ্ঠান নাই, শত চেষ্টা করিলেও সেই বস্তু লাভ করা যায় না। আমার মনে হয় যে আমাদের অভিজ্ঞতাও ঠিক এই কথাই বলে। এমন লোকও দেখিয়াছি যিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বৈরাগ্য সম্বন্ধে হয় তো দু'চার ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া যাইতে পারেন এবং এই বিষয়ে অল্পায়াসেই একখানা মনোরম ও প্রামাণিক গ্রন্থও রচনা করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে তাহার একেবারে কড়াক্রান্তি হিসাব, কোথাও কিছু ফাঁকে পড়িবার জো নাই। বিচার-বুদ্ধির নিরসনই বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শ্রুতি বলিতেছেন :

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

অর্থাৎ "এই আত্মাকে বহু সাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ সহায়ে, অথবা ধারণাশক্তি সহায়ে, কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না।" এই কথাটা বুঝিয়া লইবার জন্যই বিচারের প্রয়োজন। কিন্তু ভিতরে বৈরাগ্যের অধিষ্ঠান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিচারের এই মূল উদ্দেশ্য আর স্মরণে থাকে না, তর্ক লইয়াই মাতিয়া উঠে এবং নিরর্থক তর্কজালে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। কবীরের একটি দোঁহাতে পড়িয়াছিলাম যে গাধা যেমন নানা প্রকারের বোঝা বহিয়া বেড়ায়, লবণও বহে, তুলাও বহে, আবার চন্দন কাঠও বহে, কিন্তু তাহাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না, পণ্ডিতেরাও সেইরূপ শাস্ত্রের বোঝা

ঘাড়ে লইয়াই বেড়ায়, তাহার মর্ম্মার্থ বোঝে না। ঠাকুর বলিতেন : "গ্রন্থ—গ্রন্থি", এবং বিচার ও তর্ককেই যাহারা সার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কখন কখন একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেন। যাহাদের গ্রাম্য জীবনের সহিত পরিচয় আছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই হয় তো দেখিয়া থাকিবেন যে একটা দড়ির এক প্রান্ত পাঁঠার গলায় বাঁধিয়া এবং অপর প্রান্ত একটা খুঁটিতে আটকাইয়া পাঁঠাকে গোছর দেওয়া হয়; উদ্দেশ্য যে পাঁঠাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইবে, অথচ ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু পাঁঠার এমন স্বভাব যে সে ঘুরিতেই থাকে, ফিরিবার কথা আর তাহার খেয়াল থাকে না এবং দড়িটা খুঁটিতে জড়াইতে জড়াইতে তাহার চরিবার স্থানও ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে। পরিশেষে তাহার গলাটা খুঁটিতে আসিয়া আটকাইয়া যায় এবং তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। তখনও যে একবার ফিরিলেই সে মুক্ত হইতে পারে, এই সহজ বুদ্ধিটা তাহার মাথায় আসে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে "ব্যা ব্যা" করিয়া ডাকিতে সুরু করে এবং তাহার ডাক শুনিয়া মালিক আসিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়। কেবলমাত্র তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে সত্য নিরুপণ করিতে গিয়া তার্কিকদেরও শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। সহজ রাস্তাটা যে সম্মুখেই পড়িয়া আছে, তাহা আর তাহাদের নজরে পড়ে না। পরিত্রাহি চিৎকার করিতে পারিলে হয়তো বা একটা উপায় হইয়া যাইত কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান আসিয়া রুখিয়া দাঁড়ায়, কাজেই কিছুতেই কিছু হয় না। কিন্তু ভিতরে যদি বৈরাগ্যের অধিষ্ঠান থাকে তাহা হইলে গ্রন্থ আর

গ্রন্থি হইয়া উঠে না, নানাভাবে সহায়তাই করে। মূল কথাই হইল বৈরাগ্য এবং আমরা দেখিলাম যে বিচারের দ্বারা এই বস্তু লাভ করা যায় না। এই বৈরাগ্য যাহার আছে তাহার আছে, যাহার নাই তাহার নাই, ইহা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না এবং চেষ্টার দ্বারাও ইহাকে অর্জ্জন করা যায় না। সুতরাং উপরোক্ত ভগবদ্বাক্যে "অভ্যাস" ও "বৈরাগ্য" এই শব্দ দুটিকে আলাদা না ধরিয়া একত্রেই ধরিতে হইবে এবং বাক্যটির অর্থ হইবে এই যে বৈরাগ্যের ভিত্তিতে ও সহায়তায় অভ্যাস-যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে দুর্নিগ্রহ যে মন তাহাও নিগৃহীত হইতে পারে। বৈরাগ্যবিহীন অভ্যাসের দ্বারা মনস্থির করিতে চেষ্টা করিলে হয়তো বা কিছু কিছু বিভূতি আয়ত্ত হইতে পারে কিন্তু কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কাজেই নিবৃত্তি-মার্গ সকলের জন্য নহে।

শুধু বৈরাগ্য কেন, চেষ্টার দ্বারা আরও অনেক কিছুই লাভ করা যায় না। একখানি পত্রে ঠাকুর লিখিয়াছিলেন : "বিবেক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে আপনি আপনিই সকল অভাব নাশ করিবে। চেষ্টা করিয়া বিবেকতা আসে না।" (বেদবাণী, প্রথম খণ্ড, ১৬০নং) কথাটা অত্যন্ত গুরুতর এবং আমাদের এই বিধি-নিষেধ প্রশ্নের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ কথা না বলিলেও চলে যে চেষ্টার দ্বারা মানুষ অনেক কিছু করিয়াছে ও করিতেছে। পিরামিড তুলিয়াছে, তাজমহল গড়িয়াছে, যুগে যুগে শিল্প, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, গীত, নৃত্য, বাদ্য, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির নানাবিধ অবদানে মানুষের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমান

যুগে বিজ্ঞানের এই যে বিস্ময়কর জয়যাত্রা এবং যান্ত্রিক সভ্যতার নানাপ্রকার উপকরণ ও উপঢৌকন, সমস্তই মানুষের চেষ্টাতেই হইয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষায়তনের মাধ্যমে মানুষকে অনেক কিছুই শিখাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই তাহা অন্ততঃ আংশিকরূপে শিখিয়া লইতে পারে। সাময়িক শিক্ষার প্রভাবে মানুষ যে কিছু দিনের মধ্যেই আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, সময়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি নির্দ্দেশগুলি আয়ত্ত করিতে পারে, এ কথাও বলিয়া বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না। আমি যদি মনে করি যে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিব, আহার ক্রমে সামান্য ফলমূলে আনিয়া দাঁড় করাইব, বাক্‌-সংযম অবলম্বন করিব, এবং নিদ্রার সময়টাকেও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া আনিব, আন্তরিক চেষ্টা করিলে কষ্টসাধ্য হইলেও ইহা যে অসম্ভব, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আন্তরিক চেষ্টা করিলে মানুষ অনেক কিছুই করিয়া উঠিতে পারে।

অনেকেই বলেন যে মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উঠিতেছে। বাহ্যতঃ দেখিতে গেলে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মানুষের মৌলিক বৃত্তিগুলির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না কেন? সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বৃত্তিগুলির প্রকাশভঙ্গীর কিছুটা প্রকার-ভেদ হইলেও ইহাদের মোট পরিমাপ যে কমিয়াছে, ইতিহাস তাহা বলে না। ইহার কারণ যে নিতান্ত দুরভিগম্য তাহাও মনে

হয় না। একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ক্রোধ, লোভ, হিংসা দ্বেষাদি বৃত্তিগুলির মূল হইল মানুষের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, লাভ লোকসান, শত্রু মিত্র, শুভ অশুভ, মানুষের এই যে দ্বন্দ্ববুদ্ধি, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই এই বৃত্তিগুলি আছে। অল্পায়াসেই বুঝা যায় যে এই দ্বন্দ্ববুদ্ধি না থাকিলে এই বৃত্তিগুলিরও কোন তৎপরতা থাকিতে পারে না। কিন্তু মানুষের নিজের দিকে দৃষ্টি দিবার আর ইচ্ছাও নাই, অবসরও নাই, বাহির লইয়াই সে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে। কত রঙিন স্বপ্নই না সে আজ দেখিতেছে, চাঁদে অভিযান পাঠাইবার প্রস্তুতি সুরু করিয়াছে, আণবিক শক্তির সাহায্যে পৃথিবীকে কল্পনাতীত প্রাচুর্য্যে ভাসাইয়া দিবে ভাবিতেছে, কিন্তু ভিতরে সে যে ইতর সেই ইতরই থাকিয়া যাইতেছে। বরং তথাকথিত প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকারের কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামি এই ইতরতার সঙ্গে মিশিয়া ইহাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে।

মানব-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিজের যে বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছে না, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই একথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। আমার স্থির বিশ্বাস যে আমি যে দ্বন্দ্ববুদ্ধির কথা বলিতেছিলাম, সেই দিকে দৃষ্টি না দিলে এবং তাহাকে অন্ততঃ কিছুটা সাম্যের দিকে আনিতে না পারিলে, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। কতকগুলি অসুস্থ লোকে মিলিয়া সুস্থ ও সুষ্ঠু কোন কিছুই গাড়িয়া তুলিতে পারে না।

যুগে যুগে মহাজনেরা নানাভাবে ও নানা ভাষায় এই

দ্বন্দ্বসাম্যের কথাই বলিয়া আসিতেছেন। যখনই মানুষ তাঁহাদের নির্দ্ধারিত পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছে তখনই পাইয়াছে শান্তি এবং কল্যাণ কিন্তু অনেকেই এই পথে হাঁটিতে চাহে নাই বা পারে নাই। মহাজনদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসিতেই শাঁস ছাড়িয়া খোসা লইয়া ঝগড়া সুরু করিয়াছে, অথবা তাঁহাদের নির্দ্দেশগুলির মতলবী ব্যাখ্যা করিয়া নিজেদের বৈষয়িক কার্য্যসিদ্ধির উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছে। হালফিলের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সেদিন ভগবান বুদ্ধকে লইয়া একটা নাচানাচি হইয়া গেল। এই তথাকথিত জয়ন্তীর কিছুদিন পূর্ব্বে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু বলিয়াছিলেন: "We have decided to celebrate the 2500 th anniversary of the death of Buddha, but without the religious colour", অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের দুই সহস্র পাঁচ শত বার্ষিক তিথিতে তাঁহারা একটা উৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মের কোন রঙ থাকিবে না। কথাটা পড়িয়া মোটেই বিস্মিত হইলাম না, কারণ এই শ্রেণীর প্রগতিপন্থীদের ধারণা হইল এই যে যাহার সহিত ধর্ম্মের কিছু না কিছু সংস্পর্শ আছে তাহাই প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু চিন্তিত হইলাম এই ভাবিয়া যে ধর্ম্মকে তাঁহার অবদান হইতে ছাটিয়া দিয়া বুদ্ধকে লইয়া যে অনুষ্ঠান হইবে তাহা কোন বুদ্ধের, প্রকৃত বুদ্ধের, না নেহেরুর বুদ্ধের? দুঃখাবসানের পন্থার অন্বেষণেই বুদ্ধ গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘ জীবনের অক্লান্ত সাধনায় তিনি যে

পথের সন্ধান দিয়াছিলেন, এক কথায় বলিতে গেলে, তাহা ত্যাগ ও সংযমেরই পথ। কিন্তু ইহাদের মতে আজিকার এই বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ যুগে বুদ্ধের এই জীর্ণ, পুরাতন ত্যাগের পন্থার আর কোন কার্য্যকারিতা নাই, উহাকে বাতিল করাই প্রয়োজন। দুঃখাবসানের জন্য ইহাদের পন্থা হইল সুখবৃদ্ধির চেষ্টা। ভালমন্দের কথায় আমার কোন প্রয়োজন নাই, আমার বক্তব্য হইল এই যে এই দুইটি পন্থার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই, ইহারা সম্পূর্ণ বিপরীত। যাঁহারা এই জয়ন্তী লইয়া মাতামাতি করিলেন তাহাদের প্রায় সকলেরই বুদ্ধের নির্দ্দেশিত পন্থার প্রতি আন্তরিক কোন শ্রদ্ধা নাই এবং তাঁহারা এই পথে চলিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ও অপারগ। তবে এই অনুষ্ঠানের অর্থ কি? অর্থ অতি সহজ, এই জয়ন্তী বুদ্ধের বিরাট ও সুমহান ব্যক্তিত্বকে নিজেদের কাজে লাগাইবার একটা কৌশল মাত্র। মানুষ যুগে যুগে ইহাই করিয়া আসিয়াছে, শালগ্রাম দিয়া শুধু বাটনাই বাটিয়াছে।

কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম যে বহুদিন পূর্ব্বে কোনও এক চিন্তাশীল প্রবন্ধকার মনুষ্য সমাজে যুদ্ধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছিলেন: "War will abolish itself by its own frightfulness", অর্থাৎ যুদ্ধের ভয়াবহতাই যুদ্ধের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটাইবে। এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা যুদ্ধের ভয়াবহতাকে সেই চরম স্তরেই আনিয়া ফেলিয়াছে এবং জনসাধারণও ক্রমে এই বিষয়ে অধিকতর সজাগ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানুষের লোভ ও হিংসা দুর্নিবার এবং এই জন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক অবিশ্বাস কিছুতেই

মিটিতে চাহিতেছে না। এই অবিশ্বাস ও তদানুষঙ্গিক ভীতি এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। এই জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন যে এতদুপলক্ষে বুদ্ধের অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া এবং বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধদিগের সঙ্গে নূতন করিয়া একটা যোগসূত্র স্থাপন করিয়া শান্তির ক্ষেত্রকে অন্ততঃ কিছুটা বিস্তৃত করিতে পারিবেন। কিন্তু গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কোন দিনই কোন ফল পাওয়া যায় না। যাহারা আসিল তাহারা তামাসা দেখিতেই আসিল ; গান, বাজনা শুনিয়া এবং নৃত্য ও অভিনয়াদি দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। বুদ্ধের প্রতি কোন আকর্ষণ লইয়া কেহ আসিলও না এবং কোন আকর্ষণ লইয়া কেহ ফিরিয়াও গেল না। আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার অভাবে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হইয়া গেল। যাহা হইল তাহাকে বুদ্ধের জয়ন্তী কোন ক্রমেই বলা চলে না, যাঁহারা নাচানাচি করিলেন ইহা তাহাদেরই জয়ন্তী। কেহ কেহ আবার এতদুপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধাদিতে বুদ্ধ ও গান্ধীজীকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন। একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা ও বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে বুদ্ধের অহিংসা ও গান্ধীমার্কা মতলবী অহিংসা এক বস্তু নহে। পরে প্রসঙ্গান্তরে কথাটা সবিস্তারে আলোচনা করিতে হইবে সুতরাং এখানে আর বিশেষ কিছু বলিলাম না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই যে নূতন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সার কথাগুলি লোকদিগকে শুনাইয়া দেওয়া হইল, ইহাতে কিছু কাজ তো হইলই। আমি

বলিব কিছুই হইল না। "অহিংস হও, অহিংস হও", এই উপদেশ শুধু শুনিয়া তো দূরের কথা, উপদেশানুসারে চেষ্টা করিলেও অহিংস হওয়া যায় না। মূল শিক্ষার সহিত সম্বন্ধ বজায় না থাকিলে শুধু নীতিকথা আওড়াইয়া কোন কাজই হয় না। আমাদের নেতাদের অনেককেই বলিতে শুনি যে ভারতীয় ঐতিহ্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল পরমতসহিষ্ণুতা (toleration) এবং কোনক্রমেই ইহাকে হারাইলে চলিবে না। কিন্তু এই সহিষ্ণুতা কোথা হইতে আসিল ? বহুকাল ধরিয়া একটা বিশিষ্ট জীবনাদর্শ অনুসরণের ফলেই ইহা আসিয়াছে এবং সেই আদর্শ বজায় না থাকিলে শুধু গলাবাজি দ্বারা ইহাকে বজায় রাখা যাইবে না। নেতাদের এই কথাগুলি শুনিলে আমার মনে হয় যে ইঁহারা যেন বলিতে চাহিতেছেন যে আমটি অতি রসাল ও মনোরম, ইহাকে কিছুতেই ছাড়া চলিবে না, কিন্তু আমগাছটা আবর্জ্জনা, উহাকে কাটাইয়া ফেলাই প্রয়োজন।

আবার ঠাকুরের কথায় ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। "চেষ্টা করিয়া বিবেকতা আসে না" ঠাকুরের এই কথাটা লইয়াই আলোচনা সুরু হইয়াছিল। ব্যাপারটা হইল এই যে অক্রোধ, অহিংসা, নির্লোভতা প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক ভাবে সোজাসুজি অর্জ্জন করিবার কোন উপায় নাই। বিনয়ী হইতে চেষ্টা করিলে মর্কট-বিনয়ী হয়তো হইতে পারা যায় কিন্তু প্রকৃত বিনয়ী হওয়া যায় না। যদি কেহ মনে করে যে সে অক্রোধ হইবে এবং সাধ্যানুসারে চেষ্টাও করে, সে অক্রোধ হইতে তো পারিবেই না, বরং সময় সময় এমন আচরণ করিয়া বসিবে যে অপরের হাস্য

সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এখানে একটা গল্প বলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। এক ভদ্রলোক নিয়মিত পাঠ শুনিতে যাইতেন। একদিন তিনি পাঠ শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহার স্ত্রী তখন রান্না ঘরে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহার হাতমুখ ধোয়া হইয়াছে কিনা এবং তাহার খাবার দেওয়া হইবে কিনা, জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া স্ত্রী দেখিলেন যে স্বামী বারান্দার এপাশ হইতে ওপাশ হামা দিয়া বেড়াইতেছেন। স্ত্রী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "ওকি হ'চ্ছে?" স্বামী উত্তর করিলেন: "পাঠক মশাই বলছিলেন কি না যে বালকভাবে থাকতে হয়, তাই একটু প্র্যাক্‌টিস্ ক'চ্ছি।" এটা হয় তো নিছক গল্পই কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে আমরা যে-কথাটা লইয়া আলোচনা করিতেছি, সে-সম্পর্কে ইহা মোটেই তাৎপর্য্যশূন্য নহে।

বিষয়টা একটু যত্ন করিয়া বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমি বলিতে চাহিতেছি এই যে অহিংসা, অক্রোধ, নির্লোভতা প্রভৃতিকে পৃথক ভাবে এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাইবার কোন উপায় নাই। ইহারা আসে উপযাত (by product) হিসাবে এবং যখন আসে এক সঙ্গেই আসে। অহিংস অথচ লোভী, অক্রোধ অথচ পরশ্রীকাতর, নির্লোভ অথচ ক্রোধী, এরূপ সমাবেশ সম্ভবপর নহে। এইগুলি সবই একসূত্রে গাঁথা, একটাকে ছাড়িয়া অন্যটা থাকিতে পারে না। এই জন্যই ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে বিবেক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে আপনি আপনিই সকল অভাব নাশ করিবে। রোগের মূল নির্ণয় না করিয়া একটি একটি করিয়া উপসর্গ-

গুলির চিকিৎসা করিলে রোগ তো নিরাময় হয়ই না, উপসর্গগুলিরও কোন ইতর বিশেষ হয় না। মূলে রহিয়াছে মানুষের দ্বন্দ্ববুদ্ধি এবং ঠাকুর রোগের এই মূল ধরিয়াই ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, উপসর্গগুলির উপরে কোন গুরুত্বের আরোপ করিতেন না। তিনি বলিতেন যে এই দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ যতই সাম্যের দিকে আসিবে, ক্রোধ, লোভ, হিংসাদ্বেষাদির অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইতে থাকিবে, তাহার জন্য আর পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না। এই জন্যই ঠাকুরের বিধি-নিষেধের কোন বালাই ছিল না।

কিন্তু আমি যাহা বলিলাম তাহা হইতে যদি কেহ ধারণা করিয়া বসেন যে ঠাকুর গৌণার্থমূলক অনুষ্ঠানাদির কোন মূল্যই দিতেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত ভুল বুঝা হইবে। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট দশবিধ সংস্কার, দেবগ্রহাদির সেবা পূজা, নানাবিধ পার্ব্বণ ইত্যাদি কোন ব্যাপারেই ঠাকুর কখন বিন্দুমাত্র অবহেলাও প্রকাশ করিতেন না, বরং যাহার যাহা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা যে যথাসাধ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এই উপদেশই তিনি দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত একত্রে কয়েকটি মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইয়া দেখিয়াছি যে সর্ব্বত্রই তিনি হাত তুলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মুখ্য নির্দ্দেশ ছাড়া অন্য কিছুরই তিনি মূল্য দিতেন না, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? কথাটা একটু যত্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। বিধি-নিষেধ ও নানাবিধ অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা সকল ধর্ম্মেই আছে, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এগুলি ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মলাভের কতকগুলি গৌণ উপায় মাত্র। সুতরাং মুখ্য লক্ষ্যে

অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি না রাখিলে উপায়গুলিই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসে এবং ধর্ম্ম তাহার সহজ, স্বচ্ছন্দ গতি হারাইয়া অনুষ্ঠানের আবর্ত্তে আটক পড়িয়া যায়। একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা প্রায় সকল ধর্ম্মেই আছে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তীর্থস্থানের ঐতিহ্য, তথাকার উন্নত ও পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া এবং সাধুসন্তদের সংস্পর্শের ফলে (বর্ত্তমানে আর এ সকলের বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই) তীর্থযাত্রীর চিত্তশুদ্ধিই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের দিকে সজাগ দৃষ্টি না থাকিলে তীর্থ-পর্য্যটন হয় শুধু ভ্রমণ বিলাসে পরিণত হয়, আর না হয় তীর্থভ্রমণই ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়, উপায়ই লক্ষ্যের স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমি এক ভদ্রলোককে জানিতাম যিনি সুযোগ পাইলেই তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া যাইতেন। ক্রমে তীর্থের নেশায় তাহাকে এমনভাবে পাইয়া বসিল যে তিনি তীর্থে তীর্থেই সময় কাটাইতেন, সাংসারিক কাজকর্ম্ম এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। তাহার সহিত আলাপ আলোচনায় স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি যে তিনি তীর্থ-পর্য্যটনকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছেন, ইহা যে একটা উপায়মাত্র সে বোধই তাহার নাই। ঠাকুরের কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে লক্ষ্য স্থির থাকিলে উপায়গুলি উপায়ই থাকিয়া যায় এবং লক্ষ্যে পৌঁছিতে সহায়তাই করে কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে বাঁধক হইয়া দাঁড়ায়। লক্ষ্যের দিকে অনেকটা আগাইয়া গেলে উপায়ের আর কোন প্রয়োজনই থাকে না, তখন সাধক মুক্তকণ্ঠে গাহিতে পারেন :

"কাজ কি আমার গয়া কাশী,
মায়ের পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।"

আরও একটি অত্যন্ত গুরুতর কথার এইখানেই আলোচনা করা সঙ্গত মনে হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক মানুষ একটা বিশিষ্ট সত্ত্বা লইয়া জন্মায় এবং যাহা লইয়া সে আসে নাই তাহা কিছুতেই অর্জ্জন করিতে পারে না। শুধু ইহাই নহে। ঠাকুরের কোন কোন কথায় আমার ইহাও মনে হইয়াছে যে প্রত্যেকেরই সত্ত্বায় একটা বৈশিষ্ট্য থাকে এবং কখন কখন সাময়িক বিকৃতিতে পড়িলেও ইহার স্থায়ী কোন পরিবর্ত্তন হয় না। জীবনের নানা প্রকার সম্পদ ও বিপদের ভিতর দিয়াও এই বৈশিষ্ট্য অবিকৃতই থাকে। কথাটা অত্যন্ত বিতর্কমূলক এবং আমাদের চিরাগত সংস্কারের এত বিরুদ্ধ যে ইহাকে মানিয়া লওয়া সহজ নহে। এখনই হয়তো আপত্তি উঠিবে যে আমি পূর্ব্বে "পাটোয়ারী" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার সহিত আমার এই কথার সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু আমি বিকৃতি হিসাবেই পাটোয়ারীর আলোচনা করিয়াছি, স্বাভাবিক পাটোয়ারীর কথা বলি নাই। সে যাহাই হউক, গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি যে যুক্তিতর্কের দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইবে না, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ইহার বিচার করিতে হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই কথাটা লইয়া এক ভদ্রলোকের সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল। তিনি আমার এই সিদ্ধান্ত মানিতে চাহিলেন না এবং প্রতিবাদে দস্যু রত্নাকর ও জগাই মাধাই'এর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। উপর-উপর দেখিলে এই

দুইটি দৃষ্টান্তই আমার কথার অসারতা প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। মায়ামমতালেশশূন্য, পাষাণ-হৃদয়, দুর্দ্দান্ত দস্যু রত্নাকর ঋষিশ্রেষ্ঠ বাল্মিকীতে পরিণত হইয়া গেল; আর উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট, মদ্যপ জগাই মাধাই হইল মহাপ্রভুর দুই পরম ভক্ত ও একনিষ্ঠ সেবক,—এতৎসত্ত্বেও কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে মানুষের সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য বদলায় না, একই থাকে। কিন্তু আর একটু তলাইয়া দেখিলে কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইবে না। রত্নাকর দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিল সন্দেহ নাই এবং এই ব্যাপারে তাহার কোন দয়ামায়াও ছিল না। কিন্তু তাহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—সে যাহা করিত সরল, অকপটভাবেই করিত, ন্যায়-অন্যায়ের কোন দ্বন্দ্ব তাহার ভিতর ছিল না। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ইংরাজীতে যাহাকে "hardened criminal" বলে, অর্থাৎ পাপাচরণ করিতে করিতে যে এমন অভ্যস্ত ও হৃদয়হীন হইয়া যায় যে তাহারও আর ভাল মন্দ বোধ থাকে না, রত্নাকর যে এই শ্রেণীরই একজন ছিল না, তাহাই বা কি করিয়া বুঝিব? কিন্তু একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। একজন গৃহী হিসাবে রত্নাকরের কোন ত্রুটি ছিল না। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য এবং সংসারের অন্যান্য যাবতীয় কর্ত্তব্য সে যথাযথ ভাবেই সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিত। কোন পাপাচরণে অত্যন্তাভ্যস্ত, কঠিনীকৃতহৃদয় দুষ্কৃতকারীর সম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। সুতরাং সাধারণ পাপাচারীদের গণ্ডিতে রত্নাকরকে ফেলিলে চলিবে না; তাহার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তাহা হইল তাহার অকপটতা। জগাই মাধাই'এর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও এই অকপটতাই

পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। তাহারা যাহা করিত প্রকাশ্যেই করিত, কোন প্রকার গোপনতার ধার ধারিত না। অনেকেই সংসারে হয়তো এইরূপ করে কিন্তু এমন সংগোপনে এবং সতর্কতার সহিত করে যে সহজে তাহাদের ধরিবার ছুঁইবার উপায় থাকে না। ব্যতিক্রমও যে নাই এমন নহে কিন্তু ইহাই সাধারণ নিয়ম, যদিও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যতিক্রমের সংখ্যাটা যেন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন লোক হয়তো অনেকেই দেখিয়াছেন, যাহাকে বাহির হইতে দেখিলে নিতান্ত সাধু প্রকৃতির বলিয়াই মনে হয়, যেন মাছের কাঁটাটিও বাছিয়া খাইতে জানেন না, কিন্তু এমন দুষ্কার্য্য নাই যাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব। ইহারা না হয় রাঘব বোয়াল, কিন্তু ছোটখাট দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আমার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এক ভদ্রলোক প্রায় প্রত্যহই অত্যন্ত সংগোপনে মাফিক মত একটু মদ্যপান করিতেন এবং পরে খানিকক্ষণ পেয়ারা পাতা চিবাইতেন। পেয়ারা পাতা চিবাইলে নাকি মুখে মদের গন্ধ থাকে না, সত্যমিথ্যা জানিনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জগাই মাধাই'এর সহিত ইহাদের পার্থক্য হইল তাহাদের অকপটতা, আর ইহাদের কপটতা। এক কথায় বলিতে গেলে জগাই মাধাই'এর অথবা রত্নাকরের কোন প্যাটোয়ারী ছিল না।

যে ভদ্রলোকের সহিত আমার কথা হইতেছিল, তিনি এতক্ষণ নীরবেই ছিলেন কিন্তু এইবার অন্য একটা আপত্তি তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে সামাজিক শিষ্টাচার বলিয়াও একটা কথা আছে, হয়তো তাহার খাতিরেই আমার সেই পরিচিত

ব্যক্তিটি পেয়ারা পাতা চিবাইতেন, কিন্তু জগাই মাধাই'এর তো আর সে বালাই ছিল না, সুতরাং তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বেড়াইত। কিন্তু সামাজিক শিষ্টাচারের মধ্যে যে কতখানি মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে, অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি বলিয়া সেগুলি আমাদের নজরেই পড়ে না। কাহারও বাড়ীতে হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছি, আহার চলিতেছে, মাঝখানে গৃহকর্ত্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে রান্না কেমন হইয়াছে, অতি জঘন্য রান্না হইলেও বলিতে হইবে যে রান্না বেশ ভালই হইয়াছে। কোথাও হয়তো বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছি, বক্তার যেমন ভাব, তেমন ভাষা, তেমন বস্তু-সম্পদ, সকলেই ভাবিতেছি যে বক্তৃতাটি শেষ হইলেই রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু সভাপতি মহাশয়কে তাহার ভাষণে এই বক্তৃতারও কিছু না কিছু প্রশংসা করিতেই হইবে এবং যিনি ধন্যবাদ দিতে উঠিবেন তিনিও একবারে এড়াইয়া যাইতে পারিবেন না। বিষয়টাকে আরও বিস্তৃত করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। এই জাতীয় উদাহরণের অভাব নাই এবং অনেকেই হয়তো সামান্য একটু চিন্তা করিলেই এই বিষয়ে অনেক কিছুই বলিতে পারিবেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে তথাকথিত সামাজিক শিষ্টাচারের অনেকখানিই ভণ্ডামি এবং এই জন্যই অকপটতা যাহাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য তাহাদের কখন কখন সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় এবং তাহারা বড় একটা জনপ্রিয় হইতে পারে না।

কিন্তু মুশকিল হইল এই যে সকল সময় বাহিরের আচরণের

উপর নির্ভর করিয়া ভিতরের কথা ধরিতে পারা যায় না। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের স্বভাবে এই অকপটতা অত্যন্ত পরিস্ফুট ছিল। তিনি গোস্বামী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু পৈতা ছিড়িয়া ব্রাহ্ম হইলেন, অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত নির্ব্বিচারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। পরে আবার পৈতা ধারণ করিয়া ক্রমে তাঁহার বংশানুগত ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিলেন। যাহা করিলেন অকপটেই করিলেন, কোন সমালোচনাও গ্রাহ্য করিলেন না, কোন জববিদিহিও দিতে গেলেন না। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি ইংরেজ আমলে সরকারের আওতায় দাঁড়াইয়া নির্বিবচারে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করিলেন, পরে যখন কিছুটা ক্ষমতার হস্তান্তর হইল তখনও যাহাদের হাতে সেই হস্তান্তরিত ক্ষমতা আসিল তাহাদের কোল ঘেঁষিয়াই রহিলেন এবং সর্ব্বশেষে যখন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হইল তখন আবার সেই কংগ্রেসে ভিড়িয়া সেখানে স্থিতু হইয়া বসিলেন, এবং ইহার সম্বন্ধে যদি কেহ অভিমত প্রকাশ করে যে ইনিও যাহা করিয়াছেন অকপটভাবেই করিয়াছেন, কারণ যে যখন ক্ষমতাসীন থাকিবে তাহার আনুগত্য করাই ইহার স্বভাব, তাহা হইলে যাঁহারা এই ব্যক্তিকে বিশেষভাবে না জানেন, তাহাদের পক্ষে এই অভিমত গ্রহণ করা বা না করা, উভয়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই করিতে হইবে।

জীবনে কত লোকই দেখিলাম, কেহ বা ধীরে ধীরে দেশের দশের একজন হইয়া উঠিলেন, আবার কেহ বা জীবন-যুদ্ধে

বিপর্য্যস্ত হইয়া দুর্দ্দশার চরমে আসিয়া পৌঁছিলেন। কাহারো বা দারিদ্র্য কোন কালেই ঘুচিল না, কেহ বা আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সত্বার পরিবর্ত্তন কোন ক্ষেত্রেই দেখি নাই; ভিতরের মানুষটা ঠিক যেমন তেমনই রহিয়াছে। যিনি আশাবাদী (optimist) চতুর্দ্দিকে ঘোরালো বিপদ ও দুঃসহ লাঞ্ছনার মধ্যেও তাহার আশা তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই; আর যিনি নিরাশাবাদী (pessimist) নিতান্ত স্বচ্ছল ও সর্ব্বপ্রকারে সুষ্ঠু অবস্থার মধ্যেও তাহার প্যানপ্যানানি অব্যাহতই রহিয়াছে। সব কিছুতে নাক সিটকানো যাহাদের স্বভাব, এই প্রকৃতির কতিপয় ব্যক্তিকে তাহাদের ২০ বৎসর বয়সেও দেখিয়াছি, আবার ৭০ বৎসর বয়সেও দেখিয়াছি, কিন্তু নাক সিটকানো ঠিকই আছে, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিজেকে জাহির করাই যাহার স্বভাব, তিনি তাহাই করিয়া আসিয়াছেন; আবার যিনি স্বভাবতঃই একটু প্রচ্ছন্ন থাকিতে চাহেন, তিনি সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। ছল্লিবাজী যাহার স্বভাব তিনি ছল্লিবাজীই করিয়া আসিয়াছেন, পদমর্য্যাদা, সামাজিক প্রতিপত্তি ইত্যাদি কোন কিছুতেই তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই। এই প্রকারের অনেক কথাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার আর বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেকেই জীবনে বহু লোক দেখিয়াছেন এবং অনেকের সঙ্গে দীর্ঘকাল মেলামেশাও করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরা যদি একটু নিবিষ্ট মনে বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিদের সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য অসাধারণদের মত অত সুনির্দ্দিষ্ট নহে এবং অবান্তর অনেক কিছুর সঙ্গেই মিশিয়া থাকে। সুতরাং একটু সতর্ক মন লইয়া কথাটার বিচার করা প্রয়োজন। বিল্বমঙ্গলের বেশ্যাপ্রেম অথবা তুলসীদাসের পত্নীপ্রেমের ভগবৎপ্রেমে রূপান্তর সহজেই বুঝা যায়, কারণ তাঁহাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইহা হইল তাঁহাদের অনন্যতা, তাঁহারা যখনই যাহা কিছু করিয়াছেন অনন্যভাবেই করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের সম্বন্ধে এই প্রকারের নিশ্চিত নির্দ্দেশ সকল সময়ে মিলে না, সেই জন্যই একটু বিশেষ অভিনিবেশের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত প্রকৃতি কখন কখন বিকৃতিতে পড়িতে পারে কিন্তু বদলায় না।

যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ মানুষের নিজ নিজ স্বভাবের যদি কোন পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি যাহা কিছু সবই বাহিরের বস্তু, ভিতরের মানুষটাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কথাটা আমাদের প্রচলিত সংস্কারের এত বিরুদ্ধে যে সহজে ইহাকে মানিয়া লইতে অনেকেই হয়তো পারিবেন না। মনুষ্য সমাজে শিক্ষা চিরকালই একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। সমাজ-জীবনের সুব্যবস্থা যে এই শিক্ষার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে তাহাও বলিয়া বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না। বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বত্রই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া প্রগতিশীল মনুষ্য সমাজের অধিকতর উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য নানাভাবে গবেষণা চলিতেছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাও সুরু হইয়াছে। শিক্ষা যদি

প্রকৃত শিক্ষা হয়, তাহা হইলে মানুষকে অনেক কিছুই দিতে পারে, বুদ্ধিবৃত্তির সংযত অনুশীলনী শক্তি, চিন্তা-সংযম, ইত্যাদি গুণগুলি শিক্ষা হইতেই আসে। সমাজে খানিকটা মর্য্যাদাও শিক্ষা হইতে পাওয়া যাইতে পারে, যদিও এখনও ধনের মর্য্যাদাই বেশী। এ সবই সত্য, কিন্তু আমাদের কথা হইল এই যে শিক্ষার সহিত মানুষের স্বভাবের কোন সম্পর্ক নাই। জামা, কাপড় প্রভৃতি যেমন আমাদের দেহের উপর একটা আবরণ মাত্র, দেহের সহিত কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতিও ঐরূপই আর একটা আবরণ, স্বভাবের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। জামা, কাপড় স্থূল, সুতরাং চোখে দেখা যায় এবং ইচ্ছামত ছাড়িয়া ফেলিয়া বদলাইয়া লওয়া যায়। শিক্ষার ও সংস্কৃতির আবরণ সূক্ষ্ম, চোখে দেখা যায় না এবং সহজে ঝাড়িয়াও ফেলা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সত্ত্বায় একটা স্বাতন্ত্র্য আছে এবং নানাপ্রকার আবরণের মধ্যেও তাহা অবিকৃতই থাকে। স্বভাবতঃই যে কপট সে কখনও অকপট হইতে পারে না, তঞ্চকতা যাহার স্বভাব সে কোন কালেই সাধু হইবে না, যে আশাবাদী সে আশাবাদীই থাকিবে, কোন প্রকারের কোন বিপর্য্যয়েই তাহার আশাবাদ মলিন হইবে না। যাহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা যদি একটু যত্ন সহকারে তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সহিত আমার কথাগুলি মিলাইয়া দেখেন তাহা হইলে অল্পায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে আমি একটা নিতান্ত বাজে কথা বলিতে বসি নাই। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে এই বিষয়টা লইয়া

আলোচনা হইয়াছিল। আমরা দেখিতাম যে আমাদের সহকর্ম্মীরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, সকলেই শিক্ষাব্রতী এবং প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবার হইতেই আসিয়াছেন। কিন্তু এতটা মিল সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য আমরা খুঁজিয়া পাইতাম না। কিছুদিন পরে উভয়েই এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলাম যে "each one is a class by himself" অর্থাৎ প্রত্যেকেই যেন একটা স্বতন্ত্র জাতিবিশেষ। শিক্ষা ও বৃত্তিসমতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আনিতে পারে নাই।

শিক্ষা আর কিছুই করে না, শুধু সত্বার যে বৈশিষ্ট্য তাহার অভিব্যক্তির রূপান্তর ঘটাইতে পারে। তঞ্চকতাই যাহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, সে যদি অশিক্ষিত হয়, সামান্য একটু বাঙ্গলা-নবীশিই যদি হয় তাহার সম্বল এবং তু'একটি গ্রাম লইয়াই হয় তাহার কর্ম্মক্ষেত্র, তাহা হইলে সে হয়তো টন্নিগিরি করিবে, মামলা-মোকদ্দমার সম্ভাবনা দেখিলেই সেখানে যাইয়া ভিড়িবে এবং তলে তলে তুই পক্ষেই থাকিবে, মিথ্যা সাক্ষী দিবে এবং এই প্রকারের অন্যান্য উপায়ে তাহার অন্তর্নিহিত তঞ্চকতার পরিচয় দিবে। এই ব্যক্তিই যদি উচ্চশিক্ষা এবং কতকটা বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সুযোগ পায়, তাহা হইলে সে হয়তো লিমিটেড কোম্পানী খুলিয়া লোক ঠকাইবে, নানা ফন্দীতে চাঁদা তুলিয়া আত্মসাৎ করিবে, তঞ্চকতা সমান ভাবেই থাকিবে, কোন ইতর বিশেষ হইবে না।

তর্ক উঠিতে পারে যে সাধুসঙ্গের প্রশংসা তো অনেকেই করিয়া গিয়াছেন, তবে কি তাহার কোন মূল্যই নাই। কথাটা

গুরুতর এবং একটু যত্ন করিয়া বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। ঠাকুর বলিতেন যে শূন্যের সঙ্গ, বা প্রাণের সঙ্গ, বা নামের সঙ্গই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। একদিন আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্ম্মী ডক্টর ৺পঞ্চানন মিত্র মহাশয় রামময় রোডে পোষ্টমাষ্টার শ্রীমাধবচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসাতে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পঞ্চানন বাবু বলিলেন: "আমরা সংসারের জীব, নানাপ্রকার আবল্যের মধ্যে আছি; যতটুকু সময় আপনাদের মত মহাজনের সঙ্গ করিতে পারি, ততটুকুই লাভ।" এই কথার উপর ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "সঙ্গ করিতে নাই; এইজন্যই গীতাতে বলা হইয়াছে 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" গোড়াতে ঠাকুরের কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। গীতার এই শ্লোকে "সঙ্গ" শব্দটা ফলাকাঙ্খা অর্থেই বুঝিতে হইবে কিন্তু পঞ্চাননবাবু তো তাহা বলেন নাই। কিন্তু একটু পরেই বুঝিলাম যে তিনি "লাভ" শব্দটা ব্যবহার করাতেই ঠাকুর কথাটা এইভাবে তুলিয়াছেন। পরে বিশদভাবে "সাধুসঙ্গ" কথাটা বুঝাইয়া দিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহার অর্থ হইল এই যে সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ নিজে নিজেই করিতে হয়, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির স্থান ইহাতে নাই। কিন্তু ইহাতেও বিষয়টা পরিষ্কার হইল না। আমরা সচরাচর সাধুসঙ্গ বলিতে যাহা বুঝি আমি সেই কথাই তুলিয়াছিলাম। এই সাধুসঙ্গে কোন ফল হয় কিনা ইহাই হইল প্রশ্ন। আমি বলিব যাহার হইবার তাহার হয়, অপরের হয় না। এই সাধুসঙ্গের ফলাফলও প্রত্যেকের প্রকৃতি-

গত বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভর করে। কাহারও বা ইষ্টনিষ্ঠা দৃঢ়ীভূত হয় এবং কেহবা এই সাধুসঙ্গকেও অহংসেবায়ই নিয়োজিত করে।

আমি ইহাই বলিতে চাহিতেছি যে প্রত্যেক ...র সত্ত্বায়ই এমন একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, যাহা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না এবং যাহাকে বাহিরের কোন কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। একদিন ঠাকুরের সম্মুখে এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিবার পর আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম: "তাহা হইলে তো দেখিতেছি যে মানুষ অনেক কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না, 'তা'র নানা দিকেই গণ্ডী।" এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে ঠাকুর "মানুষ" বুঝাইতে সাধারণতঃ "জীব" শব্দটাই ব্যবহার করিতেন; অন্যান্য জীব হইতে মানুষকে বড় একটা পৃথক করিতেন না। আমার কথাটা শুনিয়া ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরবেই রহিলেন; পরে হঠাৎ বলিলেন: "এই গণ্ডি বা মানের যা'র হুঁস আছে সে-ই মানুষ।" ইষ্টপথে স্থির হইয়া থাকিলে ক্রমে এই গণ্ডি কাটাইয়া উঠা যায় এবং পরিণামে মানুষ তাহার স্বরূপোপলব্ধি করিতে পারে।

৩

এখন যাহা বলিতে যাইতেছি সেই আলোচনাটা হইয়াছিল মাত্র ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে, কিন্তু প্রসঙ্গ-সঙ্গতির খাতিরে সময়ক্রম পরিত্যাগ করিয়া কথাটা এইখানেই বিবৃত করিব। এই সময়ে এক ভদ্রলোক কিছুদিন আমার বাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

ইনি একজন সরকারী কর্ম্মচারী পেন্‌সন্ লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাহার নিকট শুনিলাম যে তিনি শুধু একবার ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছিলেন কিন্তু কথাবার্ত্তা বলার সু[illegible] পান নাই এবং উপস্থিত অপর ২।৩টি ভদ্রলোকের সহিত কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর যাহা বলিতেছিলেন তাহাও মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ হইতেই বুঝিলাম যে ইনি শুধু সরকারী ফাইল লইয়াই জীবন কাটাইয়া দেন নাই, নানা বিষয়ে চিন্তাও করিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জানাইলেন যে ভগবান, পরকাল প্রভৃতি অনেক কিছুই তিনি মানেন না, কারণ প্রত্যক্ষের বাহিরে কিছুই তিনি স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে যদি তাহাই হয়, তবে তাহার আমার নিকটে আসিবার উদ্দেশ্য কি? ঠাকুরের কথা লইয়াই আসিয়াছেন কিন্তু প্রকারান্তরে যখন তাঁহাকে মানেন না, তখন আমার সহিত আলোচনায় তাহার যে বিশেষ কোন লাভ হইবে না, একথা তাহাকে আমি স্পষ্টই জানাইয়া দিলাম। ঠাকুরের কথা না তুলিলে হয়তো কিছুই বলিতাম না। আমার এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহার কথাটা একটু বিশদ করিয়া বলিলেন। তাহার বক্তব্য হইল এই যে একদল লোক ধরিয়া লইয়াছে যে জীবনের গতিবেগ বাড়াইয়া দেওয়াই প্রগতির একটা প্রধান লক্ষণ, আর এই গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্টাচার, শালীনতা প্রভৃতি যে গুণগুলি সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থায় অপরিহার্য্য, সেগুলিও ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। এ যুগের

মানুষের মুখের দিকে একটু নিবিষ্টভাবে তাকাইলেই বুঝা যায় যে তাহার ভিতরে একটা অশান্তির অনল অহরহই জ্বলিতেছে। পরিস্থিতি এমন হইয়া দাঁড়াইতেছে যে কাহারো পক্ষেই আর একটা সুস্থ, সুষ্ঠু, শান্তিময় জীবন-যাপন সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। ভদ্রলোক বলিলেন যে এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি, ইহাই তাহার জিজ্ঞাস্য। ঠাকুরের উপদেশাদির মধ্যে হয়তো কিছু নির্দ্দেশ থাকিতেও পারে, এই ভরসায়ই তিনি আমার নিকট আসিয়াছেন। আমি তাহাকে বলিলাম যে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে এক শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধ আমাকে বুঝাইয়াছিলেন যে যখন প্রবল বন্যার প্লাবন আসে তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটা লাঠি লইয়া সেই প্লাবন ঠেকাইতে যায় না। সে গাছ, ছাদ বা ঐ জাতীয় কোন একটা নিরাপদ স্থান বাছিয়া লইয়া আত্মরক্ষা করে। আমি ভদ্রলোককে তাহাই করিতে বলিলাম ; এই যে প্লাবন আসিয়াছে, ইহা যুগধর্ম্ম, ইহাকে ঠেকান যাইবে না। তিনি চটিয়া গেলেন এবং আমি যাহা বলিলাম তাহা escapism (পলায়নী মনোবৃত্তি), cloistered virtue (সংসারের ঝঞ্ঝাটের বাহিরে মঠবাসীর সাধুতা), ইত্যাদি বলিয়া একটু রাগতভাবেই বাহির হইয়া গেলেন।

আমি ভাবিলাম যে বাঁচা গেল। ইদানিং আমার কোন বিতর্কের মধ্যে যাইতে প্রবৃত্তি হইত না, সুতরাং ভদ্রলোক এই ভাবে চলিয়া যাওয়ায় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না, ৪।৫ দিন পরেই ভদ্রলোক আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তিনি

গোড়াতেই বলিলেন যে তিনি আমাদের ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং সেইজন্যই আমার নিকট আসিয়াছেন। নিতান্ত বিনীতভাবে অনুরোধ করিলেন যে আমি যেন তাহাকে ভাঁড়াইবার চেষ্টা না করি। আমি ভদ্রলোককে বলিলাম যে বর্ত্তমানে যে যুগ-পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, তিনি সেদিন যে সমস্যাটা তুলিয়াছিলেন তাহা এই পরিবর্ত্তনেরই আনুষঙ্গিক, সুতরাং ইহাতে বিশেষ কোন চিন্তার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অগণিত লোকের মুখে অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই, রোগে চিকিৎসা ও শিক্ষা তো বহুদূরের কথা। আজিকার সমাজের সম্মুখে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ও সঙ্গিন সমস্যা এবং যত শীঘ্র সম্ভব ইহার অন্ততঃ আংশিক সমাধানের চেষ্টায় যদি কর্ম্মের গতিবেগ বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। একটা সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন যখন চলিতে থাকে, তখন অনেক কিছুই ধাক্কা খায় এবং কখন কখন ধ্বংসও হইয়া যায়, ইহাই স্বাভাবিক এবং এইজন্য আপসোস করা বৃথা। শিষ্টাচার, শালীনতা প্রভৃতির কোন একটা স্থায়ী সংজ্ঞা নাই, যুগে যুগে, দেশে দেশে, এগুলি অনেকাংশে বিভিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং একটা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য এই যে বিভিন্নমুখী চেষ্টা সুরু হইয়াছে, এই চেষ্টা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেই আবার নূতন রূপ লইয়া শিষ্টাচার, শালীনতা প্রভৃতিও আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিবে। শেষের কথা হইল এই যে সমাজতন্ত্রীদের, বিশেষতঃ সাম্যবাদীদিগের, মতে মানুষের

প্রতিবেশটাই মুখ্য, মানুষ নিজে গৌণ। তাহার সমাজ, তাহার রাষ্ট্র, এমন কি তাহার কলা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই নির্ভর করে তাহার প্রতিবেশের উপর। সুতরাং সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী প্রতিবেশটাকে ঢালিয়া সাজিতে পারিলেই এক সঙ্গে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। সংসার-সঙ্কট বলিয়া আর মানুষের কিছু থাকিবে না, সে পাইবে আশাতীত অবসর, নানা দিকে চিত্তবিনোদনের অপূর্ব্ব সম্ভার, বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের সর্ব্ববিধ সুযোগ। এক কথায় বলিতে গেলে, কল্পনাতীত প্রাচুর্য্যে তাহার জীবন ভরপূর হইয়া উঠিবে।

এ পর্য্যন্ত ঐ ভদ্রলোক আমার কথাগুলি নীরবেই শুনিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। হঠাৎ আমাকে বলিলেন: "আজও আপনি আমাকে ভাঁড়াইবার চেষ্টাই করিতেছেন। যাহা বলিতেছিলেন তাহার অন্ততঃ শেষের দিকটা যে আপনি বিশ্বাস করেন না তাহা আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি। সুতরাং যাহা বলিবার আছে একটু সহজভাবেই বলুন, ব্যাপারটাকে আর ঘোরালো করিয়া তুলিবেন না"। আমি হাসিয়া ফেলিলাম এবং সামান্য কিছুক্ষণ নীরবেই রহিলাম। পরে ভদ্রলোককে বলিলাম যে তিনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন, চারিদিক প্রাচুর্য্যে ভরিয়া দিলেই যে মানুষ সুখী হইয়া উঠিবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের অভিজ্ঞতা এ কথা বলে না। কোটিপতি ব্যক্তি, নানা দিকে সমৃদ্ধি, জীবন ভরা প্রাচুর্য্য, কিন্তু জেলের ঝক্কি মাথায় লইয়াও দশ বিশ লাখ মারিয়া দিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন না, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব

নাই। বিভিন্ন প্রকারের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমি ভদ্রলোককে মানুষের সেই দ্বন্দ্ববুদ্ধির কথায় লইয়া আসিলাম। কথাটা একটু বিশদ করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম: "চতুর্দ্দিকে এই যে উন্নয়নের প্রচেষ্টা দেখিতেছেন, ইহা একমুখী উন্নয়ন, মানুষের বাহিরের দিকটা লইয়াই ব্যস্ত, ভিতরের দিকে ইহার দৃষ্টি নাই। উন্নয়নের উদ্যোক্তারা হয়তো বলিবেন যে শিক্ষা ও কৃষ্টি বিস্তারের যে বিপুল আয়োজন সুরু হইয়াছে, ইহার সমস্তটাই তো মানুষের ভিতর লইয়া, সুতরাং সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, এমন কথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা ও কৃষ্টি বাহিরের ব্যাপার, মানুষের গভীরতম সত্ত্বায় পৌঁছাইতে পারে না। এই যে মানুষের দ্বন্দ্ববুদ্ধির কথা বলিতেছিলাম, শিক্ষা বা কৃষ্টি ইহার ধারেও ঘেঁষিতে পারে না, ইহা যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকে। অথচ এই দ্বন্দ্ববুদ্ধিকে অন্ততঃ কিছুটা সাম্যের দিকে না আনিতে পারিলে মানুষ ইতরই থাকিয়া যায়। কিন্তু এ দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই; 'দৃষ্টি নাই' বলা বোধ হয় ঠিক হইল না, এটাও যে একটা দিক, সেই বোধই কাহারো নাই। সুতরাং এই উন্নয়নের ফলে যে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহার ভার-সাম্য বজায় থাকিবে না, এবং সেই জন্যই তাহা কখন স্থিতিশীল হইতে পারে না।"

আমি থামিতেই ভদ্রলোক কি জানি কি একটা বলিতে গিয়াও বলিলেন না। একটু পরে আমিই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: "কেমন এবার তো আর নিশ্চয়ই বলিবেন না যে আমি আপনাকে ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছি।" তিনি বলিলেন যে না,

তাহা তিনি বলিবেন না, কিন্তু আমি যে আবার একটা নূতন সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি, তাহাই তাহাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। আমি যে মানুষের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ববুদ্ধির কথাটা বলিয়াছি, ইহাকে তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখন এতটা তলাইয়া দেখেন নাই কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে ইহাই বলিতে গেলে মনুষ্য জীবনের নিয়ামক। তিনি ইহাও বুঝিতেছেন যে তাহার যাহা সমস্যা, অর্থাৎ সুস্থভাবে এবং শান্তিতে জীবন যাপন করা, এই দ্বন্দ্ববুদ্ধি অন্ততঃ কিছুটা শিথিল না হইলে তাহাও হইবার উপায় নাই। সুতরাং এই দ্বন্দ্ববুদ্ধিকে কি করিয়া সংযত করা যায়, ইহাই দাঁড়াইতেছে সমস্যা এবং এই বিষয়ে আমি যদি ঠাকুরের নিকট কোন নির্দ্দেশ পাইয়া থাকি, তাহাকে কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিলে তিনি অনুগৃহীত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্ত্ত করিয়া লইলেন যে প্রত্যক্ষ ও যুক্তির বাহিরের কোন কথা তিনি মানিয়া লইবেন না।

আমি ভদ্রলোককে বলিলাম যে দ্বন্দ্ববুদ্ধির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার প্রকৃষ্ট উপায় দ্বন্দ্বাতীতের সঙ্গ। কিন্তু তিনি আমাকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না, সামান্য একটু উষ্মার সহিতই যেন বলিলেন: "এই তো আপনি আবার আপনাদের ভগবানকে টানিয়া আনিতেছেন, তাহা তো চলিবে না।" আমি একটু বিরক্ত না হইয়া পারিলাম না এবং ভদ্রলোককে আগে আমার কথাটা একটু ধৈর্য্যসহকারে শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি একটু লজ্জিত হইলেন, আর বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। আমি বলিলাম যে দ্বন্দ্বাতীতকে খুঁজিয়া লইতে

কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না, সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে, তাহাকে ছাড়িয়া থাকিবার কোন উপায়ই আমাদের নাই। এই যে আকাশ, মহাশূন্য, পঞ্চভূতের পঞ্চম ভূত এই ব্যোম, ইহা তো আমাদের চোখের উপরেই রহিয়াছে। ইহাকে তো কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদের এই পৃথিবীতে কত কিছু হইয়া যায়, ঝঞ্ঝায়, প্লাবনে, ঘূর্ণিবাত্যায়, ভূমিকম্পে কত দেশ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কিন্তু শূন্য এক অবস্থাতেই থাকে। নিতান্ত নগণ্য এই পৃথিবীর কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত কোন জ্যোতিষ্ক হয়তো আভ্যন্তরীণ একটা নিদারুণ বিক্ষোভে চৌচির হইয়া গেল, ছোট বড় কতকগুলি নূতন জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হইল, কি ভয়ঙ্কর একটা প্রলয় যে ঘটিয়া গেল মানুষের মন তাহা ধারণাও করিতে পারে না, কিন্তু এই যে ব্যোম বা শূন্য, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই প্রলয়ঙ্কর অঘটন ঘটিয়া গেল, তাহার কিন্তু বিন্দুমাত্র বিক্ষোভও আসিল না, যাহা ছিল অবিকল তাহাই রহিল, স্থির, নিশ্চল, নির্দ্বন্দ্ব। এই শূন্যকে ধরিয়া অনেক দুর্ব্বোধ্য ও আত্মবিরোধী বাক্যও অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। আত্মাকে বুঝাইতে যাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন: "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অর্থাৎ আত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হইতে বিশালতর। সাধারণ দৃষ্টিতে কথাটা যুক্তিসহ নহে কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে একটা বস্তু ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে হইতে শেষে শূন্যই হইয়া যায় এবং বিশাল হইতে বিশালতর যে বস্তু তাহাও এই শূন্যই। "অপানি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ", অর্থাৎ

"তাহার হস্তপদ না থাকিলেও তিনি দ্রুত গমন করেন এবং সর্ব্ববস্তু গ্রহণ করেন, চক্ষু না থাকিলেও দর্শন করেন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করেন", এই কথাগুলিও শূন্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে অনেকটা বোধগম্য হয়। গীতাতে আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥", (১-২৩,২৪)

অর্থাৎ "শস্ত্র সকল ইঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইঁহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য এবং ইনি অশোষ্য, ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিরস্বভাব এবং সদা একরূপ।" এই লক্ষণগুলি শূন্য সম্বন্ধেও সমানভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু কেহ যদি মনে করেন যে আমি এই শূন্যকেই চরম তত্ত্ব বলিয়া চালাইতে চাহিতেছি, তাহা হইলে অত্যন্ত ভুল বুঝা হইবে। গুরুপ্রণামে আছে "দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং", আমি এই সাদৃশ্যের কথাই বলিতেছি এবং আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে সর্ব্বাংশে দ্বন্দ্বাতীত একটা বস্তুর যে সন্ধান পাওয়া যায়, ইহাই আমার বক্তব্য।

ঐ ভদ্রলোক এতক্ষণ নীরবেই আমার কথা শুনিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু আবার একটা প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন : "আপনি যে শূন্যের কথা বলিতেছেন, বৌদ্ধদের

শূন্যবাদও কি ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত ?” আমি তাহাকে বলিলাম যে বৌদ্ধেরা শূন্য বলিতে কি বুঝিতেন, সেই তর্কজালের মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে আর সহজে বাহির হওয়া যাইবে না, সুতরাং সে দিকে না যাওয়াই ভাল। তিনি চাহিতেছিলেন প্রত্যক্ষ ও যুক্তির ভিত্তিতে তাহার সমস্যার একটা সমাধান, তাহা যদি তিনি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবান্তর তর্ক টানিয়া আনিয়া কথাটাকে আবার ঘোলাইয়া তোলার কোন অর্থ হয় না। আমি তাহাকে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রশ্নের এত সহজ ও সরল মীমাংসা আর কোথাও আছে বলিয়া আমি জানি না। দ্বন্দ্ব বুদ্ধিই অশান্তির কারণ এবং ইহার নিরাকরণের উপায় দ্বন্দ্বাতীতের সাহচর্য্য। ঠাকুর বলিতেন: “শূন্য ভাবিত ভাবাত্মা পুণ্য-পাপৈর্বিমুচ্যতে।” শূন্যকে অনন্যভাবে আশ্রয় করিতে পারিলে পাপপুণ্য থাকে না, অর্থাৎ দ্বন্দ্ববুদ্ধি নিঃশেষ হইয়া যায়। স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে শূন্যের সাহচর্য্য তো নিতান্তই একটা রসহীন ব্যাপার, না জ্ঞান, না ভক্তি; এমন একটা শুষ্ক সঙ্গ লইয়া মানুষ কতদিন থাকিতে পারে, শীঘ্রই সে হাঁপাইয়া উঠিতে বাধ্য। কিন্তু শূন্য যে আমাকে কত ভালোবাসে তাহা যে আমি দেখিয়াও দেখি না, সে তো কখনই আমাকে ছাড়ে না, সর্ব্বদাই জড়াইয়া ধরিয়া আছে। আমিও যদি তাহার দিকে একটু তাকাই এবং ধীরে ধীরে তাহার সাহচর্য্যে অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে তাহার সহিত একটা প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে। কথাটা নিজবোধগম্য, সুতরাং আর বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

ইহার পর ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "ইহাই কি আপনাদের ঠাকুরের মত ?" উত্তরে আমি তাহাকে বলিলাম যে আমাদের ঠাকুরের কোন মত নাই। কথাই আছে, "মতং যস্য ন বেদ সঃ।" তিনি নানাভাবে নানাকথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে এখানে সেখানে পরস্পর বিরুদ্ধ কথাও আছে, যাহার যেমন প্রয়োজন ও যাহার যেমন প্রকৃতি, একটু যত্নের সহিত চেষ্টা করিলেই তদুপযোগী একটা পন্থা সে বাছিয়া লইতে পারে। তিনি চাহিয়াছিলেন প্রত্যক্ষ ও যুক্তির ভিত্তিতে একটা মীমাংসা, ঠাকুরের কয়েকটি কথা অবলম্বন করিয়া তাহাই বুঝাইবার একটা চেষ্টা করা হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহাই ঠাকুরের মত, এরূপ মনে করিলে তাঁহাকে অত্যন্ত ভুল বুঝা হইবে। আমার এই কথার উপর তিনি বলিলেন : "আপনি তো বহুকাল ঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছেন এবং তাঁহার বহু চিঠিপত্র লইয়া আলোচনা করিবারও সুযোগ পাইয়াছেন, সুতরাং ইচ্ছা করিলেই ঠাকুরের কথাগুলি লইয়া মোটামুটি একটা অভিমত দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন এবং তাহা লোকের উপকারেও আসিতে পারে।" আমি তাহাকে বলিলাম যে ঠাকুরের অনেক কথাই আমি বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং তিনি যাহা বলিতেছেন সেই কার্য্যের জন্য আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, ঠাকুরকে কেন্দ্রবর্ত্তী করিয়া আবার একটা মতবাদ সৃষ্টি করিতে যাওয়ার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে "বাদ" মানেই বাদ, অর্থাৎ একটা "বাদ" দাঁড় করাইতে গেলে ছাঁটিয়া কাটিয়া

কিছু না কিছু বাদ দিতেই হয়। কোন "বাদে"র মধ্য দিয়া সত্যকে ধরিতে গেলে অখণ্ড যে সত্য, তাহা খণ্ডাকারে প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ তাহার কিছুটা বাদ পড়িয়া যায়। প্রধানতঃ শ্রুতির ভিত্তিতে যাঁহারা বিভিন্ন "বাদ" প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই কিছু না কিছু বাদ দিতেই হইয়াছে, সমগ্র শ্রুতি কেহই গ্রহণ করেন নাই। আমার মনে হয় যে পৃথিবীতে যত প্রকারের "বাদ" বা "ism" প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কোনটাই গোটা মানুষটাকে ধরিতে পারে নাই। ৩॥০ হাত লম্বা মানুষটার জন্য কেহ তৈয়ার করিয়াছেন ১॥০ হাত লম্বা একটা বাক্স, কেহ বা ২ হাত, কেহ বা বড় জোর ২॥০ হাত; আর যেখানেই জবরদস্তি করিয়া এই ক্ষুদ্রায়তন বাক্সগুলির মধ্যে ৩॥০ হাত লম্বা মানুষটাকে আঁটাইবার চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই আসিয়াছে দুঃসহ যন্ত্রণা এবং অমানুষিক অত্যাচার।

এই গ্রন্থে যে কয়টি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ স্বামী গম্ভীরানন্দ কৃত "উপনিষৎ গ্রন্থাবলী" হইতে লওয়া হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

১

ঠাকুর সে যাত্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার ৩।৪ দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে আবার আমার সেই বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় আসিলেন। আমার স্ত্রী তখন এখানেই ছিলেন সুতরাং এবার ঠাকুরের পরিচর্য্যার ব্যাপারে আমি নিরুদ্বেগেই রহিলাম। পূর্ব্বে একাধিক-বার বলিয়াছি যে ঠাকুরের বস্তুতঃ কোন দরকারই ছিল না এবং তাঁহার সেবা একজন বালকেও চালাইয়া দিতে পারিত কিন্তু এই সম্পর্কে আমি নিজে এত অপটু ছিলাম যে ঠাকুর আমার বাসায় আসিলেই তাঁহার সেবা সম্বন্ধে একটু দুশ্চিন্তা আমার লাগিয়াই থাকিত। সে যাহাই হউক, ঠাকুর আসিয়াছেন খবর পাইয়া আমার স্ত্রী রান্নাঘর হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে বসিলেন। দুই চারিটা কুশল প্রশ্নাদির পর ঠাকুর তাঁহার ঝোলা হইতে একটি আংটি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন: "মা, এই আংটিটি নেন, এটা আপনারই।" সেই আংটিটি এখনও আমার স্ত্রীর হাতে আছে। তিনটি পাথর লাগান ছিল, সেগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু পরিবর্ত্তে অন্য পাথর বসাইবার ইচ্ছা তাহার কখনও হয় নাই।

আমার মনে হয় যে এই আংটি দেওয়ার পিছনে একটু রহস্য আছে। এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকের মুখেই শুনিয়া-ছিলাম যে ঠাকুর নাকি বলিয়াছেন যে ৺লক্ষ্মীপূজার দিন একটু আপাং গাছের শিকড় সোনা কিংবা তামার তাবিজে ভরিয়া বাঁ

হাতের কনুই'এর ঠিক উপরে লাল সূতা দিয়া বাঁধিয়া ধারণ করিলে সংসারে নাকি আর অভাব অনটন থাকে না, বেশ সুখে সাচ্ছন্দ্যে দিন চলিয়া যায়। ঠাকুরের নিজের মুখে আমি কিছু শুনি নাই এবং কথাটা যে কিভাবে চাউর হইয়াছিল, তাহাও ঠিক জানি না। কিন্তু সেবার ৺লক্ষ্মীপূজার দিন নানাস্থানে এই তাবিজ ধারণ করিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। আমার যে এই ব্যাপারে বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল তাহা বলিতে পারি না কিন্তু যখন দেখিলাম যে আমার কয়েকজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু এই তাবিজ ধারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন আমিও দুইটি তাবিজের ব্যবস্থা করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে যথারীতি একটি নিজে ধারণ করিলাম এবং অন্যটি আমার স্ত্রীকে দিলাম। কিন্তু ৩।৪ দিন যাইতে না যাইতেই আমার মনে এক অসোয়াস্তি আরম্ভ হইল। তাবিজটার দিকে নজর পড়িলেই মনে হইত, এই আপদ আসিয়া জুটিল কেন? ঠাকুরকে লইয়া বেশ নিশ্চিন্তে ছিলাম, এই তাবিজটা যেন মাঝখানে দাঁড়াইয়াছে। অসোয়াস্তি বাড়িয়াই চলিল এবং নিশ্চিত বুঝিতে পারিলাম যে এই তাবিজটা আমাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছে। সুতরাং ৮।১০ দিনের মধ্যেই তাবিজটা খুলিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলাম। আমার স্ত্রীর তাবিজটি কিন্তু তাহার হাতেই ছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনিলাম যে সেটা হারাইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম যে আপদ গিয়াছে কিন্তু আমার স্ত্রী ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাবিজটার জন্য একটু ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তা তাহার মনে লাগিয়াই রহিল। ঠাকুরের

এবং সেই আপ্যায়িত ব্যক্তিকে একটু বিশেষ ভাবে নজর করিয়া দেখিতাম। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, ঐ সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়কে একটু নিবিষ্ট ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। আমার মনে হইল যে আত্মাভিমানের দুইটি পিপা যেন ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছেন। প্রথমে তাহারা দুইজনেই কথা বলিতে লাগিলেন। সভাপতি মহাশয় একটি শ্লোক আওড়াইলেন, সম্পাদক মহাশয় তাহার ব্যাখ্যা করিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে অপর একটি শ্লোক আওড়াইলেন। এবার সভাপতি মহাশয়ের ব্যাখ্যা সুরু হইল। এইভাবে প্রায় পনর মিনিট চলিয়া গেল। ঠাকুরও এমনভাব দেখাইলেন যে তাহাদের এই আলোচনা তিনি যেন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিতেছেন এবং তাহা যেন কতই না সারগর্ভ। যাহাই হউক, হঠাৎ বোধ হয় তাহাদের খেয়াল হইল যে তাঁহারা শুধু শুনাইতেই আসেন নাই, শুনিতেও আসিয়াছেন, এবং খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। কিন্তু ঠাকুর কিছুই বলিতেছেন না দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় প্রশ্ন করিলেন: "আচ্ছা, এই যে এত কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ক'রেছে, কৃষ্ণ বস্তুটা কি?" ঠাকুর বলিলেন: "একমাত্র সেইটিই বস্তু, আর সব অবস্তু।" এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের ঠিক এই জাতীয় আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। এক ভদ্রলোক ঠাকুরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: "ভগবান সাকার না নিরাকার?" উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "একমাত্র তিনিই সাকার, আর সব নিরাকার।" যাহাই হউক, সম্পাদক মহাশয়ের সহিত ঠাকুরের যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ মানে

কর্ষণ, আকর্ষণী শক্তি এক আনন্দেরই আছে, সুতরাং কৃষ্ণ আনন্দ, ইত্যাদি অনেক কথাই হইয়াছিল কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে কিছু মনে পড়িতেছে না। কিন্তু দুই একটি অবান্তর কথা বেশ স্পষ্টই মনে আছে। সভাপতি মহাশয় কেবলই ঠাকুরের কথার মধ্যে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি কয়েকবার এইরূপ আপত্তিও তুলিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর যখন অতি সহজেই তাহার সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিলেন তখন তিনি যেন একটু মনঃক্ষুন্নই হইলেন, মনে হইল। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলাম, মনে আছে। ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে ৩।৪ বার বলিয়াছিলেন যে সভা করিয়া কৃষ্ণভজন হয় না, কৃষ্ণভজন নিজে নিজেই করিতে হয়। ইহারা দুইজন যে একটা হরিসভার সহিত সংশ্লিষ্ট এ কথা ঠাকুরের জানা ছিল না, শুধু আমিই জানিতাম। বরদাবাবু জনান্তিকে আমাকে বলিলেন : "ইহারা নিশ্চয়ই কোন হরিসভা কিম্বা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট, নতুবা ঠাকুর বার বার সভার কথা বলিলেন কেন।" তাহার অনুমান যে যথার্থ আমার নিকট কথাটা জানিয়া তিনি যেন বেশ একটু খুসীই হইলেন মনে হইল।

কিন্তু আমি ভাবিতেছি আমার নিজের কথা। আমি কিছুই লিখিয়া রাখি নাই এবং অনেক চেষ্টা করিয়া আমাকে এই কথাগুলি স্মরণ করিতে হইতেছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অবান্তর এবং বাজে ব্যাপারগুলি যত সহজে মনে আসিতেছে, ঠাকুর সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনাগুলি তত সহজে স্মরণ করিতে পারিতেছি না। কে কবে, কিভাবে অপদস্থ

হইয়াছিল, কাহার সঙ্গে ঠাকুর কি ঠাট্টা করিয়াছিলেন, কবে কাহার উপর এক হাত লইতে পারিয়াছিলাম এবং মনে মনে আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম, ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সহজেই মনে পড়িয়া যাইতেছে কিন্তু ঠাকুরের অমূল্য কথাগুলি অনেক কষ্টে কিছু কিছু মাত্র স্মরণে আসিতেছে। তাই মনে হয় যে অনেক সময় ঠাকুরের কাছে বসিয়া থাকিয়াও ঠাকুর সঙ্গ করি নাই; চোরের মন যেমন বোচকার দিকে থাকে, আমার মনও তেমন অধিকাংশ সময়েই বাজে রঙ্গরসের দিকেই রহিয়াছে। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, আবারও বলি, ঠাকুর কাছে থাকিলেই ঠাকুরসঙ্গ হয়, দূরে থাকিলে হয় না, এরূপ ধারণার কোন যৌক্তিকতা নাই। বরং অনেক সময়েই অনুভব করিয়াছি যে দূরে থাকিয়াই যেন ঠাকুরের সঙ্গ অধিকতর সুষ্ঠুভাবে উপভোগ করা যায়।

সে যাহাই হউক, কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল এবং শেষের দিকে কি প্রসঙ্গে ঠিক স্মরণ নাই, "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন", বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত এই কথাটি আলোচনার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে সাধারণতঃ যে ভাবে এই কথা কয়টির ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহার বিশ্বাস যে কথা কয়টির গভীরতর কোন তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই আছে এবং ঠাকুরকে এই বিষয়টি লইয়া একটু আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরের মুখে এই আলোচনা আমি আরও কয়েকবার শুনিয়াছিলাম; সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যাটি মোটামুটি বুঝাইয়া বলিতে আমাকে

বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। ঠাকুর "নাম" বলিতে মুখ্যতঃ বুঝাইতেন অনন্যচিন্তা। চিন্তা যখন একখাতে বহিতে আরম্ভ করে, অন্য কিছুই আর ভাল লাগে না, তখনই নামে রুচির সূচনা হয় এবং ক্রমে যখন এই চিন্তা অনন্য হইয়া যায়, তখনই আসে যথার্থ নামে রুচি। একখানি পত্রে ঠাকুর লিখিয়াছিলেন: "অহৈতুকী প্রেম আচরণের দ্বারা পরদেহ ত্যাগ করিয়া স্বদেহ লাভ হইলে তখন ভগবানের নামে রুচি সংঘটন হইয়া থাকে।" (বেদবাণী, প্রথম খণ্ড, ২৫৭নং) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মুখ্যতঃ বলিতে গেলে "নামে রুচি" ও প্রাপ্তি একই কথা। "জীবে দয়া" কথাটির ঠাকুর অর্থ করিলেন নিজের প্রতি দয়া করা। তোমার ভিতরে যে জীব বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহার উদ্ধারের প্রচেষ্টার নামই "জীবে দয়া।" নিজের প্রতি যাহার দয়া নাই, অন্যের প্রতি দয়া তাহার পক্ষে শুধু কথার কথা মাত্র। কথাটা অত্যন্ত জটিল এবং একটু যত্ন করিয়া বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। এখানেও মুখ্য এবং গৌণ এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আপাতদৃষ্টিতে ঠাকুরের কথায় মনে হইতে পারে যে তিনি যেন আত্মপরতারই প্রশ্রয় দিতেছেন। নিজের প্রতি দয়া কর, অর্থাৎ নিজের হিতেরই চেষ্টা কর, পরের হিতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু মুখ্যতঃ কথাটা হইতেছে এই যে আত্মহিতই প্রকৃত হিত এবং পরহিতের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। যে প্রকৃত আত্মহিতে রত থাকে পরহিতের জন্য তাহার আর পৃথক চেষ্টা করিতে হয় না, আত্মহিতেই পরহিত যাহা হইবার আপনা আপনিই হইয়া

যায়, হিত করিবার জন্য হিত করিতেছি এই বুদ্ধি সেখানে থাকে না। আমার মনে হয় যে এই মুখ্য দৃষ্টি হইতেই ঠাকুর "জীবে দয়া" কথাটির অর্থ করিয়াছিলেন। মহাজনদের আচরণ একটু বিচার করিয়া দেখিলে কথাটা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি নাই, সুতরাং কর্ত্তব্য বুদ্ধিও নাই কিন্তু স্বভাবতঃই তাঁহারা যাহা করেন তাহাতেই জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে জীবে দয়া বা পরহিত বলিয়া বুঝি তাহারও ভিত্তি এই প্রকৃত আত্মহিতেই। শুনিয়াছি যে কলিকাতার তৎকালীন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন : "ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছু বুঝি না, তবে সাধ্যমত পরোপকার করি।" এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন : "নিজের উপকার ক'রতে পারেন না, উনি পরের উপকার করেন", অর্থাৎ আত্মহিত সম্বন্ধে যাহার চেতনা নাই, তাহার দ্বারা পরহিত সম্ভবপর নহে। খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দিয়া হাজার লোকের স্বাস্থ্যহানি ও কখন বা জীবনাশঙ্কা ঘটাইয়া অর্জ্জিত যে অর্থ, তাহার কিয়দংশ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত যে হাসপাতাল, তাহাতে পরের হিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরহিত নহে। তাহা না হইলে, নামযশাদির লোভে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে অর্থদান, ঘি'য়ে চর্ব্বি মেশানো অর্থে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, অথবা ইলেকসনের পূর্ব্বে এখানে সেখানে দুই চারিটি নলকূপ স্থাপন ইত্যাদি কার্য্যাবলীও "জীবে দয়া" সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত। যে কোন কার্য্য বা ব্যবস্থার ফলে

পরের হিত হয়, তাহাকেই "পরহিত" আখ্যা দেওয়া চলে না। স্থির চিত্তে একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সাধারণতঃ পরসেবা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার অধিকাংশই আত্মসেবারই নামান্তর মাত্র।

সভাপতি মহাশয় নীরবেই ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে মাথা নাড়িতেছিলেন কিন্তু আমি বুঝিতেছিলাম যে ভদ্রলোকের আজন্ম বর্দ্ধিত সংস্কারে দারুণ আঘাত লাগিতেছে ; তিনি ঠাকুরের কথাগুলি নির্ব্বিচারে গ্রহণও করিতে পারিতেছেন না, একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও সাহসে কুলাইতেছে না। তৃতীয় কথাটির অর্থও ঠাকুর যখন ঠিক একভাবেই নিষ্পন্ন করিলেন তখন মনে হইল যে ভদ্রলোক প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন যে বিষ্ণু অর্থ ব্যাপ্ত, অর্থাৎ যিনি এই ত্রিজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এই ব্যাপ্ত বুদ্ধির আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার সেবা পরিচর্য্যার নামই "বৈষ্ণব সেবন।" ঠাকুর বলিতেন : "ভগবান সর্ব্বত্র সমভাব নিরপেক্ষ শক্তি।" এই সমভাব বা নিরপেক্ষ শক্তির সেবাই 'বৈষ্ণব সেবন।' এইভাবে ঠাকুর তিনটি কথাকেই এক সূত্রে গাঁথিয়া দিলেন, প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে দেখিবার আর কোন প্রয়োজন রহিল না। ঠাকুর সাধারণতঃ মুখ্যার্থ ধরিয়াই কথাবার্ত্তা বলিতেন এবং এই জন্য প্রথম দিকে অনেকেই তাঁহার কথা ধরিতে পারিতেন না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল, ঠাকুরের ব্যাখ্যা সভাপতি মহাশয়ের ঠিক মনঃপূত হইল না। একটু পরেই তিনি ও সম্পাদক মহাশয় ঠাকুরকে একটা শুষ্ক নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন,

আমিও সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। সিঁড়ি দিয়া নামিবার পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয় আমাকে বলিলেন : "আপনাদের ঠাকুর অযথা সহজ কথাকে কঠিন করিয়া তোলেন। 'নামে রুচি. জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন' অতি সহজ কথা, তাৎপর্য্য বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না, অথচ ঠাকুর এই কথা কয়টি লইয়া একটা কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন।" উত্তরে আমি কি বলিয়াছিলাম ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

সভাপতি মহাশয়কে আর কখনও ঠাকুরের নিকট আসিতে দেখি নাই, কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম যে ঠাকুরের মুখে সে দিন যাহা শুনিয়াছিলেন, সেই সকল কথা আওড়াইয়া তিনি এখানে সেখানে কিস্তিমাতের চেষ্টা করিতেন। ইহার ৪।৫ দিন পরে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে সভাপতি মহাশয় বসিয়া রহিয়াছেন এবং শুনিলাম যে তিনি আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাকে উপরে আমার বসিবার ঘরে লইয়া গেলাম। এ কথা সে কথার পর তিনি বলিলেন যে ঠাকুর সেদিন সুখ আর আনন্দের মধ্যে যেন একটা পার্থক্য করিতেছিলেন। কথাটা তিনি ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছেন না, আমার মনে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরের মুখে এই আলোচনা আমি একাধিকবার শুনিয়াছিলাম, সুতরাং ছোট একটি বক্তৃতা ঝাড়িয়া দিতে আমার কোনই অসুবিধা হইল না। সুখ আসে একটা কারণ অবলম্বন করিয়া ; আনন্দ নিরাবলম্ব, স্বপ্রতিষ্ঠ, কোন কিছুরই অপেক্ষা করে না। কারণের অপেক্ষা করে বলিয়াই সুখ ক্ষণস্থায়ী ও খণ্ড এবং নিরপেক্ষ বলিয়াই আনন্দ অখণ্ড ও

অনন্ত। মানুষ আনন্দই চায় কিন্তু বিষয়ের মধ্য দিয়া তাহার অনুসন্ধান করে বলিয়া সুখই কখন কখন পায়, আনন্দ পায় না। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন : "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" চাই আনন্দ কিন্তু ভাবি যে ধনজন, বিষয়বৈভবাদি পাইলেই বুঝি আনন্দ পাইব। যখন ধনজনাদি আয়ত্তের মধ্যে আসে তখন মনে হয় যে ঠিক এইগুলি আমি চাই নাই, যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা যেন পাই নাই। "মানুষ চায় সুখ, পায় সামগ্রী।" আনন্দ তো দূরের কথা, বাস্তবিক পক্ষে সুখও নিতান্ত সহজলভ্য নহে। ভাবিলাম যে একখানা নিজস্ব বাড়ী পাইলেই বুঝি সুখী হইব কিন্তু বাড়ীখানা পাইয়া দেখি যে বাড়ীখানাই পাইয়াছি, সুখ সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও বিপদ হইল এই যে সুখের সঙ্গে দুঃখ অঙ্গাঙ্গীভাবেই রহিয়াছে। একখানা মোটর গাড়ী পাইলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসিল পাঁচ রকমের ঝঞ্ঝাট। এই বুঝি ড্রাইভার তেল চুরি করিল, হয়তো বা একটা দুর্ঘটনা ঘটাইয়া বসিল, আজ এটা ভাঙ্গিল, কাল ওটা হারাইল, মেরামতির খরচ বাড়িতে বাড়িতে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিল, সুখের আশা উধাও হইয়া গেল, বিচার করিয়া দেখিলাম যে সুখ যাহা পাইয়াছি তাহা নগণ্য, প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু গাড়ীটাই পাইয়াছি। আরও অনেক কিছু বলিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। সভাপতি মহাশয় খুসী হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে শনিবারের হরিসভায় এই প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি সেদিনকার আসর একেবারে মাত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সম্পাদক মহাশয় কিন্তু ইহার পরেও কিছুকাল ঠাকুরের পিছনে ঘোরাফেরা করিয়াছিলেন এবং তাহার কতকটা ভাবান্তরও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। শেষের দিকে তিনি ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়াই প্রণাম করিতেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার উপদেশাদি শ্রবণ করিতেন। কিন্তু ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠাকুর নাকি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে তিনি একজন শাস্ত্ররসজ্ঞ। এই সার্টিফিকেট পাইবার পর তিনি আর ঠাকুরের নিকট আসিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাহার এই সার্টি-ফিকেটের কথা আমি সভাপতি মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। ইহাদের কেহই আর ইহজগতে নাই, কিন্তু সামান্য কিছুদিনের পরিচয় হইলেও সেই সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়কে ভুলিতে পারি নাই। ইঁহারা দুই জনেই ধর্ম্মের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব শাস্ত্রের অত্যন্ত দুরূহ গ্রন্থগুলির সঙ্গেও ইহাদের পরিচয় ছিল, কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইহাদের অনুরাগ ছিল, কিন্তু এ সকলের কিছুই তাহাদের নিজেদের কোন কাজে আসিল না, আত্মাভিমানের ইন্ধন যোগাইতেই নিঃশেষ হইয়া গেল। ইহাদের শেষ জীবনেও ইহাদের সহিত কয়েকবার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি নাই। ইঁহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই জীবন কাটাইয়া গেলেন কিন্তু করিয়া গেলেন অহংসেবা, ধর্ম্মের ধারেও ঘেঁষিতে পারিলেন না। পদে পদেই মোহগর্ত্ত, অত্যন্ত হুঁসিয়ার না হইলে এই রাস্তায় অগ্রসর হওয়া যায় না।

ভদ্রলোকেরা চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে বরদাবাবুও

চলিয়া গেলেন, সুতরাং ঠাকুরের নিকটে আর কেহই রহিল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল, হঠাৎ ঠাকুর আমাকে বলিলেন যে আগামী কাল প্রাতঃকালে তিনি চাঁটগা মেল ধরিয়া চাঁদপুরের দিকে রওয়ানা হইয়া যাইবেন। ঠাকুর যে মাত্র একদিনের জন্য আমার বাসায় আসিয়াছেন, একথা আমি জানিতাম না, সুতরাং ঠাকুরের কথা শুনিয়া মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে আমার বলিবার কিছুই ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি একাকীই যাইবেন, না সঙ্গে আর কেহ যাইবে। ঠাকুর বলিলেন যে তিনি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যাইতেছেন, কাল ভোরে আসিয়া তিনি তাঁহাকে এখান হইতে ষ্টেশনে লইয়া যাইবেন। ঠিক এই সময় প্রভাতবাবু একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর দর্শনে আসিলেন। এই ভদ্রলোককে আমি চিনিতাম। ইনি এক সমস্যায় পড়িয়াছিলেন এবং তাহার সমাধানের জন্য কিছুদিন যাবৎ ঠাকুরের খোঁজ করিতেছিলেন। ইনি পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন সেই সময়েই তাহার বিবাহ হয় এবং কিছুদিন পরে সস্ত্রীক যথারীতি তাহাদের কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতাতে আসিয়া স্থায়ী হইয়া বসিলেন এবং কয়েকজন সহকর্ম্মীর প্ররোচনায় একজন খ্যাতনামা সাধুর নিকট পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও নিবৃত্তি হইল না। কি একটা ছুটি উপলক্ষে তিনি ৩।৪ জন সহকর্ম্মী বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেখানে অন্য একজন সাধুকে দেখিয়া তাহার প্রাণ

ভক্তি ও শ্রদ্ধায় একেবারে বিগলিত হইয়া গেল, ইহাকেও গুরুত্বে বরণ না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। হইল তিন, কিন্তু ইহার পরের ঘটনাটি আরও মজাদার। এই ভদ্রলোকের একজন বিশিষ্ট বন্ধুর কাকীমা কাশীতে এক সাধুর নিকট কয়েক দিন ঘোরাফেরা করিয়া স্থির করিলেন যে ইঁহার নিকটেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। সাধুর নিকট তাহার সঙ্কল্পের কথা নিবেদন করিতেই তিনি বলিলেন যে সে সময়টা দীক্ষার পক্ষে প্রশস্ত নহে এবং প্রায় ছয়মাস পরের একটা দিন ধার্য্য করিয়া দিলেন। ভদ্রমহিলাও কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সেই শুভ দিনটি নিকটবর্ত্তী হইতেই সেই কাকীমা কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু বিপদ হইল এই যে তাহার ভাশুরপুত্র তখন কয়েকটা বৈষয়িক ব্যাপারে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে এক দিনের জন্যও তাহার কলিকাতা ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার উপায় ছিল না। তিনি আসিয়া তাহার বন্ধুকে, অর্থাৎ আমাদের এই ভদ্রলোককে, ধরিয়া বসিলেন যে তিন দিনের ছুটি লইয়া কাশী যাইয়া কাকীমার এই কাজটা তাহাকে করাইয়া দিতেই হইবে। পাঠক-পাঠিকারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে স্বভাবতঃই এই ভদ্রলোক সহজে কাহারও অনুরোধ এড়াইতে পারিতেন না, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বের দিন তিনিই ঐ ভদ্রমহিলাকে লইয়া কাশী গিয়া পৌঁছিলেন। ঐ সাধুজী কাশীর বাহিরে বরুণার ওপারে ক্ষুদ্র একখানা কুটিরে থাকিতেন, দীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিন প্রাতঃকালে ইহারা যাইয়া দেখিলেন যে কুটিরের সম্মুখে একটা গাছে দোলনা খাটান রহিয়াছে এবং সাধুজী ঐ দোলনায় বসিয়া

ধীরে ধীরে দোল খাইতেছেন। ইহাদের দেখিয়া সাধুজী তাঁহার দোল থামাইলেন এবং ভদ্রমহিলাকে তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলেন। ভদ্রমহিলা কাছে আসিতেই সাধুজী তাহার দক্ষিণ কানের উপর নিজের মুখ স্থাপন করিয়া তাহাকে তাহার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিলেন। তিনিও সাধুজীকে প্রণাম করিয়া একটু দূরে সরিয়া আসিলেন। আমাদের ঐ ভদ্রলোক নিকটেই ছিলেন, হঠাৎ সাধুজী বলিয়া বসিলেন: "তু-ভি আ যাও।" তিনি আর কি করেন, আগাইয়া আসিতেই হইল এবং সাধুজীও তাহার কানে আর এক নম্বর মন্ত্র ফুঁকিয়া দিলেন। এই চারিটি "নাম" ও চারিটি গুরু লইয়া ভদ্রলোক ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। আরও বিপদ হইয়াছিল এই যে তিনি যে তলে তলে এতখানি বাধাইয়াছেন তাহা তাহার স্ত্রী কিম্বা বাড়ীর অপর কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না। কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িলে বাড়ীতেও যে একটা অনর্থ বাধিয়া উঠিবে, এই ভয়ে ভদ্রলোক সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন। ঠাকুরের সংবাদ তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন ঠিক মনে নাই কিন্তু তাহার, কেন জানি না, একটা স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ঠাকুরই তাহার এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই জন্যই মাঝে মাঝে ঠাকুরের খোঁজে তিনি আমার নিকট আসিতেন। আমি তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতাম যে তিনি দ্রৌপদী হইতে চাহিতেছেন, চারিজন তো আছেই, ঠাকুরকে পাইলেই সংখ্যা পূর্ণ হয়।

যাহাই হউক, ভদ্রলোক অকপটে তাহার সকল কথাই ঠাকুরের নিকট খুলিয়া বলিলেন, কোন কিছুই গোপন করিলেন

না। তাহার কথা শেষ হইতেই ঠাকুরের পা দুখানি তাহার বুকের উপর আকড়াইয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর কিছুই বলিলেন না, আমরাও কিছু বলিলাম না, প্রায় ১০ মিনিট এই ভাবেই কাটিয়া গেল। শেষে ভদ্রলোক অত্যন্ত কাতরস্বরে ঠাকুরকে বলিলেন যে তাহার একটা গতি করিয়া দিতেই হইবে। ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে ভদ্রলোককে বলিলেন : "আমি কি করব, আপনার 'নাম' তো আমার কাছে নাই।" কিন্তু তিনিও নাছোড়বান্দা, ঠাকুরের পা দুখানি আঁকড়াইয়া রহিলেন, কিছুতেই ছাড়িলেন না। আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। হঠাৎ ঠাকুর একটি "নাম" উচ্চারণ করিলেন। ভদ্রলোক চমকিয়া উঠিলেন এবং ঠাকুরকে বলিলেন : "এই 'নাম'ই তো আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের কুলগুরুর নিকট পাইয়াছিলাম।" তখন ঠাকুর তাহাকে বলিলেন : "এইটিই আপনার 'নাম', পরে যাহা কিছু পাইয়াছেন, সবই ভূতের মন্ত্রণা। এই 'নাম' লইয়াই পড়িয়া থাকেন, ইহারই সেবা পরিচর্য্যা করেন, ক্রমে সবই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।" ঠাকুরের এই কথার উপর ঐ ভদ্রলোক সরলভাবেই বলিলেন যে যে-কুলগুরুর নিকট হইতে তিনি এই "মন্ত্র" পাইয়াছেন তিনি একজন ঘোর সংসারী, সাধুচিত কিছুই তাহার মধ্যে নাই। মামলা মোকদ্দমায় তাহার অদম্য উৎসাহ এবং আরও অনেক প্রকার অপকর্ম্মে তিনি সিদ্ধহস্ত, এই জন্যই তাহার প্রদত্ত 'নামে' শ্রদ্ধা রাখিতে পারেন নাই। ঠাকুর বলিলেন : "তিনি কি করেন না করেন, তাহাতে তো আপনার কোন প্রয়োজন নাই,

আপনার প্রয়োজন 'নাম'। সেই নাম তো আপনি পাইয়াছেন, তাহা লইয়াই থাকেন। নামের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার সেবা করিয়া গেলে ঘরে বসিয়াই সমস্ত পাওয়া যায়, আর কোন কুহক প্রলোভনে পড়িতে হয় না। একটু সবল হইয়া থাকিতে হয়, সবলতাই পরম পবিত্র ধর্ম্ম।" ভদ্রলোক ঠাকুরের কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, মনে হইল যে তিনি একটা পথ পাইয়াছেন। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন, প্রভাতবাবুও তাহার সঙ্গেই বিদায় লইলেন।

কিন্তু এখানে একটা গুরুতর প্রশ্নের উদ্ভব হইতেছে এবং যদিও পরে স্থানে স্থানে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথাই বলিতে হইবে, তথাপি প্রশ্নটাকে একেবারে এড়াইয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহাতে ইহাই মনে হয় যে গুরুর বাক্যই মুখ্য এবং তাহার ব্যক্তিত্বটা গৌণ। নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তিনি অনেক সময়ে বলিতেন: "এই ভূতটার পিছনে ঘুরিয়া লাভ কি? যাহা পাইয়াছেন তাহা লইয়াই থাকেন।" যাহা ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর, আজ আছে কাল নাই, এই অর্থেই "ভূত" শব্দটি ব্যবহার করিতেন। সুতরাং "গুরুর বাক্যই গুরু" এই কথাটাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন। "গুরুদেব" কথাটা কখনও তাঁহার মুখে কেহ শোনে নাই, তিনি শুধু "গুরু" শব্দটাই ব্যবহার করিতেন, এবং অনেক সময়েই মনে হইত যে "গুরু" বলিতে তিনি কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিতেন না, একটা তত্ত্বকেই বুঝাইতেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নাই, আমি

শুধু "গুরুর বাক্যই গুরু" এ সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াই আপাতত ক্ষান্ত হইব। দৃষ্টান্তটি আছে গিরিশচন্দ্রের "পাণ্ডব-গৌরব" নাটকে। অবন্তীরাজ দণ্ডী কৃষ্ণভয়ে ব্যাকুল হইয়া ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইলেন কিন্তু কৃষ্ণের শত্রুকে কেহই আশ্রয় দিতে সম্মত হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া দণ্ডী আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নদীতে ঝাঁপাইতে যাইতেছেন এমন সময় সুভদ্রা তাহাকে বাধা দিলেন, তিনি ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। দণ্ডীর মুখে সকল কথা শুনিয়া যদিও তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন যে তাহাকে আশ্রয় দিলে কৃষ্ণের বিরাগভাজন হইতে হইবে, তথাপি সুভদ্রা বিন্দুমাত্র দ্বিধাও করিলেন না. কারণ কৃষ্ণই তাহাকে শিখাইয়াছেন যে "সার ধর্ম্ম আশ্রিত রক্ষণ।" পাণ্ডবেরাও সুভদ্রার কার্য্যের অনুমোদন না করিয়া পারিলেন না, কারণ তাঁহারাও কৃষ্ণের মুখেই শুনিয়াছেন যে আশ্রিত রক্ষণই ধর্ম্ম। কৃষ্ণ কিন্তু বাহ্যতঃ কিছুই বুঝিতে চাহিলেন না। দণ্ডীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য জরুরী নির্দ্দেশ জানাইলেন। কৃষ্ণের বাক্যে ও কৃষ্ণে বিরোধ বাঁধিয়া গেল, পাণ্ডবেরা এখন করেন কি? "গুরুর বাক্যই গুরু," সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণবাক্যকেই আঁকড়াইয়া রহিলেন, কৃষ্ণের বহিরাস্ফালনকে গ্রাহ্য করিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা যাইয়া যুদ্ধে পর্য্যবসিত হইল কিন্তু পাণ্ডবেরা অটলই রহিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে কৃষ্ণের বাক্য নির্ব্বিচারে পালন করিয়া তাঁহারা কৃষ্ণসেবাই করিতেছেন, সুতরাং বাহ্যতঃ কৃষ্ণের শত্রুতা করিতেও

বিধা করিলেন না। এই কথাটাই নাট্যকার কুন্তীর অভিযোগের উত্তরে ভীমের উক্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ভীম বলিতেছেন :

"মাতা, ভেবো না বিষাদ, কেবা ক'রে বাদ,
কে দেছে আশ্রয় বল অনাথা দণ্ডীরে,
বিহনে অনাথনাথ কে আশ্রয় দাতা।
কা'র দয়ার প্রবাহ বহিতেছে হৃদয়ে আমার,
ত্রিভুবন অরি, তবু মোর অটল হৃদয়।
কৃষ্ণভক্ত আমি, নাহি কৃষ্ণ সনে বাদ,
কার্য্য তাঁ'র আশ্রিত রক্ষণ,
সে কার্য্যে নিযুক্ত আমি, কিঙ্কর তাঁহার।"

৩

ঠাকুর ভোর হইলেই চলিয়া যাইবেন, সুতরাং আমার স্ত্রী তাঁহার ভোগের ব্যবস্থা করিয়া কিছুক্ষণের জন্য ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলেন, আমিও ইত্যবসরে রাত্রির আহার সমাধা করিয়া আসিলাম। আমার স্ত্রী বেশীক্ষণ বসিতে পারিলেন না, ছেলেমেয়ের তাগিদে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল। আমি কিন্তু সে রাত্রে সহজে ঠাকুরের সান্নিধ্য ছাড়িতে চাহিলাম না। রাত্রি একটার পর তিনি একরকম জোর করিয়াই আমাকে শুইতে পাঠাইয়া দিলেন। সে রাত্রে ঠাকুরের মুখে অনেক কিছুই শুনিয়াছিলাম, দুইটি কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে গাজীয়াবাদ অঞ্চলে কোনও এক বনে

তিনি দীর্ঘকাল তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। একটি গাছের তলায় তিনি আসন করিয়া মৌনী হইয়া বসিয়া থাকিতেন, সম্মুখে ধূনী জ্বলিত এবং কাঠুরিয়ারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ফলমূল আনিয়া দিত তাহাতেই তাঁহার আহার নিষ্পন্ন হইত। কয়েক বৎসর এইভাবেই চলিয়া গেল। কাঠুরীয়ারা ক্রমে ঠাকুরের অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস এমন দৃঢ় হইয়া উঠিল যে কাহারও কোন অসুখ বিসুখ হইলে তাহারা ঠাকুরের ধুনী হইতে কিছু ছাই লইয়া গিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিত, অথবা তাহার গায়ে মাখাইয়া দিত। ইহাতে তাহারা এমন আশ্চর্য্য ফল পাইতে লাগিল যে কথাটা জানাজানি হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। ঠাকুরের নিকট নানা প্রকারের রোগী আসিয়া জুটিতে লাগিল এবং সেই বনে জনসমাগম অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ঠাকুরের আর সেখানে থাকা সম্ভব হইল না, এক রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি সরিয়া পড়িলেন।

সেই রাত্রিতে ঠাকুর আমার নিকট এক রাজপুত দম্পতির কথাও সবিস্তারে বলিয়াছিলেন। ইহাদের গৃহে ঠাকুর বৎসরাধিক কাল কাটাইয়াছিলেন। রাজপুতানার কোনও এক গ্রামে এক নিঃসন্তান দম্পতি বাস করিত। গ্রামটির নাম এবং অবস্থিতি সম্বন্ধে ঠাকুর কিছু বলিয়াছিলেন কিনা স্মরণ নাই। ইঁহারা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন এবং ইহাদের গোশালায় অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। কোথায়, কিভাবে ইঁহারা প্রথম ঠাকুরের সহিত পরিচিত হ'ন, আমি জানি না। ঠাকুর বলিয়াছিলেন

স্বামী স্ত্রী উভয়েই তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং বাৎসল্যভাবেই তাঁহার সেবা করিতেন। বাড়ীতে প্রচুর দুগ্ধ ছিল, সেই দুগ্ধে দধি, ক্ষীর, মাখন, ছানা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত করিয়া স্বামী স্ত্রী মিলিয়া গোপাল সেবার আয়োজন করিতেন। ঠাকুরকে তাহারা গোপাল জ্ঞানেই সেবা করিতেন। কিন্তু একটি বিষয়ে ঠাকুর ইহাদের অনুবোধ সযত্নে এড়াইয়া চলিতেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই ইচ্ছা যে ঠাকুর তাহাদের সম্মুখে বসিয়া ক্ষীর, সর, মিষ্টান্নাদি আহার করেন এবং তাহা দেখিয়া তাঁহারা নয়ন সার্থক করেন কিন্তু ঠাকুর কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইতেন না। তিনি ক্ষীর, সরাদির পাত্রগুলি একটি ঘরে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন এবং আনুমানিক ২০ মিনিট পরে দরজা খুলিয়া দিলে দেখা যাইত যে খাদ্যগুলি সবই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, শুধু একটি ছোট বাটিতে কিছু মিষ্টান্ন স্বামী স্ত্রীর জন্য উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল এবং ক্রমে সেই দম্পতির মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। ঠাকুর নিজেই এই ক্ষীর সরাদি খাইয়া ফেলেন, না ইহার ভিতর অন্য কোনও রহস্য আছে, এইরূপ একটা প্রশ্ন তাহাদের মনে দানা বাঁধিয়া উঠিল। ঠাকুর যখন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিতেন, তিনি যে এইমাত্র এতগুলি খাদ্যদ্রব্য উদরসাৎ করিয়া আসিয়াছেন তাহার কোন লক্ষণই তাঁহারা দেখিতে পাইতেন না। সুতরাং স্বামী স্ত্রী মিলিয়া স্থির করিলেন যে ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বাস্তবিক কি করেন লুকাইয়া তাহা দেখিতে হইবে।

একদিন ঠাকুর দরজা বন্ধ করিতেই তাহারা দুইজনে যাইয়া গবাক্ষের দুইটি ছিদ্রপথে উঁকি মারিয়া রহিলেন। একটু পরেই দেখিলেন যে এক বিরাটকায় পুরুষ ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং দু'চার মিনিটের মধ্যেই খাদ্যগুলি নিঃশেষ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। স্বামী স্ত্রী অবাক হইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন। যথা সময়ে ঠাকুর বাহির হইয়া আসিলে তাঁহারা আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না, ঠাকুরের নিকট সেই বিরাটকায় পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর সঠিক কিছুই বলিলেন না এবং রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনাটির মধ্যে একটু আলৌকিকত্ব থাকায় ইহা প্রকাশ করিব না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু এই ঘটনা উপলক্ষ্যে ঠাকুর যে দু'একটা কথা বলিয়াছিলেন তাহার খাতিরেই ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত খুলিয়া বলিতে হইল। আমার এই কথা হইতে কেহ যদি মনে করেন যে অলৌকিক ব্যাপারের প্রতি আমার একটা বিরাগ আছে, অথবা আমি ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তাহা হইলে আমাকে অত্যন্ত ভুল বুঝা হইবে। মহাজনদের যে নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি থাকে তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, নিজেও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন যে যাঁহারা মহাজন, যোগৈশ্বর্য্যগুলি তাঁহাদের পরিচর্য্যার প্রতীক্ষায় সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মহাজনেরা সে দিকে দৃকপাত করেন না সত্য, কিন্তু কখন কখন কোনও

বিশেষ কারণে ঐ সকল যোগ-বিভূতি প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। কিন্তু ঠাকুর আমাকে অনেক বার সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে এইগুলির দিকে মনোযোগ দিতে নাই। অতিরিক্ত মাত্রায় এই সকল কাহিনীর অনুসরণ করিলে আবরণের সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত পন্থা ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। আবার ইহাদের আসল নকলও আছে, সকল সময়ে সঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না। একটা গল্প মনে পড়িতেছে, গল্পটি শুনিয়াছিলাম কাশীতে একজন কবীরপন্থী সাধুর মুখে। ভক্তপ্রবর কবীরের চন্দন নামে এক বাল্যবন্ধু ছিল। দুই বন্ধুর মধ্যে অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, এবং ছেলেবেলা হইতেই তাঁহারা দুইজনে ভগবৎপ্রসঙ্গ করিয়া প্রত্যহই অনেকটা সময় কাটাইয়া দিতেন। ক্রমে এক সময় আসিল যখন উভয়েই একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুভব করিলেন এবং গুরুর সন্ধানে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কবীর কাশী যাইয়া শ্রীমৎ রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামগুণগান করিয়া পরমানন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে কবীরের বন্ধু চন্দন নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া অবশেষে এক হঠযোগী সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। প্রায় দ্বাদশ বৎসর একান্ত মনে সাধনায় নিবিষ্ট হইয়া রহিলেন এবং কিছু কিছু বিভূতি তাঁহার করায়ত্ত হইল। তাঁহার ধারণা হইল যে তিনি সাধনমার্গে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন এবং একটু অভিমানও আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তিনি মনস্থ করিলেন যে কবীর এতদিনে কতদূর কি করিয়াছে একবার দেখিয়া

আসিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় ১৩ বৎসর পর দেশে ফিরিয়া আসিয়া কবীরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। এতদিন পরে প্রাণের বন্ধুকে পাইয়া কবীর আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং তাঁহাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। পরে নিজের নিকটে বসাইয়া কুশল প্রশ্নাদি আরম্ভ করিলেন। দু'চার কথার পরেই স্বভাবতঃই সাধন ভজনের কথা উঠিয়া পড়িল। চন্দনের প্রশ্নের উত্তরে কবীর বলিলেন যে তিনি শ্রীমৎ রামানন্দের আশ্রয় পাইয়াছেন, রামনাম লইয়াই আছেন। তাতে কাপড় বুনিয়া এবং হাটে তাহা বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় তাহাতেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, কোন অভাবই তাহার নাই। চন্দন হাসিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার চোখে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পাইল। তখন কবীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কোথায় গুরুকরণ করিয়াছেন এবং সাধন ভজনেই বা কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। কবীরের প্রশ্ন শুনিয়া চন্দন গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং একটু ভারিক্কী চালে কবীরকে বলিলেন যে তিনি একজন সিদ্ধযোগীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় কয়েকটি চমকপ্রদ অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন; তিনি খড়ম পায়ে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া যাইতে পারেন এবং শূন্যে বিচরণ করিতে পারেন। আরও কিছুকাল সাধনা করিতে পারিলে অনেক কিছুই যে তাঁহার করায়ত্ত হইবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। এবার কবীর উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং হাসি থামিলে চন্দনকে বলিলেন : "ভাই, এতটা উদ্যম, এতটা পরিশ্রম, আর এতটা সময় এমন ভাবে অযথা নষ্ট করিয়া আসিলে।

খেয়ামাঝিকে একটা পয়সা দিলেই তো নদী পার হওয়া যায়, আর শূন্যে বিচরণ, সে তো চিড়িয়ারাও করে।" কবীরের কথাটি শুনিয়া চন্দন এমন একটা বিষম ধাক্কা খাইলেন যে কিছুক্ষণ তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, শেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক বলিয়া কহিয়া পরিশেষে তিনি কবীরেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই জন্যই অলৌকিক কাহিনী লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

যাহাই হউক, রাজপুত দম্পতির ঘটনাটি বিবৃত করিয়া ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে ইঁহারা বাস্তবিক অনন্যভাবেই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহাদের নিকট বাঁধা পড়িয়াছিলেন কিন্তু সামান্য একটু সন্দেহের ছায়াপাতেই বন্ধন শিথিল হইয়া গেল, তাঁহারা আর ঠাকুরকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। ঠাকুরের দাবী ষোল আনা, সামান্য এক পাই কম হইলেও তাহা দিয়া প্রকৃত ঠাকুর সেবা হয় না। ঠাকুর কখন কখন বলিতেন : "যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।" ঠাকুরের মুখের এই "সর্ব্বনাশ" এবং সঙ্গে সঙ্গে "নির্ব্বংশ" ও "শ্মশান" কথা দুইটি তাঁহার আশ্রিতবর্গের মধ্যে অনেকের মনে যে একটা আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে ইহা আমি সাক্ষাৎভাবেই জানি, সুতরাং কথা কয়টি একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার জন্য যত্ন করা প্রয়োজন মনে হইতেছে। আমরা অজ্ঞানান্ধ জীব, মায়াচক্রে ঘুরিয়া বেড়াই, "সর্ব্বনাশ" কথাটা শুনিলেই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠি। সর্ব্বনাশ হইবে শুনিলেই আমরা ভাবি যে আত্মীয় পরিজন মরিয়া যাইবে,

বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং পরিণামে হয়তো একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইব, কাজেই আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়ি, কিন্তু ঠাকুর কথাটা ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করিতেন না। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক বিবাহ করিবেন, কি করিবেন না, এই চিন্তায় কিছুদিন যাবৎ মনে মনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিবাহ করিলেই সংসার বন্ধনে জড়াইতে হইবে, ইহাই ছিল তাহার আশঙ্কার কারণ। একদিন খোলাখুলি ঠাকুরকে তিনি কথাটা জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলিলেন এবং উত্তরে ঠাকুর বলিলেন যে বিবাহ বন্ধন করে না, বন্ধন করে আসক্তি। এই আসক্তির নাশই সর্ব্বনাশ, মূল ব্যাধি দূর হইয়া গেলে আর কোন কিছুতেই পায় না। কিন্তু এই আসক্তি যখন ক্রমে শিথিল হইতে থাকে তখন আবার এক নূতন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যাহা ছিল সবই যে যাইতে বসিল, পরিবর্ত্তে তো তেমন কিছুই পাইলাম না, এরূপ একটা অনিশ্চিত ভাব আসিয়া মনকে আশ্রয় করিতে চায়। এই অবস্থাও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলে ক্রমে প্রকৃত "সর্ব্বনাশ" হইয়া যায় এবং ঠাকুরের দাসানুদাস পদবী লাভ হইতে পাবে। সুতরাং "সর্ব্বনাশ" কথাটা শুনিলেই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা আরও পরিস্ফুট হইবে। জনকের রাজসভা, ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বহু গণ্যমান্য মুনিঋষিরা আসিয়া সেখানে সমবেত হইয়াছেন, ইহাদের শিষ্যেরাও কেহ কেহ আসিয়াছেন, বেশ জমকালো সভা বসিয়াছে। আলোচনা চলিতেছে, ইতিমধ্যে এক দৌবারিক আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছে।

কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাসাদ, সুতরাং বিপদ অত্যন্ত গুরুতর কিন্তু জনক রাজা এই সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, সভার কার্য্য যথারীতি চলিতে লাগিল। এক মুনির সঙ্গে তাহার দুইজন শিষ্যও সভায় আসিয়াছিলেন, দৌবারিকের কথাটা ইহাদের কানে যাইতেই দুইজনেই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রাসাদের সংলগ্ন অতিথিশালায় ইহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছিল এবং সেখানে দু'জনের দুইটি বোচকা ছিল। উভয়ের বোচকার মধ্যে ছিল একটি কমণ্ডলু, একটি কৌপীন, আর একখানা ছেঁড়া কাঁথা। অতিথিশালায় আগুন লাগিয়া পাছে তাহাদের সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে দু'জনেই অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের অধীশ্বর, সৈন্য, সামন্ত, অর্থ, রথ, অশ্ব ইত্যাদি কোন কিছুরই অভাব নাই, পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজনে ভরপুর সংসার, চতুর্দ্দিকেই প্রাচুর্য্য, তথাপি জনক রাজার "সর্ব্বনাশ" হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই আর তাহার আসক্তি নাই। আর ঐ কমণ্ডলু-কৌপীন-কাঁথাসর্ব্বস্ব শিষ্যদ্বয়ের সর্ব্বনাশের সূচনাও হয় নাই।

একখানি পত্রে ঠাকুর লিখিয়াছিলেন : "সত্যনারায়ণ নির্ব্বংশ, তাহার সেবক নির্ব্বংশ জানিবে।" (বেদবাণী, প্রথম খণ্ড, ৩৪৪নং) তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি তাঁহার আশ্রিতবর্গের মধ্যে সত্যনারায়ণ সেবার প্রচলন করিয়াছিলেন, সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করিব। সেই সময় হইতে ঠাকুরের আশ্রিতেরা প্রায় সকলেই সত্যনারায়ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন, কোন কোন গৃহে এই সেবা প্রত্যহই অনুষ্ঠিত

হয়। সুতরাং ঠাকুরের এই কথাটি যখন ছাপার হরফে বাহির হইয়া গেল, অনেকের মনেই ইহা একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিল। সত্যনারায়ণের সেবা করিলে যদি নির্ব্বংশ হইতে হয়, তাহা হইলে ঠাকুর এই সেবার প্রচলন করিলেন কেন? এই কথাটা লইয়া অনেকেই আমার নিকট আসিয়াছেন এবং এ বিষয়ে আমি কয়েকখানি পত্রও পাইয়াছি। কিন্তু সমস্যাটা জটিল নহে, "নির্ব্বংশ" কথাটাকেও উপরোক্ত "সর্ব্বনাশ" কথাটার মতই বুঝিতে হইবে। এই 'নির্ব্বংশ' কথাটার সম্পর্কে ঠাকুর কখন কখন রক্তবীজের কাহিনীটির উল্লেখ করিতেন। অমিততেজা রক্তবীজ দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি। রক্তবীজের বিশেষত্ব ছিল এই যে তাহার শরীর হইতে ভূমিতে রক্ত বিন্দু পতিত হইলেই পৃথিবী হইতে সর্ব্বপ্রকারে তাহার ন্যায় বলবিক্রম সম্পন্ন আর একটি অসুরের উদ্ভব হইত। সুতরাং রক্তবীজ যখন যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়া আসিল, তখন দেবী এক মহা সমস্যায় পড়িলেন। প্রথমে রক্তবীজ গদাহস্তে ঐন্দ্রীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐন্দ্রী স্বীয় বজ্রের দ্বারা রক্তবীজকে আহত করিলেন কিন্তু বজ্রাহত তদীয় দেহ হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তবিন্দুগুলি হইতে নূতন নূতন রক্তবীজ উত্থিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবী চক্রের আঘাতে রক্তবীজের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল কিন্তু তাহার দেহের রক্ত প্রবাহ হইতে সহস্র সহস্র মহাসুরের উদ্ভব হইল। শেষে এমন অবস্থা হইল যে রক্তবীজের রক্তসম্ভূত এই সকল মহাসুরে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল, ইন্দ্রাদি দেবগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। অবস্থা

যখন এইরূপ ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেবী চামুণ্ডাকে তাঁহার মুখবিবর বিস্তার করিতে বলিলেন। দেবীর অস্ত্রাঘাতে যে সকল অসুর নিহত হইতে লাগিল, চামুণ্ডা তাহাদের রক্তাক্ত দেহ নিজ মুখের মধ্যে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আর নূতন অসুর জন্মাইতে পারিল না। এইভাবে ক্রমে ক্ষীণরক্ত হইয়া রক্তবীজ প্রাণত্যাগ করিল। ঠাকুর বলিতেন যে রক্তবীজ হইল বাসনার প্রতীক, বাসনা হইতেই বাসনার সৃষ্টি হয়, এই বাসনা-পরম্পরা কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না। কিন্তু চামুণ্ডা যেমন রক্তবীজের এক বিন্দু রক্তও মাটিতে পড়িতে না দিয়া, শূন্যে নিজের মুখের মধ্যে তাহা গ্রহণ করিয়া রক্তবীজের জড় মারিয়া দিলেন, সেইরূপ কেহ যদি শূন্যের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া ধীরে ধীরে এই বাসনাগুলিকে শূন্যে মিলাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে এই বাসনা-বংশ-পরম্পরা আর থাকে না, রক্তবীজের নিধন হয় এবং 'নির্ব্বংশ' হওয়া যায়।

একদিন ঠাকুরের আশ্রিত কোনও এক ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমি অসুস্থ থাকায় ভদ্রলোককে দোতলায় আমার শোবার ঘরে আনাইয়াছিলাম। সেই ঘরে ঠাকুরের একখানা পদ্মাসনে উপবিষ্ট ঊর্দ্ধনেত্র ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো আছে। আমার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে ভদ্রলোকের দৃষ্টি হঠাৎ সেই ছবির উপর পড়িল এবং তিনি আতঙ্কে একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে আমাকে বলিলেন: "এ আপনি করিয়াছেন কি? এই ছবি ঘরে রাখিয়াছেন, শীঘ্র সরাইয়া ফেলুন।" আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত

হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: "কেন কি হইয়াছে?" ভদ্রলোক বলিলেন যে তিনি স্বকর্ণে ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, যে এই ছবি ঘরে রাখিবে সে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে। ছবিটি সরাইয়া ফেলিতে তিনি পুনরায় আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তাহার এই ব্যগ্রতা দেখিয়া আমি বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছিলাম কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: "নির্ব্বংশ শব্দে আপনি কি বুঝিয়াছেন?" তিনি বলিলেন: "নির্ব্বংশ মানে নির্ব্বংশ, ইহার আর বোঝাবুঝি কি? আমি তাহাকে ঠাকুরের অভিপ্রেত অর্থটা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু তিনি আমার কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। এই ছবিখানা লইয়া এই প্রকারের বাদানুবাদ আমাকে অনেকের সঙ্গেই করিতে হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুরেরই আশ্রিত এক প্রবীণ ভদ্রলোক আমার সেই ঘরে আসিয়াছিলেন। তিনিও এই ছবিখানা দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন। আমাকে জানাইলেন যে এই ছবিখানা তাহার ঘরেও ছিল এবং ঠাকুর নাকি ছবিখানা দেখিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন যে এটি শ্মশানের ছবি। ঠাকুরের কথাটা শুনিয়া তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল, ছবিখানা ঘরে রাখিলে বুঝিবা তাহার গৃহই শ্মশান হইয়া যাইবে। এই ভয়ে ঠাকুরের অনুমতি লইয়া ছবিখানা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া আসিলেন। ভদ্রলোক নিতান্ত সরলভাবেই কথাটা আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম যে ঠাকুরের কথাটা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই। "সর্ব্বনাশ" ও নির্ব্বংশ" কথা

দুইটির মত এই 'শ্মশান" কথাটিকেও বাসনার মূলোৎপাটন অর্থেই বুঝিতে হইবে। হৃদয় শ্মশান না হইলে শ্মশানবাসিনীর নৃত্য সেখানে হয় না। এই জন্যই ভক্ত-সাধক গাহিয়াছেন :

"শ্মশান ভালোবাসিস ব'লে, শ্মশান ক'রেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা, তুই নাচবি ব'লে নিরবধি।
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, শুধু চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা আসিস যদি।"

৪

প্রত্যুষেই ট্রেণ, সুতরাং তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া, কোন প্রকারে একটু মুখ হাত ধুইয়া ঠাকুরের নিকটে আসিয়া দেখিলাম যে তিনি ইতিমধ্যেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আমার স্ত্রীও আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গেলেন। ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় দুই মিনিট তিনি এক অপূর্ব্ব স্নেহ-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, পরে হঠাৎ "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মে অচ্যুত" গীতার এই পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অতি সহজ কথা, অর্জ্জুন বলিলেন : "হে অচ্যুত, উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর।" আপাতদৃষ্টিতে এই কথাটির অন্তরালে যে বাস্তবিকই তাৎপর্য্যমূলক কিছু আছে, এরূপ

মনে হয় না। ঠাকুর কিন্তু বলিলেন যে গীতার একটা প্রধান কথাই এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাঁহার সকল কথা আমার স্মরণ নাই কিন্তু মূল কথাটি বেশ স্পষ্টই মনে আছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে মধ্যস্থ বা নিরপেক্ষ ক্ষেত্র হইতেই গীতার উৎপত্তি এবং নিরপেক্ষ হইতে না পারিলে গীতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারা যায় না। এই জন্যই বক্তা এবং শ্রোতা উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে, অর্থাৎ নিরপেক্ষ ক্ষেত্রে নিজেদের স্থাপনা করিলেন।

রামার্পণমস্তু